নবীন জার্ম্মাণী।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
প্রণীত।

প্রকাশক
সতীশচন্দ্র মুখোঃ
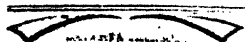
Printed by Purna Chandra Mukerjee at the
Basumati Electric Machine Press . . .
. . 166, Bowbazar Street, Calcutta

ভূমিকা।

শান্তির সুযোগে সমরায়োজন সম্পূর্ণ করিয়া, জার্ম্মাণী সহসা তূর্য্যনাদে সমরাহ্বান ঘোষিত করিয়া সমগ্র পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। আজ প্রায় সমগ্র পৃথিবীকে রঙ্গমঞ্চে পরিণত করিয়া যে মহানাটকের অভিনয় চলিতেছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই মহাযুদ্ধের ফলে জগতের শিক্ষায় ও সভ্যতায় অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বাত্যাবিক্ষুব্ধ নীলোর্ম্মিময় সাগর যেমন নীলাচলের চরণ স্পর্শ করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হয়, সে পরিবর্ত্তন যে তেমনই ভারতের চরণ স্পর্শ করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, এমন নহে। কেননা, ভারতবর্ষ আর স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন নহে; পরন্তু বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। তাই য়ুরোপের তুষারাস্তৃত সমরক্ষেত্র ইংরাজের যে সকল সৈনিকের শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভারতবাসীর অভাব হয় নাই। ভারতবাসী ধন ও প্রাণ দিয়া এ যুদ্ধে সাম্রাজ্যের গৌরবরক্ষা করিতে প্রয়াস পাই-য়াছে ও পাইতেছে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের শাসনদণ্ড ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বলিয়াছিলেন—

"It was a proud moment for England when His Majesty's Indian forces marched through the streets of Marseilles in all the panoply of war ready to take their

place in the Empire's fighting line. It was a prouder moment still for India, for then for the first time she found herself shoulder to shoulder with the mother country in the battle-fields of Europe, standing for a righteous cause and cementing by the blood and the sacrifice of her sons a brotherhood in arms not only with the mother country, but also with the allied nations of Europe. The Indian soldiers have fought nobly and the greatness of Germany's disillusionment and bitter disappointment is the measure of India's glory. Turn your eyes to the munificent contributions and offers of personal services that have poured in unceasingly ever since the war began, alike from prince and peasant."

তাই বলিয়াছি, জার্ম্মাণী নিশ্চিহ্ন হইয়া জগতের সভ্যতায় যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিবে—তাহা ভারতেও অনুভূত হইবে। যুদ্ধের অবসানের নিবৃত্তি হইবে—কিন্তু তাহার ফলে সকল দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক পরিবর্ত্তন দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে; হয় ত সভ্যতার গতি পরিবর্ত্তন হইবে। আজ আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জন-মুখর ও ধূমাচ্ছন্ন গগনে পরিবর্ত্তনের সূচনা লক্ষিত না হইলেও পরিবর্ত্তন যে অবশ্যম্ভাবী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে জার্ম্মাণী দুরাশা-তাড়নায় সেই পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়াছে তাহার ইতিহাস এ দেশে সর্ব্বজনবিদিত নহে, কিন্তু সে ইতিহাস জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছে।

সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এই পুস্তকে জার্ম্মাণীর ইতি-

হাস, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য, পরিবর্ত্তন প্রভৃতির কথা বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিলাম।

নবীন জার্ম্মাণীর শক্তিমন্ত্রের গুরুদিগের উপদেশ, জার্ম্মাণীর স্বরাষ্ট্র নীতি ও পররাষ্ট্রনীতি, জার্ম্মাণীর সমরায়োজন, জার্ম্মাণীর গুপ্তচর-নিয়োগপ্রথা, বেলজিয়মে জার্ম্মাণীর অত্যাচার—এ সকলের বিবরণও কৌতূহলোদ্দীপক। স্থানাভাবে এই পুস্তকে যে সকল বিবৃত করিতে পারা যায় নাই, সেগুলি পুস্তকের অন্য খণ্ডে বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

বহু পুস্তক, মাসিকপত্র ও সংবাদপত্র হইতে এই পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে এবং জার্ম্মাণীর কথা বাঙ্গালী পাঠকের সুখবোধ্য করিবার জন্য অনেক স্থলে এ দেশের কথাও আলোচিত হইয়াছে।

পুস্তক যখন মুদ্রিত হয়, তখন দূরে অবস্থিতিহেতু পুস্তকে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে সে সকল সংশোধিত হইবে।

গ্রন্থকার।

চৈত্রসংক্রান্তি, ১৩২২।

সূচিপত্র।

নবীন জার্ম্মাণী।

উপক্রমণিকা।

যে কবি মানবচরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন, সেই মহাকবি তাঁহার বিরাট মহাকাব্য মহাভারতে যে যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন, যে মহাযুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয়সমাজ বহ্নিতে পতঙ্গের মত পতিত হইয়াছিলেন, সেই মহাযুদ্ধই এতদিন আমাদের নিকট বিরাটতম যুদ্ধের আদর্শ হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবযৌবনবলদৃপ্ত জার্ম্মাণী য়ুরোপে যে সমরানল প্রজ্জলিত করিয়াছেন, সে অনল ব্যপকতায় বাস্তবকে ও কল্পনাকে অনায়াসে পরাভূত করিয়াছে। যে জার্ম্মাণী সঙ্গীতের রাজ্যে নূতন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়াছেন; জড়-বিজ্ঞানে প্রাধান্যলাভ করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, মানবের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; দর্শনের বিচারে কুসংস্কার দূর করিয়া জ্ঞানালোকবিস্তারে সহায়তা করিয়াছেন; সাদরে প্রাচীর সাহিত্য আলোচিত করিয়া প্রাচীর প্রাচীন সভ্যতার স্বরূপনির্ণয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন, সেই জার্ম্মাণী সহসা নূতন রূপে দেখা দিয়াছেন। যে জার্ম্মাণী শান্তিমন্ত্রের দীক্ষার ভাণ করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই জার্ম্মাণী সহসা ক্রুপের কামানে সমরাহ্বান ঘোষিত করিয়া শান্তির রাজ্যে অশান্তির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সভ্যতাকে পদদলিত করিয়া নিষ্ঠুর বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়া জগৎকে আতঙ্কিত করিয়াছেন, নব নব আয়ুধের

আবিষ্কার করিয়া লোকক্ষয় করিতেছেন। আজ তাঁহার আয়োজনের পরিমাণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, জার্ম্মাণী নবসাম্রাজ্যে পরিণতি লাভের পর হইতেই প্রুসিয়ান ক্ষাত্রাচারকে প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে উদ্যোগ করিয়া আসিয়াছেন। বার্ণ হার্ডিপ্রমুখ লেখকগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ সেই উদ্দেশ্যসাধনোদ্দেশ্যেই দেশের লোককে ক্ষাত্রশক্তির মদিরা পান করাইয়াছেন—দেশের লোকের মত এমন করিয়া গঠিত করিয়াছেন যে, তাহারা এই যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ মনে করিয়া সোৎসাহে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কিন্তু জার্ম্মাণী কি ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? অধর্ম্মনাশার্থ—দুষ্কৃতদমনজন্য ধর্ম্মযুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোন্ কারণ ছিল? যে সকল অত্যাচার সভ্যসমাজে সমরে নিষিদ্ধ, জার্ম্মাণী সেই সকল অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; যে সব সন্ধির সর্ত্ত পবিত্র জ্ঞানে পালন করা কর্ত্তব্য, সেই সব সন্ধির সর্ত্ত অনায়াসে পদদলিত করিয়াছেন; যে সব অনাচার অসভ্য সমাজেও নিন্দিত, সেই সব অনাচার করিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে জার্ম্মাণী আত্মরক্ষার জন্য সমরাঙ্গনে উপনীত হয়েন নাই—পরের যাহা প্রাপ্য, তাহার রক্ষার জন্যও অস্ত্রধারণ করেন নাই; যেরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা জার্ম্মাণীর অভিপ্রেত, সেরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। জার্ম্মাণী দীর্ঘকাল ধরিয়া বলসঞ্চয় করিয়া ছল ধরিয়া, বল প্রয়োগে স্বার্থসিদ্ধির আয়োজন করিয়াছেন। বিলাতী-সচিব মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ সত্যই বলিয়াছেন, জার্ম্মাণী অতর্কিত আক্রমণে প্রতিবেশিগণকে বিপন্ন করিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া গোপনে অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন,—আয়োজন করিয়াছেন।

সে আয়োজন যেমন বিপুল, তেমনই বিস্ময়কর। সমগ্র জার্ম্মাণসাম্রাজ্যে যত অস্ত্রধারণক্ষম লোকের বাস, তাহাদের সকলের নাম,

ঠিকানা ও বিবরণ সরকারী দপ্তরে লিখিত আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র কে কোথা হইতে সেনাদলে যোগ দিল, তাহা জানিয়া সরকার তাহার কাযে অন্য লোক দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাযের জন্য সরকারী কারখানা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। যাহারা বিলাসের উপাদান প্রস্তুত করিত, পাছে তাহারা ব্যবসাবিলোপে বিপন্ন হয় ও দেশে অসন্তোষের ব্যাপ্তি ঘটে, সেই জন্য সমরঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কারখানা চালাইয়া—সমর-সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়া লোককে কায দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে অপচয়হেতু দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব না ঘটে,সেই জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণসম্বন্ধে নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে জার্ম্মাণীর স্বাভাবিক সুবিধাও যে ছিল না, এমন নহে। জার্ম্মাণী শিল্পবাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিয়া বাণিজ্যের স্রোতে আপনার অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিলেও খাদ্যদ্রব্যসম্বন্ধে একেবারে পরমুখাপেক্ষী হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে তুলনায় আলোচনা করিয়া লর্ড গসেন দেখাইয়াছিলেন যে, বিলাতের লোককে খাদ্যদ্রব্যের শতকরা চারিপঞ্চমাংশের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিলাতের লোকের খাদ্যদ্রব্যের শতকরা ৭৮ ভাগ বিদেশ হইতে আইসে। জার্ম্মাণী খাদ্যদ্রব্যের শতকরা ৩০ ভাগের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী। অপচয়-নিবারণ ও সঞ্চয় করিয়া জার্ম্মাণী যুদ্ধকালের জন্য খাদ্যের অভাব-সম্ভাবনা দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। অন্যান্য দেশ হইতে খাদ্য-দ্রব্য আমদানী করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এমন কি, সংবাদ-বাহী কপোতের বন্দোবস্তও করা হইয়াছে। কয় বৎসর হইতে জার্ম্মাণীর সমরবিভাগ বহু অর্থব্যয় করিয়া কপোতবাহিনী প্রস্তুত করিয়াছেন। আর যদি প্রয়োজন হয় বলিয়া, বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সংবাদ-বাহী পারাবতের পর্য্যন্ত তালিকা সরকার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শত্রুদিগের তরী ডুবাইবার জন্য জার্ম্মাণী বহু সাবমেরিন ও অন্তরীক্ষ হইতে ধ্বংসাস্ত্রনিক্ষেপজন্য বহু জেপলিন্ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; যুদ্ধকালে সে সকলের ব্যবহার করিয়া লোককে বিব্রত করিয়া তুলিতেছেন। অসাধারণ শক্তিশালী কামান প্রস্তুত করিয়াই জার্ম্মাণী নিরস্ত হয়েন নাই, পরন্তু সেই সকল কামানের গোলায় বিষবাষ্প পূর্ণ করিয়া শত্রুনাশের প্রয়াসও পাইতেছেন। জার্ম্মাণী যেমন বেলজিয়মের সন্ধি-পত্রকে চোতা কাগজমাত্র বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই,তেমনই শান্তি-সমিতির নির্দ্দেশ নষ্ট করিয়া এই বিষবাষ্পের ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এইরূপে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সমরসজ্জা করিয়া জার্ম্মাণী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই, সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘের আক্রমণ সহসা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিতেছে না।

এত যে আয়োজন, এ সব যদি উপযুক্ত কার্য্যে সুপ্রযুক্ত হইত! কিন্তু তাহা ত হয় নাই। জার্ম্মাণী যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,এমন কথা,বোধ হয়, জার্ম্মাণী ব্যতীত আর কেহই বলিবেন না। অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ সস্ত্রীক সার্ভিয়ায় আসিয়া গুপ্তঘাতুকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে অষ্ট্রীয়ার ক্রোধের উদয় হওয়া অবশ্য স্বাভাবিক। সুতরাং এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সন্ধানজন্য অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়াকে যে সব সর্ত্তে বদ্ধ হইতে বলিলেন, সে সব সার্ভিয়ার পক্ষে আত্মসম্মানহানিজনক। তবুও সার্ভিয়া অত্যাচারের আশঙ্কায় প্রায় সব সর্ত্তেই স্বীকৃত হইলেন। সর্ত্তের কথা শেষ হইতে না হইতে জার্ম্মাণী ছল ধরিয়া অষ্ট্রীয়াকে উত্তেজিত করিলেন। অষ্ট্রীয়া,—শোকে কাতর—ক্রোধে চঞ্চল অষ্ট্রীয়া সেই উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া সার্ভিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। তখন সন্ধি-সর্ত্তে রুসিয়া সার্ভিয়ার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ফ্রান্স রুসিয়ার সাহায্য করিতে বাধ্য, ইংলণ্ডও রুসিয়ার

ও ফ্রান্সের সাহায্য করিতে বাধ্য। ফ্রান্স রুসিয়ার পক্ষাবলম্বন করিলেন। ইংলণ্ড এই কলহের মীমাংসা করিয়া দিয়া সমরের নরকাগ্নিপ্রজ্বালন নিবারিত করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিলেন; চেষ্টা ফলবতী হইল না দেখিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ফ্রান্স বা ইংলণ্ড কেহই যে ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হয়েন নাই, তাহার প্রমাণ যুদ্ধারম্ভকালে কেহই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; সব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া লইতে ইংলণ্ডের প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছে; সমর-সরঞ্জাম-সরবরাহের সুব্যবস্থার অভাবে ইংলণ্ডকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। ফ্রান্স আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড যদি ফ্রান্সের সাহায্যার্থ অগ্রসর না হইতেন, তবে ফ্রান্সের যেমন বিপদ ঘটিত, ইংলণ্ডেরও তেমনই বিপদ অনিবার্য্য হইত। আবার তখন জার্ম্মাণী বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা পদদলিত করিয়া—যে সন্ধিসর্ত্ত আন্তর্জাতিক ব্যবহারে ধর্ম্মেরই মত পবিত্র বলিয়া পরিগণিত, সেই সন্ধিসর্ত্ত তুচ্ছ করিয়া—বেলজিয়ম আক্রমণ করিয়াছে। বেলজিয়মের অপরাধ, বেলজিয়ম সন্ধিসর্ত্ত ভগ্ন করিয়া আপনার বক্ষের উপর দিয়া জার্ম্মাণবাহিনীকে ফ্রান্স আক্রমণ করিতে দেন নাই। সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গের প্রতিবাদ করাও ইংলণ্ডের যুদ্ধে যোগ দিবার অন্যতম কারণ।

আর বাস্তবিকই বেলজিয়ম যদি জার্ম্মাণীর গতিরোধ না করিতেন, তবে ব্যাপার আরও জটিল হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। কারণ, তখনও ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নহেন। আর ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি অধিকৃত করাই জার্ম্মাণীর অভিপ্রেত ছিল। জার্ম্মাণী সে কথা ইংরাজকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ সে অসাধু প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। হইবেনই বা কেমন করিয়া? আজ যে জার্ম্মাণী সন্ধিসর্ত্ত অনায়াসে নষ্ট করিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশসমূহ লইতে অগ্রসর, কাল যে সুবিধা পাইলে

সেই জার্ম্মাণীই ইংলণ্ডের অনিষ্ট করিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? এখন দেখা যাইতেছে, রাজ্য-বিস্তার-লালসা জার্ম্মাণী বহু দিন হইতেই হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুষ্ট করিতেছিলেন। জার্ম্মাণী নবীন সাম্রাজ্য—অল্প দিনে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন; বহু জার্ম্মাণ মার্কিণ প্রভৃতি দেশে বাস করিয়া অর্থার্জ্জন করিয়া থাকে—তাই জার্ম্মাণীর আরও স্থান চাহি, জার্ম্মাণী যে সেজন্য বিশেষ আয়োজন করিতেছিলেন, তাহা এখন সপ্রকাশ হইয়াছে।

ফ্রান্সের লোকক্ষয় জার্ম্মাণী অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকিবেন। ফ্রান্সে বিলাসের বাহুল্যে সমাজের সর্ব্বনাশ হইতেছিল—বিলাসী ফরাসীরা বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সংসারের কর্ত্তব্যপালন করিতেও চাহিতেছিল না। ফলে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে যে ফ্রান্স জনসংখ্যার হিসাবে য়ুরোপে সর্ব্বপ্রধান ছিল, ক্রমে সেই ফ্রান্স সে হিসাবে ষষ্ঠ বা সপ্তম স্থানে আসিয়াছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপীয় জাতি সমূহের জনসংখ্যা প্রায় ৯ কোটি ৮০ লক্ষ ছিল। তখন ফ্রান্সের জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপীয় জাতি সমূহের জনসংখ্যা প্রায় ৩৪ কোটি ৩০ লক্ষ হইয়াছিল। তখন ফ্রান্সের জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ, অর্থাৎ ফ্রান্সের জনসংখ্যা শতকরা ২৬ না হইয়া কেবল ১১ হইয়াছে। এইরূপে ফ্রান্সে জাতির ধ্বংস হইতেছিল।

জার্ম্মাণী দীর্ঘকাল ধরিয়া গোপনে এই যুদ্ধের জন্য যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন, তাহাতে বেলজিয়মে বাধা না পাইলে জার্ম্মাণী কি করিতেন বলা যায় না। বোধ হয়, সেই জন্যই বেলজিয়মের উপর জার্ম্মাণীর এত ক্রোধ—বেলজিয়মে দারুণ অত্যাচারের অনুষ্ঠান। সে অত্যাচারে প্রতীচ্য সভ্যতা দুরপনেয় কলঙ্কে কলুষিত হইয়াছে—য়ুরোপের উন্নতির প্রবাহ পশ্চাদ্দিক্‌গামী হইয়াছে। সে অত্যাচার এমনই নৃশংস

যে, কোন য়ুরোপীয় সভ্যতাভিমানী জাতির পক্ষে যে সে অত্যাচারের অনুষ্ঠান সম্ভব, তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। এমন কি ইংলণ্ডও সে সব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া সে বিষয়ে এক অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত করেন। লর্ড ব্রাইস সে সমিতির সভাপতি ছিলেন। সমিতির সদস্যগণ সাক্ষ্য লইয়া—বিচার করিয়া যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণিত অত্যাচারের কথা মনে করিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। মনে হয়, প্রতীচ্য সভ্যতা বর্ব্বরতাকে রূপান্তরিত করিতে পারে না—কেবল আবৃত করে। আবরণ সহজেই দূর হইয়া যাইতে পারে, তখন বর্ব্বরতাই সপ্রকাশ হয়। জড়বাদমূলক প্রতীচ্য সভ্যতার ইহাই দোষ। ভারতীয় সভ্যতা সেই জন্যই জড়বাদ পরিহার করিয়া ধর্ম্মের দ্বারা মানুষকে সংযত করিতে—নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তিকে প্রহত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। সে সভ্যতা স্পর্শমণির মত যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে, তাহাকেই বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করিয়াছে। হিন্দু সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে সমরের যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যে সকল নিয়মের অবহেলা নিন্দিত হইত—হেগের শান্তিসমিতিতে সমবেত য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেই সকল নিয়মই করিয়াছিলেন। আর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জড়বিজ্ঞানে উন্নত—সভ্যতাভিমানী জার্ম্মাণ অবাধে সে সকল নিয়ম পদদলিত করিয়া "মারি অরি পারি যে কৌশলে" এই হীন নীতি অবলম্বন করিয়া য়ুরোপ শ্মশান করিতেছে।

যুদ্ধে—

"শস্যক্ষেত্র রাজি
অশ্বক্ষুরে—অগ্নিযোগে দলিত—ধ্বংসিত
জনহীন গৃহ—গ্রাম শঙ্কায় আকুল

জনগণ পলায়েছে ; লাঞ্ছিতা মাধবী
গৃহ সহকার হ'তে ছিন্ন পাপ করে
অশ্রুআঁখি চাহিতেছে নিবাতে জীবন।"

—ইহাই সেকালের চিত্র। কিন্তু জার্ম্মাণীর ব্যবহারে এ চিত্র আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে। সন্ধির সর্ত্ত রক্ষা করিতে যাইয়া আত্মসম্মান সংরক্ষণ-প্রয়াসী বেলজিয়মের অধিকাংশ লোক আজ নিরন্ন—পরমুখাপেক্ষী। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক দয়া-দত্ত আহার্য্যের আশায় অপেক্ষা করে। তাহারা গৃহহীন—স্বজনহীন—অন্নহীন। জার্ম্মাণী যখন যে নগর দখল করিয়াছেন, তখনই সে নগরে সমরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া বিপন্ন নগরবাসিগণের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এক দিকে বেল-জিয়ম,আর এক দিকে পোলাণ্ড এইরূপে জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক পীড়িত—অত্যাচারজর্জ্জরিত। সে অত্যাচারের কথা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনার যোগ্য। কিন্তু স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠকের হস্তে যে পুস্তক পতিত হইবার সম্ভাবনা, সে পুস্তকে ব্রাইসের অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ সকল অত্যাচারের আলোচনা—এমন কি উল্লেখও—সঙ্গত কি না সন্দেহ। মানুষের পশুপ্রকৃতির পরিচয় পরিস্ফুট করিয়া সমাজের কোন-রূপ উপকার হইবে না, পরন্তু অপকার হইতে পারে। এই জার্ম্মাণ-যুদ্ধে নির্ব্বীর্য্য য়ুরোপের উন্নতির গতি কত শতাব্দীর জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। এই যুদ্ধের ফলে য়ুরোপের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিবে। এ যুদ্ধে যেরূপ পরিবর্ত্তন প্রব-র্ত্তিত হইবে, নেপোলিয়নের যুদ্ধে সেরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। য়ুরোপের ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে য়ুরোপ মানবের দুর্দ্দশাবিষয়ে যেরূপ উদাসীন হইয়াছিল, তাহাতে এই যুদ্ধের ফলে য়ুরোপে পশুপ্রকৃতি কিরূপ প্রবল হইবার সম্ভাবনা, তাহা ভাবিলেও শঙ্কিত হইতে হয়।

সময়ে বিষবাষ্পের ব্যবহার লইয়া ইহারই মধ্যে আমরা য়ুরোপের ভবিষ্যৎ অবস্থার পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। জার্ম্মাণী বিষবাষ্পের ব্যবহার করিয়াছেন—আন্তর্জাতিক ও নৈতিক সকল নিয়ম পদদলিত করিয়াছেন। ইংলণ্ড জার্ম্মাণীর এই ব্যবহারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জার্ম্মাণী যখন অন্যায় সমরে শত্রুদিগকে বিপন্ন করিতেছেন, তখন সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘের পক্ষেও জার্ম্মাণীর অবলম্বিত উপায় অবলম্বন অন্যায় নহে—সচিবশ্রেষ্ঠ মিষ্টার আসকুইথ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ইংলণ্ড প্রাণঘাতী—বিষম যন্ত্রণাদায়ক বিষবাষ্পের ব্যবহার করিবেন না। না করিলেও ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া শান্তি-সমিতির নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিতে হইতেছে।

অল্পকালমধ্যে জার্ম্মাণীকে পরাভূত করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। জার্ম্মাণী যুদ্ধঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পররাজ্য মধ্যে অগ্রসর হইয়াছেন। অর্থাৎ জার্ম্মাণীর অঙ্গে আজও আঘাত লাগে নাই—জার্ম্মাণীর অধিবাসীরা আজও স্বদেশে যুদ্ধের বিষময় ফলভোগ করে নাই। এই জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তবে বিজয়ী সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জার্ম্মাণীকে সেই প্রস্তাবানুসারে কায করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন। জার্ম্মাণরা পরাভূত হইয়া স্বরাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাই লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, এ যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী হইবেই। তাহাতে জার্ম্মাণীর যেমন অন্যান্য দেশেরও তেমনই বিষম ক্ষতি অনিবার্য্য। ইহার মধ্যেই ফ্রান্সের মত ইংলণ্ডে পুরুষদিগের অনেক কায স্ত্রীলোকদিগকে করিতে হইতেছে। কৃষিকার্য্য, যানচালন, ভারবহন—এইরূপ অনেক কার্য্য স্ত্রীলোকরা করিতেছে। তাহার ফলে আবার শিশুদিগের অযত্ন হইতেছে—শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িয়া যাইতেছে

সে ক্ষতিও অসাধারণ। এ দিকে যুদ্ধে লোকক্ষয়ের পরিমাণ দেখিয়া কেহ কেহ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এত শঙ্কিত হইতেছেন যে, মনে করিতেছেন, বোধ হয় যুরোপে আবার বহুবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। নহিলে দেশ জনহীন হইবে। পূর্ব্বকালে অবিবাহিত যুবক যুবতীর অবাধ মিলন, লোকক্ষয়কর যুদ্ধের পর দেশবাসীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে; একালে সেরূপ ব্যবস্থা স্বপ্নাতীত। অবিবাহিতা জননীদিগের সন্তানগণ যাহাতে সমাজে নিন্দিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার কথাও উঠিয়াছে। অপর পক্ষে আবার বিজয়ী জার্ম্মাণ সৈনিকদিগের অত্যাচারে বেলজিয়মে ও ফ্রান্সে যে সকল রমণী সন্তান প্রসব করিবে, তাহাদিগের সন্তানদিগকে সমাজে কোন্ স্থান দান করা সঙ্গত—সে প্রশ্নও সামাজিকগণ বিচার করিতেছেন।

যুরোপে এইরূপ নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। কত দিনে—কিরূপে—সে সব সমস্যার সমাধান হইবে, বলা যায় না।

এই যুদ্ধে যুরোপের অর্থনীতিক মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজনীতিক ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে লোক মনে করিত, বাণিজ্যের প্রবাহে দেশ হইতে যদি স্বর্ণ রৌপ্য বাহির হইয়া যায়, তবে দেশ দরিদ্র হয়। সে কালে ভারতের পণ্য রোমে যাইত। তাই প্লিনী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ রোমান সাম্রাজ্যের অর্থশোষণ করিতেছে, রোমান সাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ৬৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা লাভ করে। এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ইংলণ্ডকে দরিদ্র করিতেছেন—এ অভিযোগ শুনা যাইত। তাহার পর ইংলণ্ডে অর্থনীতির নূতন মত প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বমত পরিত্যক্ত হইয়া সাব্যস্ত হয়, পণ্যই অর্থ, সোণারূপা নহে। সুতরাং সোণারূপার সঞ্চয় করা অনাবশ্যক ও অজ্ঞতার পরিচায়ক।

এই মতই ক্রমে সমগ্র য়ুরোপে গৃহীত হইয়াছিল। এবার কিন্তু কেবল পশারে নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ইংলণ্ডে লয়েড জর্জ্জ বলিয়াছেন, এখন যাহারা বেতনাদি নোটে না লইয়া, টাকায় লইতে চাহিবে, তাহারা দেশের কল্যাণকামী নহে। য়ুরোপের নানা দেশে যাত্রীরা যাত্রাকালে স্বর্ণামুদ্রা দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নোট লইতে বাধ্য। অর্থাৎ দেশ হইতে কিছুতেই সোণারূপা বাহির হইতে দেওয়া হইবে না। ইংলণ্ড অবাধবাণিজ্য নীতির সেবক ও সাধক। তাহার কারণ, ইংলণ্ডকে খাদ্যদ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। লর্ড গসেন স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, ইংলণ্ডকে যখন বিদেশী খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, তখন যাহাতে সে সকল দ্রব্যের আমদানীর পথ পরিষ্কৃত থাকে, তাহা করিতে হয়। ইংলণ্ডের শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত—ইংলণ্ডকে খাদ্যদ্রব্যের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং ইংলণ্ড অবাধবাণিজ্য নীতির প্রবর্ত্তক, সমর্থক, সাধক ও সেবক। সেই জন্যই বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র অবস্থাবিচার না করিয়াও এই নীতিই প্রচলিত করিতে হইয়াছে। যে ভারতের শিল্প বিদেশী—অনেক ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যপুষ্ট ও রক্ষাশুল্করক্ষিত—শিল্পের অসম প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট, যে ভারত শিল্প হারাইয়া কৃষিপ্রাণ হইয়া পর্জ্জন্যের কৃপায় বঞ্চিত হইলেই দুর্ভিক্ষের অনলে দগ্ধ হয়, যে ভারত আপনার ক্ষেত্রজ খাদ্যে দেশের লোকের সব অভাব পূর্ণ করিয়া "দেশ বিদেশে বিতরিছে অন্ন", যে ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না; সে ভারতেও অবাধবাণিজ্যনীতিই প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত। এমন কি দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাবের জন্য ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের বিরাগ-

ভাজন হইয়াছিলেন। যেন অবাধ-বাণিজ্যনীতির উপর হস্তক্ষেপ ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপেরই সমান। এবার কিন্তু ইংলণ্ডকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা যত দিন অক্ষুণ্ণ থাকে ও জগতে শান্তি বিরাজ করে, তত দিন যে দেশে যে জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা সস্তায় উৎপন্ন হয়, অন্যান্য দেশ সেই দেশ হইতে সে জিনিষ কিনিবে; কিন্তু যখন যুদ্ধহেতু সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তখন আর সে নীতি রক্ষা করা চলে না। তাই অবাধবাণিজ্যনীতির সাধক ও সেবক ইংলণ্ডেও সরকারী সাহায্য দিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। আর এবার ভারতেও শিল্পের জন্য সরকারের আনুকূল্যদানের কথা শুনা যাইতেছে।

ইংলণ্ডে রাজনীতিক ব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও বিস্ময়কর। বিলাতের রাজনীতিক্ষেত্রে দুই দল বিদ্যমান। যে বার পার্লামেণ্টে যে দলের লোকের সংখ্যাধিক্য হয়, সে বার সেই দলই মন্ত্রিসভা সংগঠিত করিয়া রাজকার্য্য পরিচালিত করেন। অপর দল প্রতিপক্ষের কার্য্যের প্রতিকূল সমালোচনা করেন—কোন না কোন প্রস্তাবে তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া আপনারা মন্ত্রিসভা গঠিত করিতে প্রচেষ্ট হয়েন। এই রূপেই ইংলণ্ডের রাজনীতিক কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। এই নিয়মে ইংলণ্ডের লোক এমনই অভ্যস্ত যে, এ দেশে সরকার প্রতিপক্ষের অভাব অনুভব করিয়া কংগ্রেসের দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মিষ্টার হিউম যখন এ দেশে সমাজসংস্কারার্থ সভা-সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া সে প্রস্তাব তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের গোচর করেন, তখন লর্ড ডাফরিন তাহাতে আপত্তি করিয়া এ দেশে প্রতিপক্ষের অভাব বুঝাইয়া রাজনীতিক সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। কংগ্রেসের উৎপত্তির এই ইতিহাস আজকাল দেশে সুপরিচিত। এই যুদ্ধের সময় সেই অতি পুরাতন

ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। মন্ত্রিবর মিষ্টার আসকুইথ সমন্বয় মন্ত্রিসমাজসংগঠনের কথায় বলিয়াছেন, এখন আর দল নাই ; এখন ইংলণ্ডের যে বিপদ উপস্থিত, তাহাতে সকলেই সমবেত চেষ্টায় বিপন্মুক্ত হইবার উপায় করিবেন। সেই জন্যই দুই দলের নায়কগণ মিলিত হইয়া মন্ত্রিসমাজ সংগঠিত করিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জনের মত দাম্ভিক রাজনীতিক দুর্লভ। তিনি যখন ভারতে বড়লাট ছিলেন, তখন লর্ড কিচনার সেনাপতি—জঙ্গিলাট। লর্ড কার্জ্জন এদেশের সমর-বিভাগকে ভারত সরকারের অধীন রাখিবার প্রস্তাব করেন। লর্ড কিচনার সমরবিভাগের স্বতন্ত্র প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিতে অসম্মত হয়েন। ইঁহাতে উভয়ে মতভেদ হয়। লর্ড কার্জ্জন সমর-বিভাগের স্বতন্ত্র প্রাধান্য-সংরক্ষণবিষয়ে লর্ড কিচনারের যুক্তি অসার প্রতিপন্ন করেন। তখন লর্ড কিচনার বলেন, সে প্রাধান্য না পাইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। এই কথায় লর্ড কিচনারের মতই গৃহীত হয়। ফলে লর্ড কার্জ্জন ভারতের রাজপ্রতিনিধির পদ ত্যাগ করেন। এবার সমন্বয় মন্ত্রিসমাজে লর্ড কিচনার ও লর্ড কার্জ্জন উভয়ে একযোগে কার্য্য করিতেছেন। উভয়ে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত—সে উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের শত্রুজয় ও ইংলণ্ডের গৌরবরক্ষা। মিষ্টার আসকুইথ তাঁহার দলস্থ অর্থাৎ উদার-নীতিক রাজনীতিকদিগকে বলিয়াছেন, এই বিপদের সময় তাঁহারা তাঁহার উপর নির্ভর করুন—এ ব্যবস্থা দেশের কল্যাণকর বলিয়াই তিনি ইহা করিয়াছেন। তিনি এত দিন যে মতের সাধনা করিয়াছেন, আজ সে মত ত্যাগ করেন নাই ; যে আদর্শের সন্ধান করিয়াছেন, সে আদর্শ ত্যাগ করেন নাই। এই যুদ্ধের পর তিনি আবার সেই মতের সাধনা করিবেন—সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন। তিনি তিন পুরুষ ধরিয়া বৃটিশ নৃপতিদিগের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা

অপূর্ণ নাই। বৃটিশ রাজনীতিক্ষেত্রে সমন্বয় মন্ত্রিসমাজের সহিত যে স্মৃতি জড়িত, তাহা গৌরবজনক নহে—সে স্মৃতি ষড়যন্ত্রের, ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার। কিন্তু এবার অবস্থা অন্যরূপ। এবার ইংলণ্ডের যে অবস্থা তাহাতে সকলকেই স্বার্থত্যাগ করিয়া একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে হইবে। সে কার্য্যের ক্ষেত্রও বিশাল,তাহাতে প্রত্যেক নরনারীর স্থান আছে। সর্ব্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও যুদ্ধে জয়ী হইতে হইবে। তিনি প্রথমাবধিই এ যুদ্ধে ইংলণ্ডের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বুঝাইয়াছেন, আর বলিয়াছেন, যুদ্ধ যত দীর্ঘকাল স্থায়ীই হউক না কেন শেষে সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘের জয় অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজদিগকে অহেতুকী ভীতি ও অকারণ চাঞ্চল্য পরিহার করিতে হইবে। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, তখন যেন সকলে বলিতে পারে যে, ইংলণ্ডে এমন গৃহ বা কারখানা নাই যাহা হইতে এই যুদ্ধে সাহায্য হয় নাই। এ আশা ইংলণ্ডের রাজনীতিক তরণীর কর্ণধারের আশা। তাঁহার এই আশা পূর্ণ করিবার জন্য ইংলণ্ডের জনগণ সর্ব্ববিধ স্বার্থত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরব রক্ষার জন্য ইংরাজ সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে।

দেশের কথা।

সকল জাতির ইতিহাসের আলোচনা করিলেই লক্ষিত হয়, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা দেশের লোকের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। যে সকল জাতি নীরস পর্ব্বতের অঙ্গে বাস করে ও বহু শ্রমে শুষ্ক ভূমি হইতে শস্য-সম্পদ উৎপন্ন করিয়া জীবন ধারণে বাধ্য হয়, সে সকল জাতি স্বভাবতঃই কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী, ক্বচিৎ বা উগ্রপ্রকৃতি হয়, সহসা বর্ব্বরতার সব চিহ্ন পরিহার করে না। যে সকল জাতি শস্যশ্যামল প্রান্তরে বাস করে—স্রোতস্বতীর প্রবাহ যাহাদের ভূমিকে উর্ব্বরতা উপহার দিয়া জীবনধারণের উপায়-উদ্ভাবন সহজসাধ্য করিয়া দেয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত কোমলস্বভাব ও অলসপ্রকৃতি হয়। নদীমাতৃক দেশের অধিবাসীরা জলপথে গতায়াতে পটুতা অর্জ্জন করে। সাগরবেষ্টিত দ্বীপবাসীরা জলপথে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ব্যাকুল হয়। সমুদ্র-পরিখা পরিবেষ্টিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরী ও রণতরী দেশজয়ী হইয়াছে। নদীমাতৃক বাঙ্গালার অধিবাসীরা নৌযুদ্ধে ও উপনিবেশ-সংস্থাপনে পটু ছিল। হাইল্যাণ্ডার ও নেপালী পার্ব্বত্যপ্রকৃতি পরিহার করিতে পারে নাই। জার্ম্মাণদিগের অবস্থার বিষয় বুঝিতে হইলে জার্ম্মাণীর প্রাকৃতিক অবস্থা বুঝিতে হইবে।

সমগ্র জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ ৮ হাজার ৪শত ২৭

বর্গ মাইল বা য়ুরোপের অষ্টাদশ অংশের একাংশ। কিন্তু জার্ম্মাণীর সমুদ্রকূলের পরিমাণ অধিক নহে। সেই জন্য জার্ম্মাণগণ জলপথে প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় সফলকাম হইতে পারে নাই জর্ম্মাণীর অধিকাংশ স্থলেই কূলের নিকট সমুদ্র অগভীর—সেই জন্য তথায় বন্দর প্রতিষ্ঠার নানা অসুবিধা। কেবল শ্লেস্‌উইগ হলষ্টিনের পূর্ব্ব দিকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় এবং তথায় জার্ম্মাণগণ রণতরীর জন্য বিশাল বন্দর রচিত করিয়াছে। এই বন্দরের নাম কিয়েল বন্দর। জার্ম্মাণীর অধিকাংশ প্রসিদ্ধ বন্দরই নদীকূলে অবস্থিত। সে সকলের মধ্যে এমডেন, ব্রেমেন, হ্যামবার্গ, লুবেক, ষ্টেটীন, ড্যানজীক, কনিগসবর্গ ও মেমেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানে স্থানে সমুদ্র তরঙ্গ-তাড়ন হইতে তীরভূমি রক্ষার জন্য বাঁধও দিতে হইয়াছে। আবার স্থানে স্থানে বালুবাহুল্যে অভিজ্ঞ নাবিকের নির্দ্দেশ ব্যতীত বন্দরে প্রবেশ করা আশঙ্কাজনক।

জার্ম্মাণীতে পর্ব্বতের ও জলাভূমির অভাব নাই, নদীও অনেক। পর্ব্বতাদি অনেক স্থলেই বনাবৃত—তথায় দ্রাক্ষার চাষ হয়। এমন কি, অনুর্ব্বর আর্জ্জিবাজ্জেও বহু শিল্পকেন্দ্র সংস্থাপিত হওয়ায় বহু লোকের বাস হইয়াছে। জার্ম্মাণীর কয়লার খনিও অনেকগুলি। জার্ম্মাণীতে নয়টি স্বতন্ত্র নদীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু অধিকাংশ নদীর সর্ব্বাংশ জার্ম্মাণীর মধ্যে অবস্থিত নহে। কোন নদী অন্যত্র উৎপন্ন হইয়াছে; কেহ বা জার্ম্মাণী ছাড়াইয়া অন্য রাজ্যের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণীর নদীসমূহের মধ্যে রাইনই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু ইহার উৎপত্তিস্থান ও মোহানা কিছুই জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে নহে। কনস্টান্স হ্রদ হইতে বেসেল পর্য্যন্ত ১২২ মাইল রাইন জার্ম্মাণী ও সুইট্‌জারলণ্ডের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ করিয়া প্রবাহিত; বেসেল হইতে এমারিক পর্য্যন্ত ৪৭০ মাইল, ইহার প্রবাহ জার্ম্মাণীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

জার্ম্মাণীর জলবায়ু পশ্চিম য়ুরোপের সাগরিক জলবায়ুর মতও নহে, আবার পূর্ব্ব য়ুরোপের জলবায়ুর সহিত তাহার সাদৃশ্যও নাই। জার্ম্মাণীতে বৎসরের সকল সময়েই বৃষ্টি হয়, তবে নিদাঘে বর্ষণই অধিক। স্থানভেদে বর্ষণের পরিমাণের তারতম্য হয়। বেভেরিয়ার উচ্চভূমিতে ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর পার্ব্বত্যপ্রদেশেই সমধিক বর্ষণ হয়।

জার্ম্মাণী কৃষিপ্রধান বা কৃষিপ্রাণ না হইলেও বাগান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ধরিলে জার্ম্মাণীর অর্দ্ধাংশে চাষ হয়। জার্ম্মাণরা অপচয় ভালবাসে না; যে ভূমিতে কোন শস্য বা অন্য কোন দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়, সে ভূমি পতিত রাখে না।

জার্ম্মাণীর মধ্যভাগ ও দক্ষিণাংশ বনবহুল। উত্তর-পশ্চিম ভাগে বন নাই। কিন্তু মোটের উপর জার্ম্মাণীতে বন কম নহে, সমগ্র দেশের এক-চতুর্থাংশ বনভূমি। সরকারী বনবিভাগের অধীন বনও অনেক। সেই বিভাগ হইতে বনগ[illegible]ষয়ে বিশেষ যত্ন করা হয়। পূর্ব্বে লোক মনে করিত, দেশে ইন্ধন দান ব[illegible]ত বনের আর কোন উপযোগিতা নাই। এখন কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, বনের সহিত বারিপাতের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বন যত কমাইয়া দেওয়া যায়, দেশে অনাবৃষ্টির আশঙ্কা ততই বর্দ্ধিত হয়। বাঙ্গালায় সুন্দরবন কাটায় সঙ্গে সঙ্গে বারিপাতও কম হইতেছে। তাই আবার সরকার হইতে আইন করিয়া বনরক্ষা করা হইতেছে। জার্ম্মাণীও সযত্নে বনরক্ষা করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জার্ম্মাণীর অনুরাগ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। অল্পদিন পূর্ব্বে 'সায়েণ্টিফিক আমেরিকান' পত্রে কোন লেখক বলিয়াছিলেন, যুদ্ধের শেষে জার্ম্মাণীর উপনিবেশসমূহ যদি জার্ম্মাণীর হস্তচ্যুত হয়, তবে তাহাতে সমগ্র সভ্য জগতের এক হিসাবে ক্ষতি হইবে। জার্ম্মাণীর উপনিবেশসমূহ যে আর্থিক হিসাবে বিশেষ

লাভের হইয়াছে, এমন নহে। কিন্তু জার্ম্মাণ সরকার সে সব দেশে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। সে সব দেশের ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে—সমগ্র দেশে পরীক্ষাগার সংস্থাপিত করিয়া বর্ষণবিষয়ে পরীক্ষা করা হইতেছে। সে সব পরীক্ষার ফল সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার জন্য যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল বৈজ্ঞানিক-দিগের নিকট বিশেষ সমাদৃত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে জার্ম্মাণগণ দেশমধ্যে বনরক্ষাবিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্রই প্রায় এক প্রকার চাষ হয়। তবে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে গমের চাষ কিছু অধিক এবং উত্তর ও পূর্ব্বভাগে যব, জই প্রভৃতির চাষ অধিক। মোটের উপর দেশের সর্ব্বত্র চাষের সুব্যবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। পর্য্যায়ক্রমে শস্যোৎপাদনের ফলে ভূমির উর্ব্বরতাবৃদ্ধির চেষ্টা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। দক্ষিণে এক বৎসর অন্তর জমীতে শস্যের চাষ হয়—আর মধ্য বর্ষে গোল আলু, সিম, মটর প্রভৃতির চাষ করা হয়। কৃষিবিষয়ে উন্নতির চেষ্টা জার্ম্মাণীর সর্ব্বভাগেই দেখা যায়। চিনির জন্য বীটের চাষ ক্রমেই বাড়িতেছে। সরকার হইতে এই কাযে সাহায্য দেওয়া হয়। ফলে বীটের চাষে উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। এ দিকে আবার বৈজ্ঞানিকগণ বীট হইতে কিসে সমগ্র শর্করা নিষ্কাষিত করা যায় সে চেষ্টা করিতেছেন। তাই জার্ম্মাণীর চিনির ব্যবসা সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। এই সরকারী সাহায্যে পুষ্ট চিনির সহিত অসম প্রতিযোগিতায় ভারতের চিনির ব্যবসা বিলুপ্তপ্রায়। পূর্ব্বে এক বাঙ্গালা-তেই প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইত। বাঙ্গালায় প্রধানতঃ খেজুরের চিনি প্রস্তুত হইত। এই চিনিতে কেবল যে বাঙ্গালীর আহার্য্যই মিষ্ট হইত এমন নহে; পরন্তু বিদেশীর আহার্য্যেও মিষ্টত্ব সঞ্চারিত হইত। মোগল

আমলে বিদেশী পর্য্যটক বার্ণিয়ার বাঙ্গলা হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানীর কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এক দিকে জার্ম্মাণীর চিনির ব্যবসার যেমন উন্নতি হইয়াছে, অপর দিকে এ দেশের ব্যবসার তেমনই অবনতি হইয়াছে। নদীয়া, যশোহর, চব্বিশপরগণা—তিন জিলার যে সব স্থানে চিনির ব্যবসার কেন্দ্র ছিল, সে সব স্থানে কারখানাগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চিমনির উপর গাছ জন্মিতেছে, শ্রমজীবীরা কৃষি-কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। আর সেই সব স্থানের বাজারেই বিদেশী বীট চিনি ও বীট চিনিতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিক্রীত হইতেছে। দলুয়াচিনি স্থানে স্থানে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দোবরার পাট উঠিয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে লোক খেজুর বাগান কাটিয়া সেই জমীতে ধানের বা পাটের চাষ করিতেছে।

জার্ম্মাণীতে তামাকের চাষও হইয়া থাকে। বেডেন, বেভেরিয়া ও ফরাসীদিগের নিকট হইতে গৃহীত আলসেস-লোরেন—এই তিন স্থানেই তামাকের চাষ অধিক। শতকরা ৭০ ভাগ দ্রাক্ষার চাষ, প্রধানতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্ম্মাণীতেই নিবদ্ধ; তাহার মধ্যে আবার রাইন নদীর তীরবর্ত্তী স্থানেই চাষ অধিক। এই দ্রাক্ষা হইতে নানারূপ মদ্য প্রস্তুত হয়—বিদেশে রপ্তানীও হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রযত্নে ব্যবসার দ্বারা অর্থার্জ্জনই জার্ম্মাণদিগের উদ্দেশ্য।

জার্ম্মাণীতে পশুচারণ ভূমির বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। সেই জন্য পশুবংশবৃদ্ধিরও শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। বেভেরিয়া প্রভৃতি প্রদেশে জনসংখ্যার অপেক্ষা গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অধিক। ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল ও শূকরই অধিক পালিত হয়। অশ্ববর্দ্ধনবিষয়ে জার্ম্মাণীর সহিত কেবল ইংলণ্ডেরই তুলনা হইতে পারে, অন্য কোন দেশের নহে। যে সকল প্রদেশে ভূমি অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর

বলিয়া কৃষিকার্য্যে লাভ হয় না, সেই সকল প্রদেশেই সযত্নে মেষপাল পালিত হয়। অর্থাৎ কোথাও যেন ভূমি পড়িয়া না থাকে। সুতরাং দেশে মেষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। আবার জার্ম্মাণীতে যে পশমী কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার পশম দেশ হইতেই সঙ্কুলান হয় না—বিদেশ হইতেও আমদানী করিতে হয়। শূকরও পালে পালে পালিত হয়—মাংসের জন্য। গত (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) ডিসেম্বর মাসে জার্ম্মাণীতে ২ কোটি ৫০ লক্ষের অধিক শূকর ছিল। তথায় অনেক স্থানে গোল আলু শূকরের খাদ্য। এবার যুদ্ধের সময় সেই জন্য অনেক স্থলে শূকর মারিয়া ফেলা হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে বন্য জন্তু অধিক নাই। হরিণ প্রভৃতি আছে বটে—কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প। মাঠে, বনে, জলায় পক্ষীর অভাব নাই। এ সব স্বচ্ছন্দবিহারী—বন্য। সারস, কাদাখোঁচা প্রভৃতিও ঋতু বিশেষে জার্ম্মাণীতে দেখা দেয়। লোক হাঁস পুষিয়া থাকে। নদীতে ও হ্রদাদিতে মৎস্যের অভাব নাই। তবে মৎস্যের বৈচিত্র্য বাহুল্যের অনুরূপ নহে। লোক মৌমাছি পুষিয়া থাকে। রেশমের চাষের চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে, এমন বলা যায় না।

জার্ম্মাণীর খনিজ সম্পদপ্রাচুর্য্যহেতু জার্ম্মাণীর শিল্প অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বহুদিন হইতে দেশে কয়লার খনি হইতে কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। সেক্সনী প্রদেশে খৃষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে কয়লা তোলা হইতেছে। তবে পূর্ব্বে অধিক কয়লা তোলা হইত না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ লক্ষ টন কয়লা তোলা হয়। আর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩ কোটি ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টন কয়লা তোলা হয়। তাহার মূল্য ১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। বেভেরিয়ায় প্রচুর পরিমাণে গ্রাফাইট পাওয়া যায়। তাই তথায় পেন্সিলের কারখানা অনেক। কিন্তু জার্ম্মাণীতে কেরসিন অধিক পাওয়া যায় না।

জার্ম্মাণীতে লৌহের অভাব নাই। কোন কোন স্থানের লৌহ অতি উৎকৃষ্ট। লৌহ হইতে ইস্পাতের ব্যবসা বিস্তৃত ও লাভজনক হইয়াছে। ক্রুপের ইস্পাতের কারখানা জগতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। য়ুরোপের অধিকাংশ দেশের কামান এই কারখানা হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। এবার যুদ্ধে এই সব কামানেই জার্ম্মাণীর প্রাধান্য। সমর সরঞ্জামের জন্ম বিদেশের মুখাপেক্ষী হওয়া কত বিপজ্জনক এইবার য়ুরোপ তাহা বুঝিয়াছেন। এবার জার্ম্মাণী হইতে কামান সরবরাহ বন্ধ হইয়াছে; অথচ অন্যান্য দেশে কামান প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজনানুরূপ নহে। জার্ম্মাণীতে যে পরিমাণে রেলের পাটি প্রস্তুত হয় তাহা দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত—তাই বিদেশে অনেক পাটি রপ্তানী হয়। কড়ি বরগাও জার্ম্মাণী হইতে ভারতে পর্য্যন্ত প্রেরিত হয়। আবার জার্ম্মাণীর বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা হইতে সেতুর সরঞ্জামও বিদেশে রপ্তানী হয়। ভারতেও জার্ম্মাণী হইতে এই সব মাল সরবরাহ হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে রেলের এঞ্জিন, গাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সে সব অষ্ট্রীয়ায় ও রুশিয়ায় রপ্তানিও হয়। এখন আর জার্ম্মাণী যুদ্ধের জাহাজের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী নহে; পরন্তু স্বাবলম্বী।

জার্ম্মাণীতে রৌপ্য, স্বর্ণ, সীস, তাম্র ও দস্তাও পাওয়া যায়। রৌপ্যের পরিমাণ অধিক, স্বর্ণের পরিমাণ অল্প। য়ুরোপের আর কোন দেশে এত অধিক রৌপ্য উৎপন্ন হয় না। সীসও রপ্তানী হয়। তাম্র কম পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু তাহাতে দেশের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; সে জন্য বিদেশ হইতে তাম্র আমদানী করিতে হয়। জার্ম্মাণীতে লবণও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, রপ্তানীও হয়।

জার্ম্মাণীতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশের মত জার্ম্মাণীতেও পুরুষের মধ্যে মৃত্যুর হার অধিক

বলিয়াই এই বৈষম্য প্রবল হয়। কারণ, বালিকা অপেক্ষা বালকই অধিক জন্মে কিন্তু বালিকা অপেক্ষা বালকের মৃত্যুর হার অধিক।

সুইডেন, ডেনমার্ক, অষ্ট্রীয়া ও পর্ত্তুগাল বাদ দিলে যুরোপে জার্ম্মাণীতে জারজ সন্তানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন জারজ সন্তানের সংখ্যা কমিয়াছে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি জাতির সবলত্বের পরিচায়ক। সে হিসাবে জার্ম্মাণগণ বিশেষ সবল। বর্ষে বর্ষে বহু জার্ম্মাণ যদি অর্থার্জ্জনের জন্য বিদেশে না যাইত, তবে জার্ম্মাণীতে লোক ধরা দুষ্কর হইত। মার্কিনে, ইংলণ্ডে এমন কি ভারতবর্ষেও বহু জার্ম্মাণ বাস করিয়া অর্থার্জ্জন করিতেছে বা করিয়াছে। তবে তাহারা সকলেই জার্ম্মাণীর প্রতি অনুরক্ত। এমন কি' যে সকল সওদাগর কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসা চালাইয়াছেন ও ইংরেজ সমাজে ও ইংরাজ সরকারের নিকটেও সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহারাই না কি জার্ম্মাণীর গুপ্তচরের কার্য্য করিতেন! তাই এ দেশের ইংরাজগণ জার্ম্মাণদিগকে বন্দী করিয়া রাখিতে বলিয়াছেন এবং বিলাতে জার্ম্মাণীর চরদিগের যেরূপ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের অনুরোধ অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে জার্ম্মাণ রাজনীতিকগণের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রাসিয়ানগণ যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন তাহারা ফ্রান্সের রাস্তার মানচিত্র লইয়া আসিয়াছিল; ফরাসী সরকারের সেরূপ মানচিত্র ছিল না। জার্ম্মাণীর গুপ্তচরগণ ফ্রান্সের সর্ব্বত্র যাইয়া সেই মানচিত্রের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল; সেই অপহৃত উপাদান হইতে প্রাসিয়ানগণ মানচিত্র প্রস্তত করিয়া লইয়াছিল। কিছু দিন হইতে বিলাতের হোটেলগুলিতে জার্ম্মাণ ভৃত্যের আধিক্য লক্ষিত হইতেছিল। জার্ম্মাণ ভৃত্যগণ অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে চাকরী করিত। এখন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারা জার্ম্মাণীর গুপ্তচর—সরকারের খরচে

বিলাতে থাকিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। জার্ম্মাণীর গুপ্তচরগণ আরও নানারূপে বিলাতে বাস করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। জার্ম্মাণী যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এই চরবাহুল্যই তাহার অন্যতম প্রমাণ। ভারতেও যে জার্ম্মাণীর গুপ্তচর ছিল এরূপ সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে।

জার্ম্মাণীর জনসংখ্যা সর্ব্বত্র একরূপ নহে। কোন কোন স্থানে জনসংখ্যা যেমন অধিক আবার কোন কোন স্থানে তেমনই অল্প। শিল্প বহুল দেশে নগরের বাহুল্য অবশ্যম্ভাবী। আর নগর হইলেই তথায় লোকের বাহুল্য হয়। আবার যে দেশে নগর যত অধিক সে দেশে পল্লীতে লোক সংখ্যা তত কম হয়। জার্ম্মাণীতে পার্ব্বত্য প্রদেশেই যে জনসংখ্যা অল্প তাহা নহে, পরন্তু কোন কোন স্থানে প্রান্তরেই জনসংখ্যার অল্পতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থানে জনসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৫০ মাত্র।

জার্ম্মাণীতে গৃহের সংখ্যা লোকসংখ্যার অনুপাতে অল্প নহে।

নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় হইতে জার্ম্মাণীতে রাজপথনির্ম্মাণে বিশেষ মনোযোগ লক্ষিত হয়। বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য তখন নানা খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত; সেই সকল ক্ষুদ্ররাজ্য রাজপথনির্ম্মাণে বহু অর্থব্যয় করিতেন। যখন জার্ম্মাণীতে প্রথম রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কিছু দিন অন্য পথনির্ম্মাণকার্য্য অবহেলিত হইয়াছিল। এখন আবার সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে প্রথম রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তখন রেলপথ প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ অন্তরায় ছিল। বহুধা বিভক্ত দেশমধ্যে বিস্তৃত রেলপথপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে রাজ্যে রাজ্যে যে সকল বন্দোবস্ত করিতে হইত সে সকল সর্ব্বথা সময়সাধ্য ছিল। কাযেই রেল পথ বিস্তারকার্য্য তেমন অগ্রসর হইতে পারিত না। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত এই কারণেই রেলপথবিস্তারকার্য্য বিঘ্নবহুল ছিল। সেই বৎসর পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার উন্নতি হয়। তদবধি জার্ম্মাণীতে রেলপথের বিস্তার বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। জার্ম্মাণীর বাণিজ্য যত বিস্তার লাভ করিয়াছে রেলপথের সাহায্যে পণ্য ততই নানা দিকে প্রেরিত হইয়াছে। আর এই সব রেলপথের সামরিক উদ্দেশ্যসিদ্ধিও হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে পথ যত অধিক খাল সেরূপ নহে।

বেভেরিয়া ও উরটেমবার্গ স্ব স্ব স্বতন্ত্র ডাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্য সকল জার্ম্মাণ রাজ্য একই ডাক বিভাগের অধীন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগদ্বয় সম্মিলিত হয়। তাহার পর ডাকের মাশুল কমাইবার পর হইতে দেশে ডাক বিভাগের কায বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণী জাহাজবিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই উন্নতির আরম্ভেরও পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর নাবিকগণ কার্য্যপটুতার জন্য সমাদৃত ছিল। তখন হামবার্গের বহু জাহাজ বিদেশী বণিকদিগের পণ্য লইয়া গতায়াত করিত।

জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য নানা রাজ্যের সমষ্টি। সকলগুলি সম্মিলিত ভাবে এক শাসন-প্রণালীর দ্বারা শাসিত। প্রাসিয়ার রাজাই সামরিক ও রাজনীতিক সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন—তাঁহার ব্যবস্থাই সর্ব্বত্র গৃহীত। তিনি জার্ম্মাণ সম্রাট্ বা কৈসর নামে পরিচিত। সম্রাট্পদ জ্যেষ্ঠাধিকারনিয়মে নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন রাজ্য হইতে নিযুক্ত ৫৯ জন সদস্য লইয়া সংগঠিত বুন্দেস্‌রাথ সভা কৈসরের কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত রিস্‌টাগ সভাতেও সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপ্রবর্ত্তনের কার্য্য হইয়া থাকে।

কৈসর স্বয়ং আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধঘোষণা করিতে পারেন, সন্ধি করিতে পারেন, বিদেশে দূত নিযুক্ত করিতে পারেন। তবে পররাজ্য গ্রহণার্থ যুদ্ধঘোষণা করিতে হইলে তাঁহাকে সভার মত লইয়া কায করিতে হয়। প্রজাতন্ত্রশাসিত দেশসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে—ইংলণ্ডে প্রজাশক্তির যেরূপ প্রাধান্য সেরূপ আর কুত্রাপি নহে। বহু শতাব্দীব্যাপী চেষ্টার ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ধীরে ধীরে যে অধিকার লাভ করিয়াছে, অন্য দেশে সে অধিকার জনসাধারণের অধিকৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে প্রজাশক্তিই প্রবল—রাজশক্তিও প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সুদৃঢ়। ইংলণ্ডে যে শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত তাহাতে কপটতার অবকাশ অল্প। দেশের লোক প্রশ্ন করিলেই মন্ত্রিগণ তাহার সদুত্তর দিতে বাধ্য। নহিলে তাঁহাদের প্রাধান্য থাকে না। ইহাতে কপটতার অবকাশ থাকে না। কিন্তু যে স্থানে একজন লোক যুদ্ধঘোষণা করিতে বা সন্ধি করিতে পারেন সে স্থানে ব্যবস্থা গোপন রাখা যায়—রাজানুগ্রহভাগী জনকয়েক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কেবল রাজার উদ্দেশ্য জানিতে পারেন। এবার জার্ম্মাণ যুদ্ধে ইহা দেখা গিয়াছে। জার্ম্মাণী যেরূপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন য়ুরোপের অন্যান্য দেশ তাহা জানিতেও পারেন নাই। জার্ম্মাণীর অধ্যাপকগণ দেশ বিদেশে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে লোকের মনে যুদ্ধকামনা প্রবল হইবার সম্ভাবনা; জার্ম্মাণীর লেখকগণ রচনার দ্বারা লোককে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছেন; জার্ম্মাণীর সমর বিভাগ হইতে যে বিশাল আয়োজন হইয়াছে তাহাতে য়ুরোপ আজ স্তম্ভিত। অথচ অন্য দেশে—চর বিভাগের চেষ্টা সত্বেও—এ কথা জানা যায় নাই। কেহ এ কথা বলিলেও রাজনীতিকরা বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। ফরাসী লেখক মিষ্টার ক্লেমেন্‌স বৃটিশ মন্ত্রিসমাজের এই অবিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ ঘোষণার ৪ বৎসর পূর্ব্বে কার্লসবাডে মিষ্টার লয়েড জর্জ্জের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি এই যুদ্ধসম্ভাবনার কথা বলিয়াছিলেন। তখন মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ বলিয়াছিলেন, ফ্রান্স যদি সত্য সত্যই শান্তি-রক্ষা-প্রয়াসী হয়েন, তবে যুদ্ধ কখনই ঘটিবে না। বাস্তবিক কৈসর নিপুণ অভিনেতার মত শান্তিপ্রিয়তার যেরূপ ভাণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে অন্যান্য জাতির পক্ষে প্রতারিত না হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়। এমন কি য়ুরোপের শান্তিরক্ষার্থ প্রচেষ্টার জন্য তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাবও হইয়াছিল! আর এ দিকে তিনি ভীষণ যুদ্ধের জন্য সর্ব্ববিধ আয়োজন করিতেছিলেন।

জার্ম্মাণীর সৈনিকসংখ্যা দেশের জনসংখ্যারই অনুরূপ। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় তদনুসারে প্রত্যেক জার্ম্মাণ পুরুষকেই সৈনিক হইতে হয়; তাহাতে প্রতিনিধি প্রদান চলে না। ২০ বৎসর বয়সের শেষ হইতে ২৮ বৎসরের আরম্ভ পর্য্যন্ত ৭ বৎসর প্রত্যেক অস্ত্রবহনাক্ষম জার্ম্মাণকে সৈনিকের কার্য্য করিতে হয়। এই ৭ বৎসরের ২ বৎসর তাহাকে সত্য সত্যই সৈনিকের কায করিতে হয় —আর ৪ বৎসর "রিজার্ভ" থাকিতে হয়। ইহার পরেও ৫ বৎসর তাহার ডাক পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং মোটের উপর প্রত্যেক জার্ম্মাণকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল সৈনিক হইয়া থাকিতে হয়। তবে যে সকল বিদ্যার্থী উচ্চ শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। জার্ম্মাণ সৈনিকরা বিনা বিচারে সম্রাটের আদেশ পালন করিতে বাধ্য। সম্রাট্ সাম্রাজ্যের যে কোন অংশে প্রয়োজন বুঝিলে দুর্গ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। ফ্রাঙ্কোজার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে দুর্গপ্রতিষ্ঠা-ব্যাপার আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকগুলি পুরাতন ও অনাবশ্যক দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে—সমুদ্র কূলে অনেক নূতন দুর্গ নির্ম্মিত

হইয়াছে, অবশিষ্ট দুর্গগুলি সংস্কৃত হইয়াছে। সমগ্র সাম্রাজ্য কয়টি দুর্গ-বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাতে বন্দোবস্তের সুবিধা হয়। তাহার পর দুর্গসমূহে যে প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন দেশেই দুর্গের নক্সা বা দুর্গের বন্দোবস্ত প্রকাশিত হয় না—সে সব ব্যাপার গোপন রাখা হয়, যে, শত্রুরা জানিতে না পারে। জার্ম্মাণী এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে জার্ম্মাণীর কার্য্যে অবশ্যই য়ুরোপের অন্যান্য দেশে সন্দেহ জন্মিত।

জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বিভাগের নৌবাহিনী অধিক দিনের নহে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মাণরা নৌবাহিনী গঠন করিবার জন্য উদ্যোগী হইলে অর্থ সংগৃহীত হয় এবং কয়খানি যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিতও হয়। কিন্তু শাসন সমিতি এই পরিবর্ত্তনের বিরোধী হওয়ায় অল্প দিন পরেই জাহাজগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়। প্রাসিয়া কিন্তু সেই সময় হইতেই নৌবাহিনী গঠনে প্রবৃত্ত হয়েন। আপনার শক্তি অনুসারে প্রাসিয়া ধীরে ধীরে নৌবাহিনী গঠিত করেন এবং বলটিক সাগরে কার্য্যোপযোগী বন্দরের অভাবহেতু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ওল্‌ডেনবর্গের নিকট হইতে খানিকটা জমী কিনিয়া প্রভূত অর্থব্যয়ে তথায় একটি বন্দর প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উইলহেল্‌মসহেভেন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হলষ্টীন আত্মসাৎ করিয়া প্রাসিয়া কিয়েল বন্দর লাভ করেন। এখন এই বন্দরই প্রধান বন্দর ও বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত। তাহার পর হইতে জার্ম্মাণীর রণতরীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণেরই আধিক্য—তাহার মধ্যে আবার প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সংখ্যা অধিক। জার্ম্মাণীতে ইহুদিও অনেক আছে।

জার্ম্মাণীতে প্রধানতঃ জার্ম্মাণ ভাষাই ব্যবহৃত। পোলিস ভাষা এবং ফরাসী ভাষারও প্রচলন আছে। অন্যান্য ভাষাভাষীর সংখ্যা অল্প।

শিক্ষা বিষয়ে জার্ম্মাণী বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। জার্ম্মাণ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তারকল্পে অকাতরে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সকল জার্ম্মাণের পক্ষেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ অবশ্য-কর্ত্তব্য—সকলেই বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী হইতে বাধ্য। তবে সাম্রাজ্যের সকল ভাগেই যে শিক্ষা দানের আবশ্যক সুব্যবস্থা হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিসাধনে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। পূর্ব্বে শিক্ষকদিগের পারিশ্রমিক অল্প থাকায় অনেক সময় উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর হইত। এক্ষণে সে অবস্থার প্রতীকার হওয়ায় শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য চারি প্রকার বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার চর্চ্চাও হইয়া থাকে। শিল্প বা কারীগরী বিদ্যালয়ে অঙ্কন, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার নানানগরীতে বাণিজ্য-বিদ্যালয়, নৌচালন ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার বিদ্যালয় বর্ত্তমান।

জার্ম্মাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলি। তাহার কারণ, পূর্ব্বে জার্ম্মাণী বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং পোসেন ব্যতীত কোন বৃহৎ প্রদেশেই স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পুরাতনও বটে। লিপজিক বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে ও রষ্টক বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত।

জার্ম্মাণীতে বহু কারীগরী বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীরা নানা প্রকার শিল্পে শিক্ষা লাভ করে।

দেশে শিক্ষাবিস্তারের ও মানসিক উদ্দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশমধ্যে পুস্তকাগারের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান নগরে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানে বহু পুস্তকে পূর্ণ পাঠাগারে দেশের লোক জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে। এই সকল পাঠাগারের মধ্যে বার্লিনের,

মূনিকের, গটিন্‌জেনের, ড্রেস্‌ডেনের, ষ্ট্রাটগার্টের, হামবার্গের, ষ্ট্রাটবার্গের, ফ্রাঙ্কফোর্টের, ব্রেস্‌লুর, গোথার ও উলফেন্‌বাটেলের পুস্তকাগার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল পাঠাগারে কেবল যে জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত পুস্তকই সংগৃহীত হইয়াছে, এমন নহে; পরন্তু নানা দেশের নানা ভাষায় লিখিত পুস্তক ও পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে বহু প্রাচীন পুথি জার্ম্মাণীতে গিয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতের ঐতিহাসিককে উপাদানের জন্য ভারতে ও বিলাতে যেমন তেমনই জার্ম্মাণীতে ও রুশিয়ায়ও যাইতে হইবে। জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভও করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, জার্ম্মাণপণ্যের মত জার্ম্মাণ পাণ্ডিত্যও আবাতসহ নহে; দৃঢ় মজবুদ পণ্য বা পাণ্ডিত্য জার্ম্মাণীতে হয় না; কিন্তু এ মত সর্ব্বত্র সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী জার্ম্মাণরা যেরূপে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছেন—বেদ হইতে সংস্কৃত দর্শন কাব্য নাটক প্রভৃতি যেরূপে জার্ম্মাণীতে পঠিত ও অধীত, সমালোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে তাহা দেখিলে আমরা আমাদের অক্ষমতার কথা উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হই।

জার্ম্মাণীতে জ্ঞানলোচনা ও জ্ঞানবিস্তারকল্পে প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতির সংখ্যাও অল্প নহে। অনেকগুলি সভাসমিতিতে কেবল বিজ্ঞানের আলোচনা হয়। সরকারী ব্যয়ে বা ধনিগণের সাহায্যে এই সকল সভাসমিতিতে বহুবিধ দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের বিশেষ সুবিধা হয়।

জার্ম্মাণীর পরীক্ষাগার বা অবসারভেটরী প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে যে পুস্তকের ব্যবসা দিন দিন বিস্তার লাভ করিবে

তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান কালে পুস্তকের সাহায্যেই জ্ঞান-বিস্তার হয়।

ইংলণ্ডে যেমন কতিপয় পত্রের প্রভূত প্রচার জার্ম্মাণীতে সেরূপ নহে। তথায় পত্রের সংখ্যাধিক্যহেতু প্রচার সীমাবদ্ধ হয়। জার্ম্মাণীর কোন পত্রের 'টাইমস' বা 'ডেলিমেলের' সমান প্রচার নাই। জার্ম্মাণীর সংবাদ-পত্রগুলি যে ইংলণ্ডের সংবাদ পত্রের মত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারে না, তাহাও বোধ হয় তাহাদের প্রচারাল্পতার অন্যতম কারণ। জার্ম্মাণীতে সংবাদপত্রগুলি সরকারের বিরোধী মত প্রচার করিলে দণ্ডিত হয়।

জার্ম্মাণীতে ললিতকলার চর্চ্চা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু শিক্ষাগারে চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্করকার্য্য ও সঙ্গীত—শিখান হয়। সে সকলের মধ্যে বার্লিন একাডেমীই সর্ব্বপ্রধান। সঙ্গীতবিষয়ে লিপজিকের বিদ্যা-লয়েরই প্রাধান্য। দেশের নানা স্থানে চিত্রাদি শিল্পনিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে যেমন লণ্ডনে এবং ফ্রান্সে যেমন প্যারীসেই সংগ্রহের প্রাধান্য জার্ম্মাণীতে সেরূপ নহে। জার্ম্মাণী যখন বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল তখন হইতে যে যাহার শক্তি অনুসারে নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছে। সেই জন্যই বার্লিনের শিক্ষাগারের সংগ্রহ ড্রেস্‌ডেনের, মুনিকের বা কাসেনের সংগ্রহের মত সুসমৃদ্ধ নহে। জার্ম্মাণী রোমে ও এথেন্সে প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্য্যেও অর্থব্যয় করিয়াছেন।

যে জাতি আজ বীরবিক্রমে সম্মিলিতশক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইয়াছে ইহাই সেই জাতির দেশের ও জাতীয় অবস্থা।

ইতিহাস।

যাহারা বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ বলিয়া পরিচিত, তাহারা টিউটনিক জাতির একটি শাখা। টিউটন জাতি আর্য্যপর্য্যায়ভুক্ত। কবে—কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে টিউটনগণ আর্য্য জাতির আদিম সমাজ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কোন জাতির সমাজে লোকসংখ্যা যতই বৰ্দ্ধিত হয়, ততই এক এক দল আহার্য্যের অভাবে এক এক দিকে যাইয়া যে স্থানে সুবিধা পায়, সেই স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করে। শেষে নূতন বাসস্থানের অবস্থায় তাহাদের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া বাসস্থানের অবস্থার অনুকূল হয়। নহিলে তাহাদের বিলোপ অনিবার্য্য। বিজ্ঞবর টেন বলিয়াছেন, যদিও আদি গৃহ হইতে আর্য্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার দেশান্তরগমনের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা যায় না, তথাপি এক দিকে জার্ম্মাণ ও অপর দিকে গ্রীক ও লাটিন জাতি সকলের মধ্যে যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা যে প্রধানতঃ তাহাদের বাসস্থানের প্রভাব-সঞ্জাত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহারা আর্দ্র শীতল, জলাবহুল, জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ডে বা উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল সমুদ্রের তীরে বাস করিত, তাহারা বিষণ্ণ বা সহজে উত্তেজিত হইত—তাহারা মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল ও বিবাদপ্রিয় হইয়া উঠিত। আর যাহারা শান্ত সমুদ্রের কূলে সৌন্দর্য্য-মনোরম দেশে বাস করিত তাহারা নাবিক হইত, ব্যবসা করিত,

শিল্প সাহিত্যে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিত। ভারতীয় আর্য্যদিগের সভ্যতার স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে তাঁহাদের বাসভূমির অবস্থা বিচার করিতে হইবে। এক দিকে শুভ্রতুষারমণ্ডিতশির পর্ব্বত, অপর দিকে বীচিবিভঙ্গবিহ্বল বারিধি; বারিপাতপুষ্টপ্রবাহ স্রোতস্বতী; স্নিগ্ধ শ্যাম বনভূমি; জীবনযাত্রার পথ কুসুমাস্তৃত; ভূমি উর্ব্বর; প্রাকৃতিক ব্যাপারে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত। এই দেশে আসিয়া আর্য্যগণ লোকাতীতের সন্ধান করিয়াছিলেন—সৃষ্টির অন্তরালে স্রষ্টার স্বরূপ বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথম জার্ম্মাণদিগের উল্লেখ দেখা যায়। তখন তাহারা বল্‌টিক সাগরের কূলে বাস করিতেছে। তাহার বহু পূর্ব্বে তাহারা জার্ম্মাণী ও স্কাণ্ডিনেভিয়া দেশদ্বয়ে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে এই দুই দেশবাসী জার্ম্মাণদিগের মধ্যে আবার ভাষাগত, আচারগত ও বিধিগত পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার পর য়ুরোপের মধ্যভাগ বহু জার্ম্মাণ জাতিকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

প্রাচীন জার্ম্মাণরা দীর্ঘকায় ও বলবান ছিল। তাহাদের নয়ন নীল—কেশ দীর্ঘ। তাহারা সামান্য কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে বাস করিত। গৃহের প্রাচীরে রঞ্জিত করিত। সময় সময় গৃহবাসীদিগের সঙ্গে সঙ্গে গৃহপালিত পশুগুলিও গৃহমধ্যে স্থান পাইত। সর্ব্বত্রই গৃহপালিত পশু দুষ্প্রাপ্য হইলে লোক গৃহমধ্যেই তাহাদিগকে স্থান দান করে। তখনও জার্ম্মাণরা কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয় নাই। তাহারা হয় যুদ্ধ করিত, নহে ত শিকারে যাইত। আর যখন যুদ্ধ বা শিকার কিছুই না হইত, তখন অলসভাবে গৃহে সময় কাটাইত। অন্যান্য কায অস্ত্রধারণে অক্ষম পুরুষরা ও রমণীরা করিত। তাহাদের সম্মিলনে প্রায়ই মদের মাইফেল হইত, জুয়াখেলা চলিত, শেষে কলহ হইত। উত্তেজিত হইলে তাহারা নিষ্ঠুর

ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিত বটে; কিন্তু স্বভাবতঃ কোমলহৃদয় ছিল। তাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিরক্ষা করিত ও তাঁহাদের গৌরবগাথা শুনিতে ভালবাসিত।

অধিকাংশ জার্ম্মাণই স্বাধীন ছিল ও অস্ত্র ব্যবহার করিত। তাহাদের দাসেরও অভাব ছিল না। স্বাধীন জার্ম্মাণরাই জমী দখল করিত। পারিবারিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় ছিল। বর কন্যাপক্ষ হইতে যৌতুক পাওয়া দূরে থাকুক—বরকেই কন্যাকে যৌতুক দিতে হইত। তাহাতে কন্যার জীবনস্বত্ব থাকিত। পত্নী সর্ব্বতোভাবে পতির অধীন ছিল। পত্নী বিশ্বাস-হন্ত্রী হইলে তাহাকে প্রকাশ্য বাজারে প্রহার করিবার বা তাহার শিরশ্ছেদনের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু পত্নীকে দণ্ডদান জার্ম্মাণদিগের মধ্যে অঘটন ছিল। কারণ, জার্ম্মাণ মহিলারা সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিত। কাযেই স্বামীরাও স্ত্রীদিগকে সমাদর করিত, তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিত, এমন কি দূরদেশে গমনকালে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইত। পুত্রকন্যারা সর্ব্বতোভাবে পিতার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিত। বালকগণ অস্ত্রচালনে ও বালিকারা গৃহকার্য্যে শিক্ষা পাইত। স্বজনগণের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ জার্ম্মাণগণ কর্ত্তব্য মনে করিত।

কোন কোন স্বাধীন জার্ম্মাণ স্বতন্ত্রভাবে সপরিবারে বাস করিলেও অধিকাংশ লোক এক এক গ্রামে বাস করিত। গ্রামের পার্শ্বস্থ জমী গ্রামবাসীদিগের অধিকৃত ছিল। প্রতি গ্রামে এক জন নায়ক থাকিতেন—তিনি গ্রামবাসীদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। নায়কগণ অনুচর বা সেনা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু জার্ম্মাণ জাতির মধ্যে নায়কের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ছিল। কারণ, জার্ম্মাণগণ প্রজাশক্তির উপাসক ছিল। সকলের সম্মিলিত অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন হইতে পারিত না।

জার্ম্মাণদিগের স্বতন্ত্র সেনা বিভাগ ছিল না। স্বাধীন জার্ম্মাণগণ সকলেই অস্ত্রধারণক্ষম ছিল—প্রয়োজন হইলেই তাহারা অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। সকলেরই ঢাল ও দীর্ঘ বর্শা থাকিত। অশ্বারোহিগণের ঐ ঢাল ও বর্শাই সম্বল ছিল। পদাতিকগণ অন্য অস্ত্রেরও ব্যবহার করিত—গদা ও কুঠার চালনেও পটু ছিল। জার্ম্মাণরা গান করিতে করিতে বা চীৎকার করিতে করিতে শত্রুর প্রতি ধাবিত হইত; শব্দ বিকট করিবার জন্য তাহারা মুখে ঢাল চাপা দিত। ভয়ে ঢাল ফেলিয়া দেওয়া জার্ম্মাণদিগের নিকট অত্যন্ত লজ্জার ও দোষের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং কোন জার্ম্মাণ ভীতিবশে এরূপ কায করিলে লজ্জায় ও ক্ষোভে আত্মহত্যা করিয়া আত্মগ্লানির বহ্নি নির্ব্বাপিত করিত।

জার্ম্মাণদিগের বিশ্বাস ছিল, তাহারা টুইস্কো দেবতার পুত্র, প্রথম মানব মন্নাসের বংশোদ্ভূত। ধর্ম্মবিশ্বাসে তাহারা স্কাণ্ডিনেভিয়ানদিগেরই অনুরূপ ছিল। উটান বা ওডান তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। জার্ম্মাণ পুরাণে ভাগ্যদেবীরা তিন ভগিনী—দুইজন সুন্দরী ও সুশীলা, তৃতীয়া কৃষ্ণবর্ণা ও ক্রূরচিত্তা। দেবতাগণ ব্যতীত পুরাণে দৈত্যাদিরও উল্লেখ ছিল। সজ্জনগণ মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইতেন, ইহাই লোকের বিশ্বাস ছিল। সজ্জন বলিলে কিন্তু বীর—যোদ্ধা বুঝাইত। বিশেষ যাহারা সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিত, তাহাদের স্বর্গপ্রাপ্তিবিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। জার্ম্মাণরা ধর্ম্মানুরক্ত ছিল এবং বিশেষ যত্নসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিত। হিন্দুদিগের মত তাহাদিগেরও প্রত্যেক দেবদেবীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পর্ব্ব ছিল। দেবদেবীর উদ্দেশে বলিদানও ছিল। দেবতার অভিপ্রায় অশ্বের হ্রেষায়, পক্ষীর গমনে—ব্যক্ত হইত বলিয়া লোক বিশ্বাস করিত। এরূপ

বিশ্বাসপরায়ণ জাতির উপর পুরোহিতদিগের যে প্রগাঢ় প্রভাব ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

জার্ম্মাণ জাতির যে দুই দল জার্ম্মাণীর উত্তর কূল হইতে অন্যত্র গিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত রোমানদিগের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় হয়। তাহার পর রোমানদিগের সহিত জার্ম্মাণদিগের একাধিক যুদ্ধ হয়। শেষে জুলিয়াস সীজার রাইন পার হইয়া আসিয়া জার্ম্মাণদিগকে পরাভূত করেন। কিন্তু জার্ম্মাণীতে তাঁহার জয়ের কোন স্থায়ী চিহ্ন থাকে নাই। তবে প্রবল রোমানদিগের প্রভাব মুখ্যভাবে না হইলেও গৌণভাবে বর্ব্বর জার্ম্মাণদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কোন কোন জার্ম্মাণ রোমানদিগের অধীনে চাকরীও করিত। অগষ্টসের সময় রোমানগণ প্রকৃত পক্ষে জার্ম্মাণদিগকে জয় করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫ বৎসরের গ্রীষ্মকালে ড্রুসাস ও টাইবিরিয়াস জার্ম্মাণী অষ্ট্রীয়া বেভেরিয়া জয় করিয়া জার্ম্মাণ দেশ অধীন করিতে আদিষ্ট হয়েন। জার্ম্মাণগণ তখন নানাদলে বিভক্ত এবং দলে দলে বিবাদ বাধিয়াই থাকিত। সুতরাং রোমানগণ কতকগুলি দল পক্ষভুক্ত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। ড্রুসাস ইজেল ও রাইন নদীদ্বয়ের মধ্যে একটি খাল কাটান ও গল রক্ষার্থ অন্যূন ৫০টি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু রোমানদিগের এই প্রাধান্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই, খৃষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভেই ভেরাস যখন রোমের পক্ষ হইতে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার কঠোর ব্যবহারে জার্ম্মাণগণ বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করে। আর্ম্মিনিয়াস তাহাদের নায়ক হয়েন। তিনি রোমানদিগের সেনাদলে কার্য্য করিয়া যুদ্ধকৌশলে পটুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কোন জার্ম্মাণসম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ভেরাস তাহাদিগের দমনার্থ অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে

লুক্কায়িত জার্ম্মাণগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে। তিন দিন ব্যাপী যুদ্ধে রোমান সৈন্য বিনষ্ট হয় ও ভেরাস মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু আত্মকলহাদিতে বিব্রত জার্ম্মাণগণ পররাজ্যজয়ের চেষ্টা করিতে পারে নাই এবং কয় বৎসর পরেই রোমানগণ পুনরায় জার্ম্মাণদিগকে আক্রমণ করে। ডুরুসামের পুত্র আবার জার্ম্মাণদিগকে পরাভূত করিয়া রোমের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সহজে জার্ম্মাণদিগকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। যে বনে ভেরাসের সেনাদল বিনষ্ট হয়, সেই বনে আবার দুইদলে শক্তিপরীক্ষা হয়। রোমানগণ পরাভূত না হইলেও তাহাদের যেরূপ বলক্ষয় হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের জয়েও সুখ হয় নাই। পরবৎসর তিনি দুইটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু সেবারও অতিরিক্ত বলক্ষয়হেতু তাঁহার সেনাদল জাহাজে আশ্রয় লয় ও সেই সব জাহাজ ঝটিকায় বিনষ্ট হয়। কিন্তু আর্ম্মিনিয়াসের পত্নী রোমানদিগের নিকট বন্দিনী হইয়া রোমে প্রেরিত হয়েন।

রোমানগণ প্রত্যাবৃত্ত হইলে আর্ম্মিনিয়াস দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা লইয়া বিব্রত হইলেন, বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই আর্ম্মিনিয়াসের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু তাঁহার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহার ক্ষমতাধিক্যে অন্যান্য দলপতিগণের মনে ঈর্ষ্যার ও আশঙ্কার উদয় হয় এবং তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ৩৭ বৎসর বয়সে আর্ম্মিনিয়াস মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

রোমানরা প্রকাশ্যভাবে জার্ম্মাণদিগকে পরাভূত করিয়া অধীনতা স্বীকার করাইতে পারিল না বটে, কিন্তু তৎকালে য়ুরোপের কোন জাতির পক্ষে রোমানদিগের প্রভাব অতিক্রম করা দুঃসাধ্য—অসম্ভব ছিল। জার্ম্মাণগণ সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। রোমানগণ যে স্থানেই রাজ্যবিস্তার করিত, সেই স্থানেই রাজপথগঠন ও প্রাচীর-

পরিবেষ্টিত দুর্গপ্রতিষ্ঠা করিত। এখনও জার্ম্মাণীর নানাস্থানে সেই সকল দুর্গের চিহ্ন দেখা যায। রোমানগণ যে স্থানে দুর্গপ্রতিষ্ঠা করিতেন, সেই স্থানেই ক্রমে নগর বসিত। রোমানদিগের দুর্গ হইতে রোমান সভ্যতা চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া সমগ্র দেশে নূতন প্রভাব সংস্থাপিত করিত। কনষ্টান্স হইতে ডানিউব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বহু রোমান কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে বেলজিয়মও আংশিক ভাবে জার্ম্মাণ ছিল বলা যাইতে পারে। বেলজিয়মে ট্রিভস সহর প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান নগরের ঐশ্বর্য্যের কথা সর্ব্বজনবিদিত—জগতের সকল দেশ হইতে সংগৃহীত সম্পদে সে সকল নগর সমৃদ্ধ হইত। সেই সকল নগরের মধ্যে ট্রিভস ঐশ্বর্য্য-গৌরবে কোন নগর হইতে ন্যূন ছিল না। এমন কি রোমান সম্রাটগণও সময় সময় ট্রিভসে আসিয়া বাস করিতেন।

এইরূপে রোম প্রত্যক্ষভাবে জার্ম্মাণদিগকে পরাভূত করিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে পরাভূত করিয়া আপনার প্রভাবে তাহাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিল। রোমান সভ্যতা ও গ্রীক সাহিত্য য়ুরোপের উন্নতির কারণ—এই দুইটি উপাদানেই য়ুরোপের সভ্যতা ও সাহিত্য সংগঠিত। ইহারাই যুগে যুগে য়ুরোপের মানসিক উদ্দীপ্তির বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। অসভ্য জার্ম্মাণগণও পরোক্ষভাবে রোমান প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছিল। নহিলে তাহাদের "আঁধার রজনী" প্রভাত হইতে অনেক বিলম্ব হইত।

লোক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তন করে। জার্ম্মাণগণ রোমানদিগের সহিত বিরোধকালে সম্মিলিত হইয়া পদ্ধতিবদ্ধভাবে কায করিতে শিখিয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে আর নানা জার্ম্মাণদলের উল্লেখ পাওয়া যায় না; তখন তাহারা আত্মরক্ষা ও পররাজ্য আক্রমণজন্য দলবদ্ধ হইতে শিখিয়াছে। তাহাদের মধ্যে গথ

দল তখন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভ্যাণ্ডাল. বার্গাণ্ডিয়ান ও হেরুলীরা তখন এই দলভুক্ত। ফ্রাঙ্কগণ তখনও তেমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু উত্তরকালে তাহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাহারা রাইনের কূলে বাস করিত।

গথরাই সর্ব্বাগ্রে একটি রাজ্য সংস্থাপিত করে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাহাদের রাজ্য বল্‌টিক সাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হূণগণ যখন পঙ্গপালের মত এসিয়ার উচ্চভূমি হইতে য়ুরোপে আসিয়া পড়ে, তখনই সে রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। হূণদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, গথদিগের অনেকে পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভেই স্থানান্তরে আশ্রয়-সন্ধানে বাহির হইয়াছিল এবং বার্গাণ্ডিয়ানরা রোমানদিগের নিকট হইতে রোম উপত্যকা কাড়িয়া লইয়া তথায় উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিল। কেহ কেহ স্পেন পর্য্যন্ত গিয়াছিল। কেহ কেহ ইটালীতে যাইয়া রোমনগরও অধিকৃত করিতে পারিয়াছিল। এই সকল ঘটনা হইতে জার্ম্মাণদিগের রণপটুতার, সাহসের ও শ্রমশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এ দিকে আর্য্যজাতির আর এক শাখা শ্লাভগণ হূণদিগের অত্যাচারে স্বাভাবিক আলস্য পরিহার করিয়া জার্ম্মাণদিগের পরিত্যক্ত ভূমি দখল করে। প্রকৃতপক্ষে হূণদিগের আক্রমণে য়ুরোপে একটা ভাঙ্গাগড়া হইয়াছিল। য়ুরোপের বর্ত্তমান বিভাগ অনেক পরিমাণে সেই ভাঙ্গাগড়ার ফল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আবার হূণগণের অত্যাচার বহু য়ুরোপীয় জাতিকে বিশেষতঃ জার্ম্মাণদিগকে নূতন দেশের সন্ধানে উৎসাহিত করিয়াছিল।

ফ্রাঙ্কগণের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এই ফ্রাঙ্কগণই জার্ম্মাণ ও ফ্রেঞ্চ রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিল। ইহারা রোমানদিগের সহিত বন্ধুত্ব

অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল এবং অনেক ফ্রাঙ্ক রোমান সেনাদলে কায করিত। কিন্তু সুবিধা পাইলেই তাহারা রোমানদিগকে বিপন্ন করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতে দ্বিধা করিত না। রোমানদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে ফ্রাঙ্কদিগের মধ্যে রাজার সম্মান ও সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অন্যান্য জার্ম্মাণজাতির রাজার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ছিল; কিন্তু রোমানদিগের দৃষ্টান্তে ফ্রাঙ্কগণ রাজাকে অধিক ক্ষমতাশালী করিয়াছিল।

ফ্রাঙ্কদিগের রাজপরিচয়প্রদান অনাবশ্যক বোধে আমরা কেবল তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান কাযেরই উল্লেখ করিব। ইঁহাদিগেরই একজন যুদ্ধকালে প্রতিজ্ঞা করেন যে, খৃষ্টানদিগের ঈশ্বর যদি তাঁহাকে যুদ্ধে জয়ী করেন, তবে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি খৃষ্টান হয়েন। বলা বাহুল্য, তখন খৃষ্টান বলিলে বর্ত্তমান সময়ের ক্যাথলিকদিগকেই বুঝাইত। তিনি যেমন রণপটু ছিলেন, আবার তেমনই স্বার্থসর্ব্বস্ব ছিলেন। তিনি জয়ী হইয়া অন্যান্য ফ্রাঙ্ক নায়কগণকে নিহত করিয়া, সমস্ত শক্তি আপনাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া, বিশাল রাজ্য সংগঠিত করেন। তখনই প্যারিস রাজধানী হইয়াছে। তাঁহার চারি পুত্র ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যের একতা নষ্ট করেন নাই—কিন্তু এক এক জন রাজ্যের এক এক ভাগ লইয়াছিলেন। যুদ্ধাদিকালে সকলে সম্মিলিত হইয়া কায করিতেন। সুতরাং শত্রুগণ তাঁহাদিগকে ভয় করিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার রণপটুতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিষ্ঠুরতারও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি অবলম্বিত উপায়ের ন্যায়ান্যায়-বিচার প্রয়োজন মনে করিতেন না। তিনি ছলে পররাজ্য জয় করিয়া রাজ্যবিস্তারে সফলকাম হইয়াছিলেন। তখন রাজ্যলাভ ও রাজ্যবিস্তারকার্য্যে কোনরূপ পাপই পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত না এবং মহিলারাও

স্বামীর উৎসাহবর্দ্ধনে সাহায্যকালে ন্যায়ান্যায়-বিচারবুদ্ধি পরিহার করিতেন।

ফ্রাঙ্ক রাজাদিগের প্রবল প্রতাপ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত রাজগণ অবশেষে আভিজাত্য-গর্ব্বিত সম্প্রদায়ের হস্তে ক্ষমতা দিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে তাঁহাদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা শোভার্থমাত্র রাজা হইয়া রহিলেন। বংশপতির ক্ষমতা অনেক স্থলেই উত্তরাধিকারিগণে বর্ত্তে না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। শেষে রাজারা বৎসরে এক দিন—মার্চ্চ মাসের প্রজাসভায় প্রজাদিগকে দর্শন দিলেন। তাঁহারা গোযানে প্রজাসভায় আসিতেন—তাঁহাদের সুদীর্ঘ কেশ কটি পর্য্যন্ত লম্বিত থাকিত এবং মস্তকে মুকুট শোভা পাইত। প্রাসাদে তাঁহারা কেবল বিলাসব্যসনে ব্যাপৃত থাকিতেন।

যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে পেপিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষে পেপিন ও কার্‌লামেন দুই ভ্রাতার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। কিন্তু কার্‌লামেন যুদ্ধে বিরক্তিবশতঃ সকল ক্ষমতা ভ্রাতাকে দিয়া স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পেপিনের কাযের অন্ত ছিল না; কিন্তু তখনও তিনি নামে রাজার অধীন। রাজা প্যারিসে বিলাসে ব্যস্ত। পেপিন চাহিয়াও তাঁহার নিকট কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া পোপকে লিখিলেন, "রাজা কে?—যে শাসন করে সে, না যে মুকুট পরিধান করে সে?" পোপ উত্তর দিলেন, "যে শাসন করে, সে-ই রাজা।" তখন পোপের সম্মতি পাইয়া পেপিন রাজাকে মঠে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। বনিফিস তাঁহার অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এই বনিফিসই জার্ম্মাণদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি

ধর্ম্মপ্রচারোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া জার্ম্মাণদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পায়েন। এ কার্য্যে তিনি পোপের অনুমতি লইয়াছিলেন। বনিফিস দেশের লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া যাহাতে সফলকাম হইতে পারেন, এমন ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। হেসে একটি প্রকাণ্ড ওক গাছ দেবস্থানরূপে পূজিত হইত। দেশের লোক তথায় পূজা দিত। এক দিন যখন সেই বৃক্ষতলে বহু লোক সমাগম হইয়াছে, তখন বনিফিস একক কুঠারহস্তে তথায় উপনীত হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া বৃক্ষকাণ্ডে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। স্তম্ভিত জনতা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল, বজ্রাঘাতে বনিফিসের মৃত্যু হইবে। বৃক্ষ কর্ত্তিত হইল; কিন্তু বনিফিসের কোন অনিষ্ট হইল না। তখন লোক তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিল। বনিফিস বুঝিলেন, কেবল ধর্ম্মপ্রচারদ্বারাই জার্ম্মাণদিগের উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না। তাই তিনি যে যে স্থানে সম্ভব বিদ্যালয় ও মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মঠের সন্ন্যাসীরা ধর্ম্মপ্রচার ও বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানারূপ উন্নতির ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারা জলাভূমির জলনিকাশের, জমী চাষের, শস্য উৎপাদনের, ফল গাছ রোপণের ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার সুব্যবস্থা করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের চেষ্টাতেই জার্ম্মাণজাতির উন্নতির সূত্রপাত হয়। মঠের সন্ন্যাসীরা যাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন, মঠের নিকট কুটীরে তাহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এইরূপে ক্রমে জার্ম্মাণীতে নগরের পত্তন হয়।

ইহার অল্প দিন পরে জার্ম্মাণীতে একজন শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব হয়। তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সার্ল্‌মেন। তিনি বীর ও যোদ্ধা, রাজনীতিক ও ব্যবস্থাকার, বিদ্যাপ্রিয় ও কবিতামোদী ছিলেন। ৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতার মৃত্যুতে সমগ্র দেশের অধিপতি হইয়া পেপিনের

পুত্র সার্লামেন দেশজয়ে ও দেশে, শৃঙ্খলাস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফ্রাঙ্কগণ জার্ম্মাণী জয় করা পর্য্যন্ত স্যাক্সনগণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে বিব্রত হইতেছিল। স্যাকসনগণ কিছুতেই ফ্রাঙ্কদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়া তাহাদের পদানত হইতেছিল না। তাই সার্লামেন প্রথমেই স্যাকসনগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া, অজেয় বলিয়া কীর্ত্তিত—ইরেসবার্গের দুর্গ অধিকৃত করিলেন এবং তাহাদিগের পূজিত একটি স্তম্ভ চূর্ণ করিয়া দিলেন। তাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া স্যাক্সনগণ পরাভব স্বীকার করিল। কিন্তু সার্লামেন বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার শত্রুগণ একটিমাত্র যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নহে। তাহারা সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতালাভের ও বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টা করিবে। বাস্তবিক তাঁহাকে ত্রিশ বৎসরের অধিককাল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি চারি হাজার পাঁচ শত বন্দীর প্রাণনাশ করিয়া নৃশংস বর্ব্বরতায় তাহাদিগের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করিতে চাহেন। কিন্তু এই দুর্ব্ব্যবহারে স্যাকসনগণ আরও বিরক্ত হয়। শেষে বলক্ষয়ে বিপন্ন হইয়া তাহারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে ফ্রাঙ্করাজ্যের বিপদের অবসান হইল এবং সমগ্র জার্ম্মাণী একজন শক্তিশালী রাজার অধীন হইল।

৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসরে সার্লামেন ৫৩ বার যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। স্যাক্সন্, লম্বার্ড ও আরবদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান বিপদসঙ্কুল ও বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। সার্লামেনের রাজ্যও বিশাল হইয়াছিল। তিনি প্রায় সমগ্র জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, সুইটজারলণ্ড এবং ইটালীর ও স্পেনের উত্তর ভাগ রাজ্য-

ভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল জাতিকে শাসন করিতেন, তাহাদের মধ্যে একতা ছিল না; পরন্তু তাহাদের প্রকৃতি ও আচার ব্যবহার, ভাষা ও ধর্ম্ম—সবই স্বতন্ত্র ছিল। এই সব জাতিকে শাসন করিয়া সমগ্র রাজ্যে শৃঙ্খলাসংরক্ষণ সার্লামেনের অসাধারণ ক্ষমতারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বেভেরিয়ার শাসক বহুদিন সার্লামেনের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই, কিন্তু সার্লামেন তাঁহাকে পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া বেভেরিয়া স্বরাজ্যের প্রদেশে পরিণত করেন। তখন তৃতীয় লিও রোমের পোপ। ৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। রাজপথে তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত ও জিহ্বা কর্ত্তিত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, সার্লামেন এই ব্যাপারের অনুসন্ধানজন্য রোমে গমন করেন এবং অপরাধীদিগকে বন্দী করিয়া ফ্রান্সে পাঠাইয়া দেন। খৃষ্টমাসের সময় সার্লামেন স্বদলে রোমেই উপস্থিত ছিলেন। সে দিন সকলেই ভজনালয়ে উপস্থিত হইলেন। উপাসনা হইয়া গেল। তখন কৃতজ্ঞহৃদয় পোপ একটি বহুমূল্য মুকুট আনিয়া সার্লামেনকে পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর সম্রাটকে জয়যুক্ত ও দীর্ঘজীবী করুন।" সকলেই জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। এই সম্মান সার্লামেনের আকাঙ্ক্ষিত ছিল কি না, জানা যায় না; কিন্তু তিনি যে এই অতর্কিত সম্মানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাহা বুঝা যায়।

সম্রাট্ সম্মানলাভের পর সার্লামেন ১৪ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, এবং সেই সময়ের মধ্যে রাজকার্য্যে বিশেষ উন্নতি সংসাধন করিয়াছিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, তখনও তিনি রাজ্যরক্ষার উপায় চিন্তাতেই মনোনিবেশ করিলেন। একুসে তিনি একটি গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার

সামন্তদিগকে তথায় আহ্বান করিলেন। তিনি বেদীর উপর আপনার মুকুট স্থাপিত করিয়া সমবেত সামন্তদিগের সম্মুখে পুত্র লুইসকে বলিলেন—"ঈশ্বরকে ভয় করিও, প্রজাদিগকে আপনার সন্তানবৎ স্নেহ করিও, যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহাই করিও, ন্যায়বিচার করিও।" পুত্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতার আদেশপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "তবে এই মুকুট লইয়া মস্তকে পরিধান কর। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা কখনও বিস্মৃত হইও না।" তাঁহার মৃত্যুর পর রাজবেশসজ্জিত মুকুটপরিহিতমস্তক শব মর্ম্মরসিংহাসনে বসাইয়া সমাহিত করা হয়। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার তরবার, একখানি বাইবেল ও যাত্রীর থলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পোপ যখন সার্‌লামেনকে সম্রাট্ বলিয়া অভিহিত করেন, তখন অগষ্টসের গৌরবোদ্ভাসিত রোমান সাম্রাজ্য ম্লানগৌরব হইয়াছে; কনষ্টান্‌টাইন রাজধানী রোম হইতে বৈজম্‌সিয়মে (কনষ্টাণ্টিনোপল) স্থানান্তরিত করিয়াছেন। কনষ্টাণ্টিনোপল এক সময় রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়াই আজও মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানকে রুমের (রোমের) বাদশাহ বলিয়া থাকেন। তখন নানা ষড়যন্ত্রের পর কোন রমণী স্বীয় পুত্রকে দৃষ্টিহীন করিয়া অগষ্টসের সিংহাসন লাভের উদ্যোগ করিতেছিল। প্রতীচ্য খণ্ডের প্রজারা ইহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই পোপ যখন সার্‌লামেনকে সম্রাট্ বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন; তখন তাহারা তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিল। তখন পোপ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত না হইলে কোন জার্ম্মাণ রাজা সম্রাট্ বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। পোপ তখন ধর্ম্মব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা এবং খ্রীষ্টের রাজ্যে তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া পূজিত। কিন্তু যুদ্ধাদি তাঁহার পক্ষে শোভন নহে বলিয়া, তিনি ধর্ম্ম জগতের কর্ত্তৃত্ব স্বয়ং

রাখিয়া রাজ্যশাসনভার সম্রাটকে প্রদান করিতেন। পোপের ক্ষমতা তখন কেহই অস্বীকার করিতে পারিত না।

লুইস পিতার আকৃতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি লাভ করেন নাই। তিনি সঙ্কীর্ণহৃদয়, অব্যবস্থিতচিত্ত, ক্রোধপ্রবণ ছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। সার্লামেন পুত্র পেপিনের পুত্র বার্ণার্ডকে ইটালীর রাজা করিয়াছিলেন। পাছে সে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় এই আশঙ্কায় লুইস তাহাকে তাঁহার কাছে আসিতে আদেশ দেন। সে আসিতে ইতস্ততঃ করিলে তিনি স্বীয় পত্নীকে দিয়া তাহাকে অভয় দেন, "তাহার কোন অনিষ্ট করা হইবে না।" কিন্তু সে আসিলে তিনি তাহার চক্ষু উৎপাটিত করান এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। অল্পদিন পরে রাণীর মৃত্যু হইলে—তাহা তাঁহার পাপের ফল ভাবিয়া লুইস অনুতপ্ত হইয়া ধর্ম্মে মন দিয়া "ধার্ম্মিক" উপাধি লাভ করেন। তিনি আপনার তিন পুত্রকে রাজ্যের তিন ভাগ দিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে দ্বিতীয়া পত্নী জুডিথের প্ররোচনায় তাঁহার গর্ভজাত পুত্র চার্লসকে রাজ্যের এক অংশ দেন। ইহাতে তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রত্রয় বিদ্রোহী হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে বন্দী করেন। কিন্তু পুত্রদিগের, বিশেষ জ্যেষ্ঠপুত্র লোথেয়ারের, নিষ্ঠুর ব্যবহারে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হয়। মধ্যম পুত্রও পিতার পক্ষাবলম্বন করেন। তখন লোথেয়ার পিতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু তিনি ক্রোধবশে পিতার পক্ষাবলম্বী চালনসবাসীদিগের গৃহাদি দগ্ধ করেন এবং পিতার মন্ত্রীর পুত্র-কন্যাকে নিহত করেন। কন্যাটিকে বিদ্যালয় হইতে আনিয়া মদ্যের পিপায় পূরিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর লুইস লোথেয়ারকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট তিন পুত্রকে রাজ্য দেন। কিন্তু তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, পুত্রদিগের বিবাদ

ভঞ্জনের চেষ্টাই করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ৮৪০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তিনি পুত্রদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন—এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন এক ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্র লোথেয়ার আপনাকে সম্রাট্ ঘোষণা করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে অধীনতা স্বীকার করিতে বলেন। তাঁহারা তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা যুদ্ধে জ্যেষ্ঠকে পরাভূত করেন। এই যুদ্ধে লোথেয়ারের অত্যন্ত বলক্ষয় হয়। কিন্তু লোথেয়ার আশায় ও উৎকোচে বশীভূত করিয়া স্যাক্সনদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলেন। তখন বিপদ দেখিয়া অন্য দুই ভ্রাতা মিলিত হইয়া পরস্পরের সাহায্য করিবেন—এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। লুইস ফরাসী ভাষায় ও চার্লস জার্ম্মাণ ভাষায় প্রতিজ্ঞা করেন। ফরাসী ভাষার উল্লেখ ইতঃপূর্ব্বে আর পাওয়া যায় না। যাহাহউক পরবৎসর (৮৪৩ খৃষ্টাব্দ) ভারডামে তিন ভ্রাতায় সন্ধি সংস্থাপিত হয়। তাহাতে লোথেয়ার সম্রাট্ উপাধি লাভ করেন। নেদারল্যাণ্ডস, রাইন-সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ, বার্গাণ্ডী ও ইটালী—তাঁহার অংশে প্রদত্ত হয়। চার্লস যে অংশ পায়েন তাহাই বর্ত্তমানে ফ্রান্স নামে পরিচিত। আর লুইস জার্ম্মাণীর অধিকাংশ পায়েন। এইরূপে বহু বিবাদের পর সন্ধি-সর্ত্তে ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণী একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। এই সময় হইতে জার্ম্মাণীর ইতিহাস ফ্রান্সের ইতিহাস হইতে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইবে। এই বিভাগে সার্লামেনের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন করা ভ্রাতৃত্রয়েরও অভিপ্রেত ছিল না। তখনও বাহিরের ব্যবহারে তিন ভাগে বিভক্ত রাজ্য একই রাজ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইত। কিছুকাল পরে রাজ্য একবার সম্মিলিতও হইয়াছিল। এই বিভাগের সময় যে, জার্ম্মাণীতে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন কথা বলা যায় না। তখনও

তাহার বিলম্ব ছিল। কিন্তু এই সময় হইতে জার্ম্মাণী এক জন স্বতন্ত্র রাজার শাসনাধীন হইয়া, ক্রমে স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে। সেই জন্য এই সন্ধিই জার্ম্মাণীর ও ফ্রান্সের ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্যের আরম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে এবং এই সময় হইতে দুই দেশের উন্নতির প্রবাহ—রাজনীতিক ঘটনায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া স্ব স্ব স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত হয়।

কিন্তু একবার ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনোমালিন্য আত্মপ্রকাশ করিলে তাহা বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ভ্রাতায় ভ্রাতায় রাজ্য লইয়া বিবাদ চলিতে লাগিল। এই বিবাদের অনিবার্য্য ফল—বলক্ষয় ও দৌর্ব্বল্য। সেই দৌর্ব্বল্যের সুযোগে জার্ম্মাণীতে এক নূতন উৎপাতের আরম্ভ হইল। নর্থমেন পূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপের নানাস্থানে লোকের উপর অত্যাচার করিতেছিল। তাহারা নৌকায় আসিয়া জলকূল-সান্নিধ্য-সমৃদ্ধ নগরাদির সর্ব্বনাশ করিত। ফ্রান্সে তাহারা নরমাণ্ডী প্রতিষ্ঠিত করে। ইংলণ্ডের রাজা আল্‌ফ্রেড তাহাদিগকে পরাভূত করা কষ্টসাধ্য বুঝিয়াছিলেন—ইংলণ্ডেও তাহারা নর্থাম্ব্রিয়া রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করে। সারলামেনের রাজত্বকালে তাহারা তাঁহার ভয়ে জার্ম্মাণীতে উপদ্রব করিতে পারিত না। কথিত আছে, এক দিন প্রাসাদ-বাতায়ন-পথে সমুদ্রে জলচর বিহঙ্গমের মত নর্থমেন-তরী দেখিয়া, তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—এ সব তরী নূতন বিপদের সূচনা করিতেছে। তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের রাজত্বকালে ইহারা জার্ম্মাণী আক্রমণ করিয়া জার্ম্মাণদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিল।

এদিকে আবার ম্যাগেয়ার বা হাঙ্গেরিয়ানগণ স্থলপথে জার্ম্মাণদিগকে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিতে লাগিল। বর্ষে বর্ষে তাহারা

এ দেশের মার্হাট্টাদিগের মত লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তাহারা নগর দগ্ধ করিত, গির্জ্জা লুঠিয়া লইত, জার্ম্মাণদিগকে নিহত বা বন্দী করিত। জার্ম্মাণদিগের অস্ত্রের মধ্যে—তরবার আর গোলাকার গুরুভার দ্রব্য-বদ্ধ শৃঙ্খল—তাহারা সেই শৃঙ্খল ফেলিয়া শত্রুর মস্তকে আঘাত করিত। কিন্তু এ সব অস্ত্রে দূর হইতে যুদ্ধ করা চলে না—শত্রু নিকটবর্ত্তী হইলে আক্রমণ করা যায়। হাঙ্গেরিয়ানগণ অশ্বারোহণে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইত—তীর ধনুক ব্যবহার করিত। কাযেই জার্ম্মাণরা হাঙ্গেরিয়ান-দিগের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিত না। সময় সময় হাঙ্গেরিয়ানগণ পরাভূত জার্ম্মাণদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। তাহারা কাউণ্ট উলরিককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পত্নীর সৌন্দর্য্য-খ্যাতি দেশে ব্যাপ্ত ছিল। পত্নী বহুদিন পতির সংবাদ না পাইয়া তাঁহাকে মৃতজ্ঞান করিলেন; কিন্তু আর বিবাহ করিলেন না; বিলাস-বর্জ্জিত ভাবে বাস করিয়া কেবল লোকহিত করিতে লাগিলেন। কয় বৎসর কাটিয়া গেল। এক দিন তাঁহার দ্বারে এক ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিখারীর বসন ছিন্ন, নগ্ন চরণ ক্ষতবিক্ষত, কেশ শ্বেতবর্ণ, কাউণ্টপত্নী তাহাকে খাদ্য দিতে আসিলেন। তখন ভিখারী তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিল। পরিচারকগণ বাধা দিতে আসিলে ভিখারী তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আমাকে আবার আমার পত্নীকে বক্ষে ধরিতে দাও। আমি বহুদিন প্রহার ও অনাহার ভোগ করিয়াছি—ভালবাসা পাই নাই। আমি উইরিক।"

এই অবস্থায় রাজা যখন প্রজারক্ষায় অক্ষম হইলেন, তখন প্রজা-দিগকেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইল। তাহারা যুদ্ধের জন্য নায়ক নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে লাগিল। এইরূপে স্যাক্সনী, বেভেরিয়া,

লোরেন প্রভৃতি স্থানে নায়কের আবির্ভাব হইল। প্রজাপুঞ্জ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন হইল বলিয়া ক্রমে রাজার ক্ষমতা যত তাঁহাদের হস্তগত হইতে লাগিল, রাজা ততই দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। এইরূপে জার্ম্মাণীর রাজনীতিক অবস্থায় আবার পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল—প্রজাশক্তি আবার প্রবল হইয়া নায়কনির্ণয় করিতে লাগিল।

বহিঃশত্রুর আক্রমণভয় না থাকিলে, এই সময় জার্ম্মাণী আবার বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইত। কিন্তু ম্যাগেয়ার, শ্লাভ ও নর্থমেনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সকলের সম্মিলিত শক্তিপ্রয়োগ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। তাই জার্ম্মাণগণ একই রাজার অধীনে থাকিয়া আত্মরক্ষার উপায় করিতে লাগিল। সার্লামেনের বংশধরদিগের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে যখন নূতন সম্রাট-নির্ব্বাচনের প্রয়োজন অনুভূত হইল, তখন স্যাক্সনীর বৃদ্ধ ডিউক অটোর উপদেশমতে সকলে সম্মিলিত হইয়া, কেনরাডকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সে ৯১১ খৃষ্টাব্দের কথা। সেই সময় হইতে জার্ম্মাণীতে সিংহাসনে উত্তরাধিকারের শেষ—নির্ব্বাচনের আরম্ভ।

তখনও জার্ম্মাণীর রাজারা রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহারা জার্ম্মাণদিগের উন্নতিকল্পে অখণ্ড মনোযোগ দিতেন না। ইহাতে জার্ম্মাণীর উন্নতি প্রতিহত হইত।

কনরাডের সহিত স্যাক্সনীর ডিউক হেনরীর বিবাদ ছিল। কিন্তু কনরাড মৃত্যুকালে স্বীয় ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, হেনরীই রাজা হইবার যোগ্যতম পাত্র—যেন তাঁহার মৃত্যুর পর হেনরীকেই রাজা করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর নির্ব্বাচকগণ হেনরীকেই রাজা নির্ব্বাচিত করিলেন। হেনরী রাজা হইয়া প্রথমেই হাঙ্গেরিয়ানদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য চেষ্টিত হইলেন। আলিবর্দ্দী যেমন চৌথ দিয়া মারহাট্টা-

দিগের অত্যাচার হইতে বাঙ্গালা রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তেমনই বার্ষিক কর দিবার বন্দোবস্তে নয় বৎসরের জন্য শান্তি ক্রয় করিলেন। কিন্তু তিনি এই নয় বৎসরে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া ও সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বলসঞ্চয় করিলেন। দশম বর্ষে হাঙ্গেরিয়ান দূতগণ বার্ষিক লইতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে একটি ক্ষতজীর্ণ কুক্কুরের শব দিয়া অপমানিত করিলেন। হাঙ্গেরিয়ানগণ জার্ম্মাণদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তখন দুর্গগুলি সুরক্ষিত—সৈনিকে ও সমর-সরঞ্জামে পূর্ণ। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হাঙ্গেরিয়ানগণ পলায়ন করিল। হেন্‌রীই জার্ম্মাণীতে "নাইট" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁহারা এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিতেন, ধর্ম্মের বা রোমান সাম্রাজ্যের অনিষ্ট করিবেন না, মিথ্যা কথা বলিবেন না, দুর্ব্বল মহিলাকে পীড়িত করিবেন না, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবেন না।

ইহার বাইশ বৎসর পরে হাঙ্গেরিয়ানগণ পুনরায় জার্ম্মাণী আক্রমণ করে। তাহাদের সংখ্যাধিক্যহেতু তাহারা গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহাদের অশ্বের জলপানে জার্ম্মাণীর নদীগুলি শুকাইয়া যাইবে। তাহারা মনে করিয়াছিল, তাহারা অগসবার্গ আক্রমণ করিয়া অর্থলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু সেই স্থানের ধর্ম্মযাজক, আক্রমণাশঙ্কায় নগরপ্রাচীরের সংস্কার করিয়া নগর সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাচীরের পর পরিখাও ছিল। হাঙ্গেরিয়ানগণ সম্মুখে পরিখা ও পরে পুরপ্রাচীর দেখিয়া রুদ্ধগতি হইল। সহসা পুরপ্রাচীরের ছিদ্রপথে পরিখার উপর সেতু ফেলিয়া নগরবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং অতর্কিত আক্রমণে তাহাদিগকে পরাভূত ও তাহাদের রাজাকে নিহত করিয়া তাঁহার ঢাল লইয়া পুনরায় পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। এ দিকে সম্রাট অটো সেনাদলসহ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন।

পুরবাসীরা সে আক্রমণে যোগ দিল। হাঙ্গেরিয়ানগণ পরাভূত হইল—অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল, অনেকে নদীতে ডুবিয়া মরিল—যাহারা বনে পলাইল, তাহারা দেশের লোকের হাতে পড়িয়া নিহত হইল। ইহার পর হাঙ্গেরিয়ানগণ আর জার্ম্মাণী আক্রমণ করে নাই। অটো ইংলণ্ডের রাজা এডমণ্ডের কন্যা এডিথকে বিবাহ করেন। অটোর পুত্র গ্রীক-রাজকন্যা বিবাহ করিলে জার্ম্মাণ রাজগৃহে সজ্জাবাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারও প্রবেশ করে। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকালপরেই জার্ম্মাণীতে স্যাক্সন রাজবংশের বিলোপ হয়।

তাহার পর দুই জন রাজা শাসনকার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর নাবালক রাজার অধীন জার্ম্মাণী আবার অন্তর্বিপ্লবের বহ্নি-দাহে দগ্ধ হইতে থাকে। এমন কি, নাবালক রাজার অপহরণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল! রাজা হেন্‌রী পোপের সঙ্গে বিবাদ করিয়া নূতন পোপ-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এদিকে পোপ তাঁহাকে "একঘরে" করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তখন পোপের ক্ষমতা অসাধারণ। দেশের লোক বিশ্বাস করিত, পরলোকে পোপ যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন। সুতরাং সকলে হেন্‌রীকে ত্যাগ করিল। হেন্‌রী শেষে প্রজার চিত্তা-কর্ষণ করিয়া আবার পোপকে পীড়িত করিলেন। এইরূপে যুদ্ধে ও ষড়-যন্ত্রে জার্ম্মাণীর রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। সার্লামেন যে বিশাল সাম্রাজ্য সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তাহার সংরক্ষণের যোগ্যতার অভাবে সে রাজ্য হারাইতে লাগিলেন। দেশ কোথাও অরাজক এবং কোথাও সহস্ররাজক হইয়া উঠিল। একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না।

ইহার পর পোপদিগের কাযেই জার্ম্মাণ নৃপতিবৃন্দের শাসনসাফল্য ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। পাছে জার্ম্মাণীর অর্থাৎ রোমান-সাম্রাজ্যের রাজা

প্রবল হইয়া পোপের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করেন, এই ভয়ে পোপরা তাঁহাদিগকে গৃহবিবাদে দুর্ব্বল রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। এই সময় আবার ক্রুশেডে প্রায় দুই শত বৎসর রাজাদিগের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা জেরুসালেমে ও বেথলহেমে তীর্থযাত্রা করিতেন। রোমানদিগের অধিকারচ্যুত হইবার পর সিরিয়া আরবদিগের হস্তগত হয়। তাহারা খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিত না। কিন্তু তুর্কজাতীয় সেলজুকগণ সে প্রদেশ অধিকৃত করিয়া অত্যাচারে যাত্রী ও ধর্ম্মযাজকদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। তাই ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে পোপ খৃষ্টানদিগকে অত্যাচারনিবারণকল্পে যুদ্ধযাত্রায় প্রোৎসাহিত করিলেন। যুদ্ধযাত্রীরা রক্তবস্ত্রের ক্রুশচিহ্ন পরিধান করিত বলিয়া এই যুদ্ধ ক্রুশেড নামে পরিচিত। পরবৎসর গডফ্রী তিন লক্ষ লোক লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু পথে শ্রমে, যুদ্ধে,ব্যাধিতে বহু লোকের মৃত্যু হয় এবং ত্রিশ হাজার লোক জেরুসালেমে পৌছে; তাহারাই শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া ধর্ম্মস্থান অধিকৃত করে। কিন্তু এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ নহে। ইহার পর বহুবার বহু যুদ্ধ হয়। শেষে ১২৯১ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানগণ এসিয়ার শেষ রাজ্যখণ্ড হইতে বিতাড়িত হয়। দুই শত বৎসরে য়ুরোপের ৬০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। তবে এই যুদ্ধে নূতন দেশের ও নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয়ফলে য়ুরোপের উপকারও হইয়াছিল। বহু যোদ্ধার মৃত্যুতে য়ুরোপ শান্তি পাইয়াছিল। রেশম, শর্করা, মসলা, নানা বর্ণ এই সময়ে প্রাচীর ভাণ্ডার হইতে য়ুরোপে পরিচিত হয়—ব্যবসার সূত্রপাত হয়।

১১৩৮ খৃষ্টাব্দে কনরাড জার্ম্মাণীর রাজা নির্ব্বাচিত হয়েন। ওয়েল্‌সবার্গবাসীরা তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে। শেষে কনরাড বলেন, "তিনি নগরের মহিলাদিগকে

তাঁহাদের মূল্যবান্ সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে বাহির হইয়া যাইতে দিবেন।" তখন নগরদ্বার মুক্ত করিয়া নগরবাসিনীরা কেহ স্বামী, কেহ পুত্র, কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা বহন করিয়া চলিয়া গেলেন। কনরাড কনষ্টান্টিনোপলে যাইয়া বৈজান্তাইন সাম্রাজ্যের বৈজয়ন্তীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই সাম্রাজ্যের চিহ্নস্বরূপ দ্বিমস্তক ঈগল অঙ্কিত দেখিয়া সেই চিহ্নই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাহাই জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান সম্রাটদিগের দ্বিমস্তক ঈগল ব্যবহারের কারণ।

তখন জার্ম্মাণ-সম্রাটগণের ক্ষমতা পোপের ষড়যন্ত্রে ও শক্তিশালী ভূম্যধিকারীদিগের প্রতাপে ক্ষুণ্ণ ও সীমাবদ্ধ হইত। এ দিকে ইটালীর লোক জার্ম্মাণপ্রাধান্যে বিরক্ত হইয়া সে প্রাধান্য নষ্ট করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। ফ্রেডরিক যখন লম্বার্ডি, নেপল্স, সিসিলি ও জার্ম্মাণী কয় স্থানের রাজা হইলেন, তখন তাঁহার ক্ষমতায় শঙ্কিত পোপ তাঁহাকে ক্রুশেডে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু পথে সেনাদলে পীড়ার প্রাদুর্ভাবে ফ্রেডরিককে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। ইহাতে পোপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "একঘরে" করিলেন। শেষে ফ্রেডরিক পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলে পোপ যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি না ঘটে তাহারই চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফ্রেডরিক যুদ্ধে জয়ী হইয়া মিশরের সুলতানের সহিত সন্ধি করিয়া তীর্থস্থান অধিকৃত করেন। পোপ তাঁহার বিরুদ্ধে সেনাসংগ্রহ করেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধে জয় অসম্ভব বুঝিয়া তাঁহাকে, "একঘরে" করিবার আদেশ দিয়া ফ্রান্সে পলায়ন করেন। তখন ফ্রেডরিক তাঁহার সাত দেশের সাতটি মুকুট আনাইয়া একে একে সেগুলি পরিধান করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কে আমাকে একঘরে করিতে পারে?" কিন্তু তখনও লোকের কাছে পোপের প্রভাব অসাধারণ। তাই জার্ম্মাণীতে আবার অশান্তি দেখা দিল—বিদ্রোহ-বহ্নি

জ্বলিয়া উঠিল। সেই বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া বীর ফ্রেডরিক প্রাণত্যাগ করিলেন। আবার জার্ম্মাণীতে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, অশান্তি, উৎপাত, অত্যাচার, অনাচার চলিতে লাগিল—দেশে সর্ব্বত্র লোক শঙ্কিত অবস্থায় বাস করিতে লাগিল—ধনপ্রাণ নিরাপদ রহিল না।

জার্ম্মাণীতে ভগ্ন দুর্গের বাহুল্য পর্য্যটকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। অশান্তির—অরাজকতার সময় এই সব দুর্গ নির্ম্মিত হয়। যখন রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হইল, তখন সূর্য্যাস্তের পর আকাশে তারকার মত বহু শক্তিশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব গৃহ সুরক্ষিত করিয়া লইলেন। কেহ বা সেই সব দুর্গ হইতে বাহির হইয়া দেশলুণ্ঠনদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিতেন, কেহ বা কেবল অত্যাচার অতিক্রম করিবার জন্যই গৃহ সুরক্ষিত করিতেন। তাঁহারা অনেকে লোকের গতায়াতে সুসুবিধা করিয়া দিতেন—অতিথিসৎকারও করিতেন।

তখন আর কোন জার্ম্মাণ জার্ম্মাণীর রজমুকুট গ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না। অগত্যা ধর্ম্মযাজকগণ বিদেশী নৃপতি-নির্ব্বাচনে মনোযোগী হইলেন। তাহাতেও তাঁহাদের মধ্যে এক মত লক্ষিত হইল না—কেহ কেহ ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় হেন্‌রীর ভ্রাতা রিচার্ডকে নির্ব্বাচিত করিলেন, আবার কেহ কেহ স্পেনের আলফোন্সোর নির্ব্বাচন সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। রিচার্ড দুই একবার জার্ম্মাণীতে আসিয়াছিলেন; আলফোন্সো একবারও আইসেন নাই। দেশে রাজা নাই—যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে—যে শক্তিশালী সে যথেচ্ছাচারী,রাজায় রাজায় ও নগরে নগরে যুদ্ধের বিরাম নাই—শক্তিশালী যোদ্ধৃবৃন্দ স্ব স্ব দুর্গ হইতে সদলে বাহির হইয়া লুণ্ঠনে ও নরহত্যায় ব্যাপৃত—লোক সর্ব্বদা শঙ্কিত। এ সময় দুইটি কারণে জার্ম্মাণগণের ধ্বংস হয় নাই। প্রথম—জার্ম্মাণীতে নগরের

প্রাধান্য ; দ্বিতীয় সপ্তাহে চারি দিন যুদ্ধে বিরতি। জার্ম্মাণীতে নগর-সংস্থাপনের কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। নগরগুলি ক্রমে সমৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চিত করিয়াছিল। কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নগরে অত্যাচার করিলে নগরবাসীরা আত্মরক্ষার উপায় করিত এবং সদলে যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া শাস্তি দিত। এইরূপে নগরবাসী জার্ম্মাণগণ অপেক্ষাকৃত নিরাপদে ছিল। আর ধর্ম্মযাজকগণ আদেশ দিয়াছিলেন—সপ্তাহে চারি দিন, বুধবার সন্ধ্যা হইতে সোমবার প্রভাত পর্য্যন্ত, যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। যে কেহ এই নিষেধ ভঙ্গ করিলে "একঘরে" হইত।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর জার্ম্মাণগণ কেবল যে যুদ্ধপ্রিয় সৈনিক ছিল, এমন নহে ; পরন্তু তাহাদের মধ্যে কবিত্বশক্তির বিকাশও হইয়াছিল। প্রথমে প্রোভেন্সে কবিতার উপাসনা হইত—ক্রমে কবিতা-চর্চ্চা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জার্ম্মাণগণ দীর্ঘ কবিতা বা কাব্য-রচনা করিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনাতেও মন দিত। তাহাদের ক্ষুদ্র কবিতার অধিকাংশই প্রেমসম্বন্ধীয়। সে সব কবিতায় কবিত্বের অভাব ছিল না। তাহারা বিদেশের বিষয় লইয়া এবং প্রাচীন জার্ম্মাণ-কথা লইয়া কবিতারচনা করিত।

কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইল তাহাতে রাজা নহিলে আর চলে না ; রাজশক্তি বিশৃঙ্খলার নিবারণ ও শৃঙ্খলা-সংস্থাপন না করিলে দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তখন জার্ম্মাণীর নানা স্থানের ভূস্বামিগণ একত্রিত হইয়া নৃপতিনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে একমত হইয়া সুইটজারলাণ্ডের অন্তর্গত হ্যাপ্সবার্গের কাউণ্ট রাডল্‌ফকে জার্ম্মাণীর নৃপতি নির্ব্বাচিত করিলেন। রাডল্‌ফ সাহসী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। রাডল্‌ফ রাজা হইয়া বোহিমিয়ার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অষ্ট্রীয়া অধিকৃত করেন।

রাডল্‌ফের মৃত্যুর পর আবার দেশে অশান্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহার পুত্র আলবার্ট অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সুইস্‌ মেষপালদিগকে পরাভূত করিতে প্রচেষ্ট হইয়া শেষে স্বয়ং নিহত হয়েন। তখন আবার দেশে হিংসা ও প্রতিহিংসা আরব্ধ হইল—দেশে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন জার্ম্মাণীর দুঃখ-রজনীর অবসান হয় নাই—তামসযুগের শেষ হয় নাই। সুইস্‌দিগের সহিত যুদ্ধে প্রতিপন্ন হয়, গুরুভার বর্ম্মে আবৃত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করা অনেক সময় অসুবিধাজনক—কারণ, ভূপতিত হইলে যোদ্ধার আর উঠিবার ক্ষমতা থাকে না। সুইসগণ কিছুতেই স্বাধীনতা ত্যাগ করে নাই বটে, কিন্তু ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সুইজারলাণ্ড জার্ম্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন—স্বতন্ত্র হয় নাই।

১৩১৩ খৃষ্টাব্দে আবার বিরোধ আরব্ধ হইল। এক দল বেভেরিয়া'র লুইসকে ও এক দল অষ্ট্রীয়ার ফ্রেডরিককে রাজা নির্ব্বাচিত করিলেন। দুই জনে দীর্ঘ অষ্টবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ফ্রেডরিক পরাভূত ও বন্দী হইলেন। লুইস কারাগারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্থির হইল, ফ্রেডরিককে মুক্তি দেওয়া হইবে; তিনি যদি তাঁহার ভ্রাতা ও তাঁহার দলস্থদিগকে লুইসের প্রাধান্য-স্বীকারে সম্মত করাইতে না পারেন তবে, তিনি আবার আসিয়া বন্দী হইবেন। পোপের প্ররোচনায় ফ্রেডরিকের ভ্রাতা এ সর্ত্তে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি বন্দী হইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে লুইস মুগ্ধ হইলেন এবং উভয়ে একযোগে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যুর পর লাক্‌সেমবার্গের রাজা চার্লস জার্ম্মাণীর রাজা নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি "গোলডেন বুল" ব্যবস্থার প্রবর্ত্তক। এই ব্যবস্থায় স্থির হয়, সাত জন নির্ব্বাচক নৃপতি-

নির্ব্বাচন করিবেন—তিন জন ধর্ম্মযাজক ও ৪ জন ভূস্বামী। সে কালের জার্ম্মাণ ধাতুপাত্রাদিতে যে সপ্তমূর্ত্তিসজ্জিত বৃত্তমধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তি দেখা যায় তাহা এই ব্যবস্থার পরিচায়ক। এ ব্যবস্থা রূপক। সূর্য্য যেমন সপ্তগ্রহের কেন্দ্র, তেমনই জার্ম্মাণীর রাজা সপ্তশক্তির কেন্দ্র। চার্লস বুঝিয়াছিলেন, ইটালী লইয়াই জার্ম্মাণীর নৃপতিদিগের যত বিপদ। তাই তিনি ইটালীতে স্বীয় অধিকারবিস্তারচেষ্টা করেন নাই; পোপদিগের সহিত সদ্ভাব-সংরক্ষণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি উৎকোচ দিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া রাজপদ বংশগত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ত অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ভূস্বামীদিগের সহিত সদ্ভাব রাখেন নাই। তিনি সর্ব্বদা কুক্কুর সঙ্গে রাখিতেন এবং রাত্রিকালে শয়নকক্ষে কুক্কুরের দংশনেই তাঁহার পত্নীর প্রাণবিয়োগ হয়। শেষে তাঁহার স্বজনগণ তাঁহাকে অষ্ট্রীয়ার কারাগারে বন্দী করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নূতন রাজারও রাজদণ্ড-পরিচালনের যোগ্যতা ছিল না।

এ দিকে ধর্ম্মে অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। ক্ষমতালোলুপ হইয়া পোপগণ ধর্ম্মচিন্তা না করিয়া পার্থিব ক্ষমতালাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তিন জন ধর্ম্মযাজক প্রত্যেকে আপনাকে পোপ বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করেন। শেষে সভায় তিন জনকেই পোপ অস্বীকার করিয়া আর এক জনকে পোপ নির্ব্বাচিত করা হয়। এই সভায় অধ্যাপক হাস্ ধর্ম্মযাজকদিগের অনাচারের প্রতিবাদ করিলে তাঁহাকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করিবার আদেশ হয়। সেই অগ্নি সমগ্র দেশে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করে। দেশে আবার অত্যাচার অনাচার লুণ্ঠন হত্যা চলিতে থাকে; নৃশংস বর্ব্বরতা আবার দেশে প্রাধান্য

লাভ করে। বেভেরিয়া, ফ্রাঙ্কোনিয়া, স্যাক্সনী, বোহিমিয়া এই সময় বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

লাক্সেমবার্গের ভূস্বামীদিগের প্রাধান্যের অবসানে আবার অষ্ট্রীয়ান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সে প্রাধান্য ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ইঁহাদের মধ্যে তৃতীয় ফ্রেডারিক দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি রাজকার্য্য পরিচালিত করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন না, এমন কি রাজকার্য্যের সময় ঘুমাইয়া পড়িতেন! দেশে আবার দস্যুতার আবির্ভাব হয় এবং দস্যুদলপতিরা দেশবাসিগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকে। দেশে রাজা থাকিলেও দেশ যেন অরাজক হইয়া উঠে। তাঁহার মন্ত্রীর কার্য্যের মূলমন্ত্র ছিল---যাহা কল্য করিতে পার, তাহা আজ করিও না, আর যাহা আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে, তাহা স্বয়ং করিও না।

এই সময় সুইস্‌রা আবার স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করে। রাজা এক দল ভাড়াটিয়া ফরাসী সৈন্য দিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করেন। তাহাদের হস্তে ১৫ হাজার সুইস্ নিহত হইলে তাহারা বলক্ষয়হেতু ক্ষুন্নমনে যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। এ দিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তুর্করা জার্ম্মাণ রাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহারা হাঙ্গেরী বিধ্বস্ত করিয়া অষ্ট্রীয়াতেও নানারূপ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতেছিল। রাজা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া প্রজাপুঞ্জকে নিঃশঙ্ক করিবার চেষ্টাও করিতেছিলেন না! শেষে এক জন ইটালীয়ান ধর্ম্মযাজক তিন হাজার কৃষক সংগ্রহ করিয়া তুর্কদিগকে পরাজিত করেন।

এই অবসরে হাঙ্গেরিয়ানগণ ও বেভেরিয়ানগণ স্ব স্ব স্বতন্ত্র নৃপতি নির্ব্বাচিত করিয়া লয়। এই দুইটি রাজ্য হারাইয়াও রাজার চৈতন্যো-

দয় হইল না। তিনি হাত দিয়া দ্বার খুলিবার পরিশ্রম করিতেন না—দ্বারে পদাঘাত করিতেন। পদাঘাতের ফলে একবার তাঁহার পদ আহত হয় ও তাহা কাটিয়া ফেলিতে হয়। তাঁহার আলস্যে তাঁহার পত্নী সময় সময় পুত্র ম্যাক্‌সিমিলিয়ানকে বলিতেন, "তুমি যদি তোমার পিতার মত হও, তবে আমি তোমার মত রাজার মাতা হইতে লজ্জা বোধ করিব।" পুত্র কিন্তু উদ্যমশীল, সাহসী, উদারহৃদয়, বুদ্ধিমান ও বীর ছিলেন। তিনি বার্গাণ্ডীর রাজকন্যা মেরীকে বিবাহ করেন। স্বামী যেমন সুপুরুষ ছিলেন, স্ত্রীও তেমনই সুন্দরী ছিলেন—যোগ্যে যোগ্যেই মিলন হইয়াছিল। বিশেষ মেরী বার্গাণ্ডীর ও নেদারল্যাণ্ডসের উত্তরাধিকারী। তরুণবয়স্ক ম্যাক্‌স তেজস্বী অশ্বারোহণে, সোণার মিনা করা রূপার বর্ম্ম পরিয়া, দীর্ঘবেশে কুসুম ও মুক্তা সজ্জিত করিয়া ঘেণ্টে মেরীর জন্য গমন করেন। মেরী শ্বেতবর্ণ অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। পাঁচ বৎসর পরে শিকারের সময় অশ্ব হইতে পড়িয়া মেরীর জীবনান্ত হয়। তাঁহারই একমাত্র পুত্র ফিলিপ উত্তরকালে স্পেনের প্রথম ফিলিপ বলিয়া পরিচিত হয়েন।

মেরীর মৃত্যুতে নেদারল্যাণ্ডসে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হয়।

মেরীর মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে ম্যাক্‌সিমিলিয়ান আবার বিবাহ করেন। কিন্তু সে বিবাহে তিনি সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

ম্যাক্‌সিমিলিয়ানের আদেশানুসারে কোন প্রসিদ্ধ শিল্পী তাঁহার রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনার ১৩৫ খানি চিত্র প্রস্তুত করেন। সেই সকল চিত্র হইতে সে সময়ের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তেজস্বী অশ্ব, বীর যোদ্ধা, সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী, বহুমূল্য সজ্জা—সেই সকল চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

ম্যক্‌সিমিলিয়ানকে মধ্যযুগের ও বর্ত্তমানযুগের সংযোগসেতু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নানা উপায়ে সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজ্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষমতা থাকিলে তিনি রাজ্যের বহুবিধ উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু পিতার দৌর্ব্বল্য, প্রজাদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধি, পোপদিগের শত্রুতা তখন জার্ম্মাণ নৃপতির ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—তিনি শূন্যগর্ভ সম্মানের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার শত্রুরাও তাঁহার গুণমুগ্ধ হইতেন। ভূস্বামিগণের মধ্যে বিবাদে দেশের লোকের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইত বলিয়া তিনি ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে নিয়ম করেন, কেহ প্রকৃত বা কল্পিত অত্যাচারের প্রতীকারজন্য স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেন না—সকলকেই বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে হইবে। বিচারের সুবিধার জন্য রাজ্য দশ ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহাতে শাসনের সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি সাম্রাজ্যে ডাকের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। এক জন ইটালীয়ান কাউণ্ট ডাকের ব্যবস্থা করেন। সে কাযের ভার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারই পরিবারে ছিল। ডাকের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য হয় নাই। তখন দেশ নানা ভূস্বামীদিগের মধ্যে বিভক্ত—তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া সব ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। রাজপথগুলি সুসংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল, ডাকের ঘোড়া রাখিতে হইয়াছিল, ডাকহরকরাদিগকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। তখন রাজ্য দুই সহস্র স্বাধীনভাগে বিভক্ত।

তখন জার্ম্মাণীর শত্রুদিগের মধ্যে তুর্ক, ফরাসী ও পোপ—এই তিনই প্রধান। রাজাকে ভূস্বামীদিগের সাহায্য লইয়া শত্রুদিগকে শাসিত করিতে হইত। কিন্তু সে কাযে ভূস্বামীদিগের উৎসাহ ছিল না। তাঁহারা মনে করিতেন, কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে পশ্চিম জার্ম্মাণী বহুদূর

—তুর্করা এত দূর আসিবে না—বিশেষ মধ্যে হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রীয়া অবস্থিত। ফরাসী রাজা বার্গাণ্ডীর জন্য জার্ম্মাণ রাজার প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়াছিলেন। কাযেই পূর্ব্বে ও পশ্চিমে শত্রু লইয়া ম্যাক্সিমিলিয়ানকে রাজত্ব করিতে হইয়াছিল। পোপরা এক দিকে জার্ম্মাণীর অর্থশোষণ করিতেন,আর এক দিকে বিরোধ বাধাইয়া জার্ম্মাণীর ক্ষমতা ক্ষুন্ন করিয়া আপনারা নিরাপদ্ হইলেন।

তখন স্পেন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং নবাবিষ্কৃত আমেরিকা স্পেনের সম্পত্তি। রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার কন্যা জোয়ানাই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী। ম্যাক্সিমিলিয়ান এই রাজকন্যার সহিত স্বীয় পুত্র ফিলিপকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিলেন। এ দিকে তিনি হাঙ্গেরী ও বোহিমিয়া সম্মিলিত করিলেন। সুতরাং তিনি পৃথিবীব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন ; মনে করিলেন, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য একদিন জার্ম্মাণী, নেদারল্যাণ্ডস, বার্গাণ্ডী, ইটালী, স্পেন, আমেরিকা লইয়া গঠিত হইবে। এই সাম্রাজ্যের স্বপ্ন অবশ্যই তাঁহার পক্ষে সুখের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের বিশালত্বেই যে তাহার দৌর্ব্বল্যের বীজ নিহিত ছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যাহার মূলধন অল্প, সে ছোট কায সুসম্পন্ন করিতে পারে ; কিন্তু তাহার পক্ষে বড় কায করিতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। জার্ম্মাণীর উন্নতির দিকে মন দিয়া স্বরাজ্য সমৃদ্ধ না করিয়া জার্ম্মাণীর রাজা বিশাল সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ফলে জার্ম্মাণীর দিকে আর তাঁহার অখণ্ড মনোযোগদানের সুযোগ ঘটিল না। সুতরাং ম্যাক্সিমিলিয়ানের সুখস্বপ্ন জার্ম্মাণীর পক্ষে কল্যাণকর হইল না।

এই স্থলে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে হয়। পূর্ব্বে পুস্তক হস্ত-

লিখিত হইত—অর্থাৎ পুথিরই প্রচলন ছিল। সুতরাং তখন পুস্তকের মূল্য কত অধিক ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তখনও কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভে একজন জার্ম্মাণ কাগজ প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করেন। কাগজে কাগজ প্রস্তুতকারকের বিশেষ চিহ্ন "জলের নক্সায়" লিখিত থাকিত। এক প্রকার কাগজে বিদূষকের টুপী অঙ্কিত থাকিত বলিয়া তাহা "ফুল্‌স্‌ক্যাপ" নামে পরিচিত হয়। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে প্রথম কাগজের কারখানা সংস্থাপিত হয়। তাহার পর ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্ গুটেনবার্গ ছাপাইবার কৌশল আবিষ্কৃত করেন। তৎপূর্ব্বে ছবির ব্লক ও ক্ষোদিত অক্ষরের ছত্র কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইচ্ছামত অক্ষর সাজাইয়া পুস্তকাদি ছাপিবার আবিষ্কার গুটেনবার্গের দ্বারা হয়। দরিদ্র গুটেনবার্গ এই কার্য্যের জন্য যাহাদের শরণাপন্ন হয়েন, জন্ ফষ্ট তাহাদিগের অন্যতর। ফষ্ট ব্যাপারটা শিখিয়া লইয়া গুটেনবার্গের সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করে। ছাপিবার কালী আবিষ্কৃত করিয়া তাহারা ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত করে। মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া লোক মনে করে, ফষ্ট সয়তানের সাহায্যে এই অঘটন ঘটাইতেছে!

এই সময়েই ধর্ম্মজগতে বিপ্লব আরব্ধ হয়। সেই বিপ্লবের ফলে রোমান ক্যাথলিক-মতের প্রভুত্বনাশ এবং প্রোটেষ্টাণ্ট-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তি ভোগের পর জার্ম্মাণরা বুঝিতে পারে যে, পোপরাই জার্ম্মাণীর জাতীয় একতাবন্ধনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় —জার্ম্মাণীর শত্রু। সারল্যামেন সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় ধর্ম্মযাজকদিগকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা জার্ম্মাণীতে বিরোধ-বাহুল্যের সৃষ্টি করিয়া রাজার বলক্ষয় করিবার চেষ্টাই করিতেন। ধর্ম্মযাজকরাও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। জার্ম্মাণরাজা একতা হারাইয়া

খণ্ড খণ্ড—বিচ্ছিন্ন হইয়া বিপন্ন হইয়াছিল। সম্রাটের ক্ষমতার পরিমাণ অতি সামান্য হইয়া আসিয়াছিল। দেশে শৃঙ্খলার অভাবে লোকের অসুবিধার অন্ত ছিল না—অত্যাচার ও অনাচারই প্রবল ছিল। সহসা জার্ম্মাণরা আপনাদের দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিল এবং দুর্দ্দশার নিদাননির্ণয় করিয়া তাহার কারণ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা সংকল্প করিল, যেরূপেই হউক, পোপ ও পোপের আজ্ঞাবহ ধর্ম্মযাজকদিগের প্রাধান্য আর তাহারা স্বীকার বা সহ্য করিবে না। এই সময় পোপের অনাচারে জার্ম্মাণদিগের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার অনুকূল অবস্থাও উপস্থিত হইল।

পোপ তখন রোমে সেণ্টপিটার্স গির্জ্জা নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন সে গির্জ্জা সৌন্দর্য্যে ও সজ্জায় আর সব গির্জ্জাকে পরাভূত করিবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সে জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই পোপ "ক্ষমা" বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মমতে পাপী—ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হয় এবং পাপের প্রতিফল ভোগ করে—সে প্রতিফল যন্ত্রণাদায়ক, ইহকালে ও পরকালে সেই যন্ত্রণাভোগ হয়। পোপরা বলিতেন যে, তাঁহারা যন্ত্রণাভোগ নিবারণ করিতে পারেন। তাঁহারা ক্ষমা করিলে পাপীর ইহকালে পরকালে যন্ত্রণাভোগ নিবারিত হয়। তাই তাঁহার "ক্ষমা" দান বা বিক্রয় করিতেন। সন্ন্যাসী মার্টিন লুথার এই অসম্ভব কাযের কুফল প্রতিপন্ন করিয়া পুস্তিকা রচনা করিয়া ইহার প্রতিবাদ করেন। লুথার আর একটি মত প্রচারিত করেন—মানুষ যদি বুঝিতে পারে, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, তবেই তাহার উদ্ধার হইল। ইহাতে পোপের প্রভুত্বনাশ হইল; তাঁহার "ক্ষমা" দান বিক্রয়ের ক্ষমতা গেল। কিন্তু লোক এই মত সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিল। লুথারের মত বোমার মত প্রাচীন ধর্ম্মমতের অত্যাচার নষ্ট

করিতে লাগিল। ধর্ম্মযাজকদিগের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসপ্রিয়তা দেশের লোকের নিকট তাঁহাদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল—লোক বুঝিয়াছিল, তাঁহারা ধর্ম্মের নামে পার্থিব ভোগবিলাসে ব্যাপৃত। এখন তাহারা মনে করিল, জার্ম্মাণীতে ভূস্বামীর অভাব নাই—ধর্ম্মের নামে আর তাহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া কায নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্ম্মাণীর নগরগুলিরও সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হইয়াছিল। লোক পূর্ব্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত ও তৃণাচ্ছাদিত গৃহে বাস করিত। ক্রমে গৃহনির্ম্মাণে প্রস্তরের ব্যবহার আরব্ধ হয় এবং প্রস্তরস্থাপত্য বিশেষ উন্নতিলাভ করে। প্রথমে গির্জ্জা ও সরকারী গৃহগুলিই প্রস্তরনির্ম্মিত হয়—ক্রমে ধনীরা গৃহনির্ম্মাণে প্রস্তর ব্যবহার করিতে থাকেন। অগ্নিদাহভয়ে ক্রমে সাধারণ জনগণও সেই পথ অবলম্বন করে। পথ কর্দ্দমপূর্ণ ছিল বলিয়া ১১৮২ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের রাস্তা পাকা করা হয়—জার্ম্মাণীর সহরের পথ পাকা হইতে আরও দুই শতাব্দী বিলম্ব হইয়াছিল। বাতায়নে কাচের ব্যবহার এই সময় আরব্ধ হয়। ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে অগ্নিনির্ব্বাপন জন্য "ফায়ার ব্রিগেড" প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তখনও লোক সভ্য হয় নাই। নগরের পথে কলহ হইত; সম্মিলন প্রায়ই বিবাদে—প্রহারে শেষ হইত। সহরের লোক ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত থাকিত বলিয়া সহরে কবিতার চর্চ্চা বড় হইত না। তবে অনেক সহরের ইতিহাস কবিতায় লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু বহুলোকবাস নগরে লোক অবসরবিনোদনের জন্য সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়া থাকে—জার্ম্মাণরাও করিত।

জলপথে গতায়াতের অসুবিধাহেতু পণ্য সাধারণতঃ স্থলপথেই লইয়া যাইতে হইত।

জার্ম্মাণীকে মোটামুটী দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—উচ্চ

ও নিম্ন। প্রথমে দুই ভাগে ভাষারও পার্থক্য ছিল এবং যে গ্রন্থকার যে ভাগের লোক তিনি সেই ভাগের ভাষায় পুস্তকরচনা করিতেন। কিন্তু ক্রমে উচ্চ ভাগের ভাষা বা "হাই জার্ম্মাণ"ই সমগ্র দেশের ভাষা হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, লুথার স্বয়ং উচ্চ ভাগের অধিবাসী ছিলেন এবং হাই জার্ম্মাণেই ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল অনূদিত করেন। ধর্ম্ম-পুস্তক দেশে সর্ব্বত্র আদৃত ও অধীত হইত বলিয়া ক্রমে হাই জার্ম্মাণই দেশের জনসাধারণের ভাষা হইয়া দাঁড়ায়।

১৫১৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম চার্লস জার্ম্মাণীর রাজা হয়েন। সার্‌লামেনের পর তাঁহার মত বিশাল রাজ্যাধিকার আর কোন জার্ম্মাণ নৃপতির ভাগ্যে হয় নাই। স্পেন, নেপল্‌স, সিসিলী, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, বোহিমিয়া, নেদারল্যাণ্ডস—সবই তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল যুদ্ধেই কাটিয়াছিল—ফ্রান্সের রাজার সহিত যুদ্ধে,পোপের সহিত যুদ্ধে, জার্ম্মাণীর প্রোটেষ্টাণ্ট ভূস্বামীদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিব্রত থাকিতে হইত। তিনি বিলাস বা বাহুল্য ভালবাসিতেন না, লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ছিলেন এবং সেনাপতিদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে উৎসাহিত করিতে জানিতেন। তবে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ছিল না—তিনি যত পাইতেন ততই চাহিতেন; কাযেই তাঁহাকে কেবলই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার বিরক্তি ছিল না—তিনি কেবলই যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন।

ম্যাক্‌সিমিলিয়ানের মৃত্যুর পর চার্লস্ ও ফার্ডিনাণ্ড দুই ভাই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু চার্লস স্পেন লইয়া ব্যস্ত থাকায় ভ্রাতাকে অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি প্রদান করেন। এইরূপে অষ্ট্রীয়ার রাজপরিবার দুই ভাগে বিভক্ত হইল—স্পেনিস্ ও জার্ম্মাণ; চার্লস্ স্পেনিস্ ও ফার্ডিনাণ্ড জার্ম্মাণ ভাগের কর্ত্তা হইলেন।

এ দিকে লুথারের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত পোপ দশম লিও তাঁহাকে বিধর্ম্মী ঘোষণা করিয়া "একঘরে" করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিকে লুথারের মতপ্রচার বন্ধ করিতে ও লুথারকে দণ্ডিত করিতে আদেশ দিলেন। পোপের ইস্তাহারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবার জন্য লুথার যে স্থানে কুষ্ঠাশ্রমের পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রাদি দগ্ধ করা হইত, তথায় সেই ইস্তাহার দগ্ধ করিলেন। এই গোল-যোগের একটা মীমাংসার জন্য চার্লস ১৫২১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে একটি সভা আহ্বান করিলেন। সভায় পোপ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপিত হইল। লুথার সভায় গমন করিলেন। গমনপথে লোক তাঁহাকে যেরূপে সম্মানিত করিতে লাগিল তাহাতে মনে হইল, যেন তিনি শোভাযাত্রা করিতে ছেন। সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি স্বীয় মত পরিবর্ত্তিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন। চার্লস বুঝিলেন, বহু ভূস্বামী—বিশেষ স্যাক্‌সনীর লোকরা লুথারের পক্ষাবলম্বী। সুতরাং তাঁহারা সভাস্থল ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তিনি লুথারকে সাম্রাজ্যমধ্যে "একঘরে" করিবার আদেশ প্রচারিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি লুথারকে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া সেনাদলে বেষ্টিত করিয়া বিদায় দিলেন; যেন কেহ তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে। লুথার রক্ষীদিগকে বিদায় দিলেই তঁাহার বন্ধু স্যাক্‌সনীর ইলেকটর তাঁহার রক্ষার জন্য অশ্বারোহী রক্ষী পাঠাইয়া তাঁহাকে স্বীয় দুর্গে লইয়া যাইলেন। লুথার নয় মাস তথায় লুক্কায়িত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমা প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করায়, তিনি আসিয়া তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন।

তখন আবার ধর্ম্মের নামে অত্যাচার আরব্ধ হইল। ভূস্বামীরা সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া মঠের সম্পত্তি দখল করিতে লাগিলেন, গীর্জ্জার সোণারূপার তৈজসপত্র আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মে যেমন, সমাজেও তেমনই বিদ্রোহ ঘোষিত হইল। কৃষকগণ ধনিগণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহারা জার্ম্মাণীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জার্ম্মাণীতে ভদ্রলোকরা কর দিতেন না—কৃষকগণই করভার বহন করিত। এখনও কোন কোন কৃষকের কুটীরে সেকালের কৃষকের অবস্থাজ্ঞাপক এক প্রকার চিত্র দেখা যায়।—এক জন কৃষক হলচালনা করিতেছে: তাহার পৃষ্ঠে ত্রিভুজাকৃতি সোপানশ্রেণী অবস্থিত। সর্ব্বোচ্চ সোপানে সম্রাট উপবিষ্ট; তাঁহার উক্তি,—"ইহারা সকলে আমার ভার বহন করে।" তন্নিম্নে সৈনিক; তাহার উক্তি—"আমি যুদ্ধ করিবার জন্য অর্থ পাই।" অন্যত্র ব্যবহারাজীব; তাঁহার উক্তি, "আমি সকলেরই লুণ্ঠিত ধন লুণ্ঠন করি।" তাহার পর ধর্ম্মযাজক ও অভিজাতবংশীয় লোক; শেষোক্তের কথা - "আমি কর দিই না।" সর্ব্বনিম্নে কৃষক সকলের ভারবহন করিয়া কায করিতেছে; তাহার উক্তি—"আমি এই সকলের ভার বহন করি।" এই অবস্থার প্রতীকারজন্য কৃষককুল উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল—কেবল সুযোগ পায় নাই। এবার সংস্কারচেষ্টায় যেন সঞ্চিত ইন্ধনে অগ্নিযোগ হইল; তাহারা যে যে অস্ত্র পাইল, লইয়া বাহির হইত—ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও ফিউডাল সামাজিক প্রণালী বিধ্বস্ত করিবে। কৃষকগণ রাজস্বের পরিবর্ত্তে শস্যাদি দিত—প্রভুর কাযও করিয়া দিত। তাহাদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। প্রথমে অতি সামান্য ঘটনায় বিদ্রোহ আরব্ধ হইল। লুপফেনের কাউণ্টপত্নী এক

রবিবারে প্রজাদিগকে তাঁহার আহারের জন্য ফল ও পিন রাখিবার আধার করিবার জন্য শামুকের খোলা সংগ্রহ করিতে বলিলে প্রজারা অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহঘোষণা করিল। পবনসহায় অনলের মত বিদ্রোহ ব্যাপ্তি লাভ করিতে লাগিল। কেবল বেভেরিয়ার কৃষকগণ এ বিদ্রোহে যোগ দিল না। কৃষক-বিদ্রোহে বিভগ্ন বহু সৌধের ভগ্নাবশেষ আজও নানা স্থানে দেখা যায়। সমাজের নিম্নস্তর হইতে সমাজের শক্তি উদ্ভূত হয়। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষায় ও সভ্যতায় সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তর অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। তাঁহাদিগের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে সে শক্তি অনাচারে ও অত্যাচারে পরিণতি লাভ করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। যখন কৃষকগণ ওয়েনস্‌বার্গের কাউণ্টের সেনাদিগকে পরাভূত করিয়া নগর অধিকৃত করিল, তখন তাহারা নগরে দারুণ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহারা কাউণ্টকে নিহত করিবার উদ্যোগ করিলে কাউণ্টপত্নী স্বীয় শিশুকে বক্ষে লইয়া বিদ্রোহিনায়কের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন ও স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কাউণ্টপত্নী সম্রাট ম্যাক্‌সিমিলিয়ানের কন্যা। বিদ্রোহিনায়ক জ্যাক অনুচরদিগকে বলিল, "দেখ, আমি সম্রাটের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করি।" সে কাউণ্টপত্নীকে ভূপাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষে জানু সংস্থাপিত করিল। এক জন তাহার তরবারি ফেলিয়া শিশুকে আহত করিল; সন্তানের রক্তে মাতার মুখ রঞ্জিত হইল। তখন জ্যাকের আদেশে কয় জন লোক কাউণ্টপত্নীকে ধরিয়া রাখিল,বাদ্যকরগণ নৃত্যের বাজনা বাজাইতে লাগিল; কাউণ্ট নিহত হইলেন। কাউণ্টের দেহ ভূপতিত হইতে না হইতে বিদ্রোহীদিগের সহগামী পিশাচপ্রবৃত্তি বৃদ্ধা নারী সেই দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা তাঁহার

আহত পুত্রসহ কাউণ্টপত্নীকে গোময়পূর্ণ শকটে স্থাপিত করিল। এই ব্যাপারে বর্ব্বরগণ আনন্দে অট্টহাস্য করিতে লাগিল! ক্রমে তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা এমন হইয়া উঠিল যে, লুথারও ভূস্বামীদিগকে বলিলেন, "ক্ষিপ্ত কুক্কুর যেমন করিয়া নষ্ট করিতে হয়, ইহাদিগকে তেমনই করিয়া নষ্ট কর।" শেষে ভূস্বামিগণের সম্মিলিত চেষ্টায় কৃষক-বিদ্রোহ বিনষ্ট হইল। ভূস্বামিগণ অত্যাচারে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। কোন কোন স্থানে কৃষকদিগের অত্যাচারের জন্যই লোক লুথারের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল এবং ক্যাথলিকমতেরই আদর করিল।

জার্ম্মাণী হইতে সংস্কারচেষ্টা চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। জুরিচে জুইঙ্গলী ও জেনিভায় কলভিন ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তর্কবিতর্কে ধর্ম্মের আচারে ও অনুষ্ঠানে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। তখন তুর্করা হাঙ্গেরী লুণ্ঠন ও অষ্ট্রীয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। তাহাদিগের আক্রমণ পরাভূত করিবার জন্য ও ধর্ম্মসম্বন্ধে মীমাংসাকল্পে চার্লস ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে এক সভা সংস্থাপিত করিলেন। অধিকাংশ সভ্যের মতে স্থির হইল, ধর্ম্মে আর পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক,প্রোটেষ্টাণ্ট ভূস্বামীরা ক্যাথলিক প্রজাদিগের ধর্ম্মানুষ্টানে বাধা দিবেন না, ধর্ম্মের নামে কেহ বিবাদ করিতে পারিবেন না। লুথারের শিষ্যগণ দ্বিতীয় সর্ত্তের প্রতিবাদ করায় তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট অর্থাৎ প্রতিবাদকারী নামে অভিহিত হয়েন।

চার্লস এই বিবাদের মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পরবৎসর তিনি আবার একটি সভায় গোল মিটাইতে প্রয়াস পায়েন। শেষে তিনি এই ইস্তাহার জারি করেন যে,ছয় মাস পরে পুনরায় সভায় সব ব্যাপার নির্দ্দিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত কায যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিবে এবং ধর্ম্মযাজকদিগের যে সব ভূমি ও গৃহাদি কাড়িয়া লওয়া হই-

য়াছে, সে সব তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে ; আর প্রোটেষ্টাণ্ট-গণ ছয় মাসের মধ্যে অধীনতা স্বীকার না করিলে তিনি তাহাদিগকে "একঘরে" করিবেন। এই ইস্তাহার জারি হইলে প্রোটেষ্টাণ্ট ভূস্বামীরা সম্মিলিত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে পরস্পরকে আবশ্যক সাহায্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা গোপনে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিসের সহিত সন্ধিসর্ত্তে বদ্ধ হইলেন এবং ইংলণ্ডের, সুইডেনের ও ডেনমার্কের রাজাদিগের নিকট হইতেও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া সোৎসাহে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের ব্যবহারে উত্তেজিত সম্রাট তাহাদিগের নায়কদিগকে "একঘরে" করিলেন। তখন ঈর্ষ্যায় প্রোটেষ্টাণ্ট রাজাদিগের শক্তিও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু এ দিকে ইটালীতে সম্রাটের প্রভুত্বভয়ভীত পোপ চার্ল্‌সের পক্ষ ত্যাগ করিলেন। ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে অর্থ সাহায্য দিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন চার্ল্‌স প্রোটেষ্টাণ্ট-দিগকে পরাভূত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি নদী পার হইয়া অতর্কিত আক্রমণে প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে পরাভূত করিলেন। স্যাক্‌সনীর ইলেকটর বিদ্রোহীদিগের নায়ক ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া, তাঁহার জ্ঞাতি ডিউক মরিসকে দেওয়া হইল। মরিস প্রোটে-ষ্টাণ্ট হইলেও এ বিদ্রোহে যোগ দেন নাই। এখন কার্য্যসিদ্ধির পর সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের অবসানে চার্ল্‌স সৈন্য কমাইয়া দিলেন। মরিস সেনাসংগ্রহ করিতে লাগিলেন, ফ্রান্সের রাজার সহিত বন্দোবস্ত করিলেন—তিনি লোরেন আক্রমণ করিবেন, এবং স্বীয় শ্বশুরের প্রতি দুর্ব্যবহারের ছলে যুদ্ধঘোষণা করিবেন। এই ব্যাপারে চার্ল্‌স বিপন্ন হইলেন। তখন তুর্কেরা হাঙ্গেরী আক্রমণ করি-য়াছে, ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেন্‌রী লোরেনে অগ্রসর হইয়াছেন,

মরিস দেশজয়ে ব্যাপৃত। তিনি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়া শেষে বাধ্য হইয়া প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। তাহার পর মরিস তুর্কদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; চার্লস লোরেনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তখন চার্লসকে ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ক্যাথলিক পক্ষাবলম্বী হইলেও ক্যাথলিকদিগের গুরু পোপ তাঁহার বিরোধী হইলেন। শেষে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হতাশ-হৃদয়ে চার্লস পুত্র ফিলিপকে নেদারল্যাণ্ডস, নেপল্‌স, স্পেন ও আমেরিকা এবং ভ্রাতা ফার্ডিনাণ্ডকে বোহিমিয়া,হাঙ্গেরী ও জার্ম্মাণ-অষ্ট্রীয়ান রাজ্য দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যুকালীন ক্রিয়া করিতে হইবে, এই খেয়ালে তিনি স্বয়ং বস্ত্র জড়াইয়া শবাধারে শয়ন করিলেন—মন্ত্রপাঠ হইল। বস্ত্রখানি সিক্ত ছিল। তাহাতে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

চার্লস প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সহিত সন্ধি করিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট, ক্যাথলিক দুই দলেরই স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে দুই দলে বিবাদবিরতি ঘটে নাই। আবার এক এক দলে দলাদলিও হইতেছিল। এই সব বিবাদে নরহত্যাও হইত। বাস্তবিক জগতে মানুষ ধর্ম্মের নামে যত অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তত আর কিছুতেই করে নাই। ধর্ম্ম লইয়া আবার জার্ম্মাণীতে যে যুদ্ধ আরব্ধ হয়, তাহা দীর্ঘকালব্যাপী হইয়াছিল। কিন্তু এই সব যুদ্ধের ফলে মানুষের অন্য ধর্ম্মের প্রতি দুর্ব্ব্যহারচেষ্টার প্রাবল্য প্রশমিত হইতেছিল।

ফার্ডিনাণ্ডের পৌত্র রাডল্‌ফের রাজত্বে আবার বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। তিনি ঘোড়া ভালবাসিতেন ও রাসায়নিক পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি স্পেনে শিক্ষিত বলিয়া প্রোটেষ্টাণ্টরা অত্যাচারের আশঙ্কায় সঙ্ঘ সংস্থাপিত করিল। সে সঙ্ঘের নাম—প্রোটেষ্টাণ্ট

ইউনিয়ন। তখন ক্যাথলিক ভূস্বামীরাও সঙ্ঘে সমবেত হইলেন। সে সঙ্ঘের নাম—ক্যাথলিক লীগ। দুই দলই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাডল্‌ফের মৃত্যুর পর প্রোটেষ্টাণ্টরা দুইটি নূতন গীর্জ্জা-নির্ম্মাণের সময় বাধা পাইয়া সম্রাটকে সে কথা জানাইল এবং শেষে বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিল। সম্রাটের পক্ষে গত্যন্তরবিহীন হইয়া সেনাসংগ্রহ করিতে হইল; কিন্তু সম্রাটের সেনাদল পরাভূত হইল। বিজয়গর্ব্বফুল্ল প্রোটেষ্টাণ্ট সেনাদল লইয়া কাউণ্ট আর্ল ভিয়ানা আক্রমণ করিলেন। সম্রাট তখন ভিয়ানায়। যখন ভিয়ানাবাসী-দিগের দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না এবং তাহারা পরাভব স্বীকার করিয়া নগরদ্বার মুক্ত করিবার জন্য সম্রাটকে বলিতে লাগিল। সেই সময় অল্পসংখ্যক সেনা সম্রাটের সাহায্যার্থ উপনীত হইলে সমরের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। কাউণ্ট আর্ল সমাগত সেনাবলের পরিমাণ বুঝিতে না পারিয়া বোহিমিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বোহি-মিয়ানরা সম্রাটকে রাজা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া ইংলণ্ডের রাজা জেম্‌সের জামাতা ফ্রেডরিককে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। আবার হাঙ্গেরীতেও গ্যাবর রাজা হইয়া বসিলেন। এ দিকে ক্যাথলিক লীগ ফ্রেডরিককে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলে তিনি পলায়ন করিলেন। তখন বোহিমিয়ানদিগকে আবার ক্যাথলিক করিবার জন্য তাহাদিগের উপর অত্যাচার চলিতে লাগিল। অনেকে ধর্ম্মত্যাগ না করিয়া দেশত্যাগ করিল। বোহিমিয়ার পরাভবে ও প্রোটেষ্টাণ্ট ইউনিয়নের ধ্বংসেই যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পতিত হইল না—পরন্তু নূতন অঙ্কে নূতন অভিনয় আরব্ধ হইল। একাধিক প্রোটেষ্টাণ্ট ভূস্বামী সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; কাউণ্ট ম্যান্‌সফেল্ড তাঁহাদের সেনাপতি হইলেন। তিনি ১৬২২ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সেনাপতি

টিলীকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। টিলী সম্মিলিত সেনার সহিত যুদ্ধে জয়ের আশা নাই বুঝিয়া অবসরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবসর পাইয়াই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও জয়লাভ করিলেন। এত দিন ক্যাথলিক লীগ সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, এবার সম্রাট-স্বয়ং সেনা প্রেরণ করিবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ ছিল না। তখন বোহিমিয়ার আলবার্ট তাঁহার জন্য সেনাসংগ্রহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সেনা সংগ্রহ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পঞ্চাশ হাজারের অধিক সৈনিক সংগ্রহ করিলেন। এ দিকে ডেনমার্কের রাজা ক্রিশ্চান, সুইডেনের রাজা গাস্‌টেভাস অ্যাডলফাস ও ইংলণ্ডের রাজা জেমস্ এই তিন জনের আনুকূল্যে একটি নূতন প্রোটেষ্টাণ্ট সঙ্ঘ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু ডেনমার্কের রাজা টিলী কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। আবার আলবার্ট হাঙ্গেরীতে গ্যাবরকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন। তাহার পর টিলী ও আলবার্ট সম্মিলিত হইয়া সম্রাটের শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিলেন। এই সময় সম্রাট যদি জয়মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া ডেনমার্কের রাজার প্রস্তাবিত সন্ধি-সংস্থাপনে অসম্মত না হইতেন, তবে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইত—দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর প্রজাপুঞ্জ শান্তি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। আবার যে সকল প্রোটেষ্টাণ্ট ভূস্বামী ক্যাথলিক ধর্ম্মাজকদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সে সকল সম্পত্তি ত্যাগ করিতে অস্বীকার করায়, আলবার্ট সম্রাটের পক্ষে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। স্থলে পরাভূত হইলেও ডেনমার্কের রাজা জার্ম্মাণী ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার ও সুইডেনের রাজার নৌবহর অ্যালবার্টের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। আলবার্টের সেনাদল ধনলোভে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট

যাহাকে পাইত, লুণ্ঠন করিত। দেশের লোক সর্ব্বস্বান্ত ও অত্যাচার-পীড়িত হইলে শেষে ক্যাথলিক লীগই সম্রাটকে অনুরোধ করিয়া সেনাপতিপদে টিলীকে প্রতিষ্ঠিত করাইলেন। সে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সুইডেনের রাজা গাস্‌টেভাস অ্যাডলফাস প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি সম্রাটের সেনাদল পরাভূত করিয়া টিলী কর্ত্তৃক আক্রান্ত ম্যাগডিবার্গ সহরের উদ্ধারজন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি আসিবার পূর্ব্বেই টিলী সহরে প্রবেশ করিলেন। টিলীর সেনারা সহরে অগ্নিযোগ করিল, যাহাকে পাইল নিহত করিল। সহরের পথে বিশ হাজার সহরবাসীর শব পতিত রহিল। সেই জন্য টিলীরও অনুতাপ উপস্থিত হইল। ছত্রিশটি যুদ্ধে জয়লাভের পর টিলী গাস্‌টেভাসের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। গাস্‌টেভা-সের সেনাদল ক্যাথলিকদিগের উপর দারুণ অত্যাচার করিতে লাগিল। সময় পাইয়া ইংলণ্ডের রাজজামাতা ফ্রেডরিক সস্ত্রীক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গাস্‌টেভাসের সহিত যোগ দিলেন। মুনিকে প্রবেশকালে তাঁহার পত্নী লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসে বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে একটি বানরকে ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত করিয়া—তাহার হস্তে জপের মালা দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া, সঙ্গে লইল! টিলী সেনাসংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সুইডেনের সেনাদিগের অত্যাচার জার্ম্মাণদিগের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া এক দিন অতর্কিত ভাবে প্রোটেষ্টাণ্ট সেনাদলকে আক্রমণ করিল। গাস্‌টেভাসের সেনাপতিরাও অত্যাচারের একশেষ করিতে লাগিলেন। গাস্‌-টেভাস ষোল হাজার সৈনিক লইয়া জার্ম্মাণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এখন তাঁহার সৈনিকসংখ্যা সত্তর হাজারে পরিণত হইয়াছিল।

অন্য উপায় না দেখিয়া সম্রাট আবার অ্যালবার্টের শরণাপন্ন হইলেন। সম্রাটের অবস্থা দেখিয়া আলবার্ট বলিলেন, যদি সম্রাটের সেনাদল সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন হয়, তিনি বিজিতপ্রদেশ যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার অধিকার পায়েন এবং তিনি যে সম্পত্তি ইচ্ছা সেনা-দলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন, তবেই তিনি সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন। উপায়ান্তরবিহীন সম্রাট এই সব সর্ত্তই স্বীকার করি-লেন। আলবার্ট আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন শুনিয়া, চারিদিক হইতে লোক তাঁহার দলবৃদ্ধি করিতে লাগিল—কারণ, তাঁহার সৈন্যগণ লুণ্ঠনের অংশ পাইত। গাস্‌টেভাস সে সময় সর্ব্বাপেক্ষা রণকুশল সেনাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আলবার্ট তাঁহার সহিত শক্তিপরীক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেও তাঁহার সেনাদলের সম্মুখীন হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিলেন, তিনি প্রথমে আক্রমণ করিয়া বলক্ষয় করিবেন না। এ দিকে গাস্‌টেভাসের সেনা-দলে ব্যাধিবিস্তার হওয়ায় তিনি শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন। আলবার্টের সৈন্যদিগের অগ্নিবর্ষণে তাঁহার সেনাদল অগ্র-সর হইতে পারিল না। শেষে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর গাস্‌টে-ভাসের সেনাদল আবার আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। গাস্‌টে-ভাস স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালিত করিলেন। কিন্তু সম্রাটের সৈন্য-দিগের অগ্নিবর্ষণে সুইডেনের রাজার মৃত্যু হইল। এ দিকে অ্যাল-বার্টের সেনাদল সুইডিস সৈন্যের আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, পশ্চাৎপদ হইল। গাস্‌টেভাসের মৃত্যু না হইলে সম্রাটের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইত।

কিন্তু সম্রাট আবার আলবার্টের ক্ষমতাধিক্যে শঙ্কিত হইতে ছিলেন। আলবার্ট তাঁহার আদেশানুসারে কায করিতে অস্বীকার

করিলে, তিনি তাঁহাকে সেনানায়ক হইতে পদচ্যুত করিতে মনস্থ করিলেন। এই সংবাদে আলবার্ট সম্রাটের শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষেই ক্ষমতালাভের জন্য ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। সম্রাট আলবার্টকে "একঘরে" করিলেন। আলবার্ট তাহাতে বিন্দুমাত্র ভয় প্রকাশ করিলেন না। শেষে সম্রাট আলবার্টের বিশ্বাসভাজন তিন জন লোককে কৌশলে স্বদলভুক্ত করিয়া ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত করাইলেন। তাহারা আলবার্টকে হত্যা করিয়া সম্রাটকে নিঃশঙ্ক করিল। কণ্টকে কণ্টকের উদ্ধার হইল বটে; কিন্তু আলবার্টের হত্যাব্যাপার অষ্ট্রীয়ার ইতিহাসে কলঙ্কচিহ্ন বলিয়াই পরিগণিত।

আলবার্টের মৃত্যুর পর সম্রাটের পুত্র রাজকীয় সেনাদলের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। ইনিই উত্তরকালে তৃতীয় ফার্ডিনান্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। উইমারের ডিউক বার্ণার্ড ও সুইডিস সেনাপতি হোর্ণ প্রোটেষ্টাণ্ট সেনা-চালনার ভার লইলেন। নর্ডলিন্‌জেনে প্রোটেষ্টাণ্ট সেনা পরাজিত হইল,—ডিউক পলায়ন করিলেন; হোর্ণ বন্দী হইলেন। প্রোটেষ্টাণ্ট পক্ষে দ্বাদশ সহস্রাধিক লোক প্রাণত্যাগ করিল। আবার ফরাসীরা সম্রাটের ক্ষমতায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল—লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। কখন এক পক্ষ কখন অপর পক্ষ জয়লাভ করিতে লাগিল। জার্ম্মাণীর অধিবাসীরা আর যুদ্ধের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিল না। তাই ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

এই ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধিতে সুদীর্ঘ ত্রিংশবর্ষব্যাপী সমরের অবসান হইল বটে, কিন্তু জার্ম্মাণীর দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। এলসাস ফরাসীর, পমিরানিয়া সুইডেনের হস্তগত হইল; সুইটজারল্যাণ্ড ও হলাণ্ড

জার্ম্মাণীর অঙ্গচ্যুত হইল। এই সময় হইতে রিসটাগে শাসনবিষয়ক ক্ষমতা পরিচালিত হইতে লাগিল; সাম্রাজ্যের একতা নষ্ট হইয়া গেল—জার্ম্মাণীতে স্বস্বপ্রধান বহু খণ্ডরাজ্য সৃষ্ট হইল। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী সম্প্রদায় সমাবস্থ হইল। প্রোটেষ্টাণ্টগণ যে সব দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, সে সব অবাধে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। পোপ এই শেষোক্ত ব্যবস্থায় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধের বেদনাবিহ্বল জার্ম্মাণী আর তাঁহার কথা শুনিল না।

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ক্ষতির পরিমাণ করা দুষ্কর। যুদ্ধে জার্ম্মাণীর জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়াছিল। সকলে যে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, এমন নহে। পরন্তু যুদ্ধে ও যুদ্ধের ফল দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে এই লোকক্ষয় সংঘটিত হইয়াছিল। শত শত গ্রামের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল; শত শত গ্রাম জনশূন্য হইয়াছিল। গ্রামে লোক নাই—মাঠে শস্য নাই; সহরে ব্যবসা বন্ধ—রাজপথে তৃণ জন্মিয়াছে। গৃহের দ্বার ভগ্ন—গৃহ শূন্য। তখন জার্ম্মাণীর এই অবস্থা। এক উরটেমবার্গে এই যুদ্ধে আটটি নগর, পঁয়তাল্লিশখানি গ্রাম, আটষট্টিটি গির্জ্জা এবং ছত্রিশ হাজার গৃহ নষ্ট হইয়াছিল। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সাত বৎসরে তথায় তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। থুরিঞ্জিয়ায় যুদ্ধের পূর্ব্বে উনিশ খানি গ্রামে এক হাজার সাত শত তেয়াত্তরটি পরিবারের বাস ছিল; যুদ্ধের পর তথায় তিন শত ষোলটি পরিবারমাত্র অবশিষ্ট ছিল। যুদ্ধের সময় দেশে এমন দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যে, লোক ক্ষুধার তাড়নায় নরমাংস ভোজনেও প্রবৃত্ত হইত। দলে দলে লোক মানুষ মারিয়া খাইত—ফাঁসি কাষ্ঠ হইতে শব নামাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। বাঙ্গালায় একবার এমনই

অবস্থা ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অমরগ্রন্থ 'আনন্দমঠে' পাঠক সেই সময়ের বাঙ্গালার বর্ণনায় দেখিতে পাইবেন। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণীর এরূপ লোকক্ষয় হয় যে, ফ্রাঙ্কোনিয়ায় সরকার আইন করেন,—পুরুষ এক কালে দুইটি বিবাহ করিতে পারিবে—আর কোন পুরুষ সন্ন্যাসী বা কোন রমণী সন্ন্যাসিনী হইতে পারিবে না। বলাবাহুল্য প্রজাবৃদ্ধির জন্যই সরকারের এই সব ব্যবস্থা।

ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধির দশ বৎসর পরে তৃতীয় ফার্ডিনাণ্ডের পুত্র লিওপোল্ড সম্রাট নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফরাসী সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইর সহিত যুদ্ধ। লুই বলশালী ও ধূর্ত্ত। তিনি রাইন নদীকে তাঁহার রাজ্যসীমা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। লিওপোল্ড দুর্ব্বল কিন্তু অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন। কিন্তু তখন প্রবল ও কঠোর শাসন ব্যতীত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য রক্ষা করা কোন নৃপতির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই লিওপোল্ডকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। কারণ, তখন জার্ম্মাণীর ক্ষমতাবান অভিজাতবংশীয়গণ স্বার্থপরতাহেতু স্বার্থলোভে লুইর পক্ষ সমর্থন করিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ সংসাধিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তখন জার্ম্মাণীর অঙ্গ হইতে দীর্ঘকালব্যাপী সমরের ক্ষতচিহ্ন কেবল লুপ্ত হইতেছে। জার্ম্মাণীর কোন কোন অংশ—বিশেষ রাইন নদীর দক্ষিণ কূল ফরাসীদিগের কৃত অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। লুইর ষড়যন্ত্রে ষ্ট্রাসবার্গ প্রভৃতি সহরও শত্রুহস্তগত হইতে লাগিল। জার্ম্মাণগণ লোভপরবশ হইয়া দেশদ্রোহিতা করিতে লাগিল। তিনবার ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্ম্মাণী ফ্রান্সের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করে। কিন্তু তাহাতেও লুইর আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। তিনি স্বকার্য্যসাধনপথ কণ্টকশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে

তুর্কদিগকে জার্ম্মাণী আক্রমণে উৎসাহিত করিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় তুর্কগণ হাঙ্গেরীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ভিয়ানা নগর অবরুদ্ধ করিল। ভিয়ানাবাসীরা কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইল না। দুই মাস কাটিয়া গেল। তুর্করা নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অত্যাচার করিয়া সাতাশী হাজার জার্ম্মাণকে দাস করিল। তাহারা ভিয়ানার পুরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তথাপি ভিয়ানাবাসীরা পরাভব স্বীকার করিল না। শেষে পোলাণ্ডের রাজা আসিয়া তুর্কদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভিয়ানাবাসীদিগের উদ্ধার সাধন করিলেন। বিংশ সহস্র সৈনিক হারাইয়া তুর্করা পলায়ন করিল—তাহাদের নায়কের শিবিরে লুইর পত্র পাওয়া গেল; তিনিই তুর্কদিগকে সমরে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই সময় "গ্রেট ইলেক্টর" ও প্রিন্স ইউজিন বীরত্বে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধিতে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য স্বল্পপ্রধান বহু সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। সামন্ত রাজারা নামে সামন্ত হইলেও কাযে স্বাধীন ছিলেন এবং সামন্তচক্রের প্রধান সম্রাটের মঙ্গলার্থ স্বার্থত্যাগ করিতেন না। কিন্তু ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টর ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি লুইর প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া সম্রাটের সাহায্যার্থ প্রাণপণ করিয়াছিলেন। লুই সুইডদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সেভয়ের প্রিন্স ইউজিন জার্ম্মাণীর পশ্চিমে লুইর গতিরোধ করিয়াছিলেন—পূর্ব্বে তুর্কদিগের গর্ব্বখর্ব্ব করিয়াছিলেন। তিনি দুর্ব্বলদেহ বলিয়া তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের কার্য্যে ব্রতী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মচর্চ্চা তাঁহার ভাল না

লাগায় তিনি অস্ত্রচালনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিমি প্রথমে লুইর সহিত যোগ দিতে চাহেন। কিন্তু লুই তাঁহাকে কার্য্যভার দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি তুর্কদিগের সহিত যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি সেনাদলের নায়কত্ব লাভ করিলে সৈনিকগণ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, তিনি যে তুর্কদিগের দাড়ীনাগাল পাইবেন না! কিন্তু তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই দেখিতে পাইয়াছিল যে. শারীরিক শক্তি মানসিক তেজের তুলনায় নগণ্য। তিনি পুনঃ পুনঃ তুর্কদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। শেষে লুই তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিবার জন্য—ফিল্ড-মার্শাল উপাধি, বহু অর্থ ও একটি ফরাসী প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ দিতে চাহেন। ইউজিন সে প্রস্তাব পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান করেন।

ইহার পর আবার য়ুরোপব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হয়। স্পেনের নৃপতি দ্বিতীয় চার্ল্‌সের মৃত্যু হইল। তিনি অপুত্রক ছিলেন। ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই, জার্ম্মাণীর সম্রাট লিওপোল্ড, বেভেরিয়ার ইলেক্টর ফার্ডিনাণ্ড—তিন জনই স্পেনের সিংহাসনলাভে স্ব স্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হয়েন। এই যুদ্ধে হলাণ্ড, ইংলণ্ড ও পর্ত্তুগাল লিওপোল্ডের পক্ষাবলম্বন করেন। ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টর এবং হনোভারের ইলেক্টরও সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘের সেনাচালনভার ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব মার্লবরো ও প্রিন্স ইউজিনের উপর অর্পিত হয়। ফরাসীরা বহু চেষ্টাতেও ইহাদিগকে পরাভূত করিতে পারে নাই। জার্ম্মাণী, ইটালী, নেদারল্যাণ্ডস—সর্ব্বত্র ফরাসীরা পরাজিত হয়। পোপ এবং বেভেরিয়ার ইলেক্টর ফরাসী পক্ষ গ্রহণ করেন। এই সময় হাঙ্গেরীতেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রিন্স ইউজিন ইটালীতে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, এমন সময় লুইর

সেনাদল রাইন নদী পার হইয়া ভিয়ানার দিকে অগ্রসর হইল। বেভে-রিয়ানরা তাহাদের সহিত যোগ দেওয়ায় তাহাদের সংখ্যা ৫৬ হাজারে পরিণত হইল। মার্‌লবরো ও ইউজিন ৫২ হাজার সৈনিক লইয়া তাহা-দের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু সংখ্যাধিক্যে ফরাসীদিগের কোন সুবিধা হইল না। প্রধানতঃ মার্‌লবরোর রণকৌশলে ব্লেনহিমের যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হইল। ফরাসীপক্ষে হত, আহত ও বন্দী—মোট চল্লিশ হাজার হইল। যাহারা জার্ম্মাণী জয় করিয়া রাজ্যবিস্তারের আশা করিয়াছিল, ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে তাহাদের পরাভব হইল। তাহার পর মার্‌লবরো বর্ষাধিককাল ফরাসীদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া যখন আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ফরাসীদিগের জয়ের শেষ আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সকলের সম্মতিক্রমে পঞ্চম ফিলিপ স্পেনের রাজা হইলেন।

জার্ম্মাণী কিছু দিনের জন্য শান্তিলাভ করিল। কিন্তু বিলাসের মধ্যে সঙ্গীত ব্যতীত আর কোন শিল্পের উন্নতি সাধিত হইল না। ভগ্ন গীর্জ্জার সংস্কার হইল। কিন্তু শিল্পে কেবল চাকৃচিক্যের—প্রসাধনের প্রাবল্য লক্ষিত হইতে লাগিল। কৃষকরা প্রভুদিগের বিলাসের ব্যয় যোগাইতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল। পুরুষরা তখন বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইতেন—গুম্ফশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিতেন। পোলাণ্ডের রাজার সহিত ডাচেস লুই-সের বিবাহের প্রস্তাব হইলে ডাচেস—রাজার চিত্র দেখিয়া শিহরিয়া বলিয়াছিলেন,—ইনি যে বিকলাঙ্গ,ইঁহার ওষ্ঠে ইন্দুরের লেজের মত দুইটি মাংসপিণ্ড রহিয়াছে! বলা বাহুল্য, রাজার গুম্ফই ডাচেসের বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর ইতিহাসে নবযুগের আবির্ভাব হইল। এই বৎসর দ্বিতীয় ফ্রেডরিক প্রসিয়ার রাজা ও মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রীয়ার

রাণী হইলেন। ফ্রেডরিক থেরেসার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে দুহিতা থেরেসার রাজ্য-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অন্যান্য রাজারা সে ব্যবস্থায় সম্মতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহান্ত হইলে আর কেহই সে কথা মনে করিলেন না—স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির আশায় অষ্ট্রীয়ার অংশ চাহিলেন। থেরে-সার মত রাজগুণসম্পন্না রমণীর পরিচয় জগতের ইতিহাসে অল্পই পাওয়া যায়। ফ্রেডরিক প্রথমে তাঁহার পক্ষাবলম্বনের ভাণ করিয়া শেষে তাঁহার বিরোধী হইলেন। রাজার ব্যবহারে তাঁহার সচিবগণও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। স্বার্থসর্ব্বস্ব ফ্রেডরিকের কিন্তু লজ্জা ছিল না। ঘটনাক্রমে একটি যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি স্পষ্টই বলিলেন, তিনি উদারতা জানেন না—জানেন কেবল স্বার্থ; তিনি যাহা চাহেন, তাহা তাঁহাকে দিতেই হইবে।

শত্রুদলবেষ্টিতা বিপন্না থেরেসা স্বামীর নিকট কোন সাহায্য পাই-লেন না। তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া রাজধানী হইতে হাঙ্গেরীতে পলায়ন করিলেন। তথায় হাঙ্গেরিয়ান বেশে সজ্জিতা হইয়া তিনি প্রধানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি যখন অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে আপনার শিশুকে প্রধানগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন সকলেই বিচলিত হইলেন; সকলেরই হৃদয় তাঁহার দুঃখে বিগলিত হইল; সকলেই তাঁহার জন্য প্রাণপণ করিলেন।

ইংলণ্ডের লোক প্রসিয়ার রাজার অনাচারে বিরক্ত হইল। পার্লা-মেন্ট থেরেসার সাহায্যার্থ ৪৫ লক্ষ টাকা দিবেন, স্থির করিলেন। এই সুযোগে যে ফরাসীরা ও বেভেরিয়ানরা অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। থেরেসা একদিকে নিশ্চিন্ত

হইলেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কারণ, ফ্রেডরিক তাঁহার সেনাদলকে পরাভূত করিতে লাগিলেন। এ দিকে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জ থেরেসার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুদলন করিতে লাগিলেন। ফ্রেডরিককে রাজ্যের একাংশ দিয়া থেরেসা তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ফ্রেডরিকের ভয় হইল, থেরেসা প্রদত্ত রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিবেন। তিনি বিবিধ ষড়যন্ত্রের ফলে ইংরাজদিগকে অষ্ট্রীয়ার সাহায্যে বিরত করিয়া অষ্ট্রীয়ানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে আবার সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এ দিকে থেরেসার স্বামী অষ্ট্রীয়ার সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইয়া প্রথম ফ্রান্সিস নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হইল; এই যুদ্ধে কতক রাজ্য অষ্ট্রীয়ার হস্তচ্যুত হইল।

থেরেসার সহিত ব্যবহারে ফ্রেডরিক যে স্বার্থপরতার ও নীচতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কুশিক্ষার ফল। তাঁহার পিতা অতি হীনস্বভাব ও নির্দ্দয় ছিলেন। তিনি ভয় দেখাইয়া লোকের ভালবাসা পাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া মনে করিতেন, পুত্র ভয়ে তাঁহাকে ভালবাসিবে। তাঁহার বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দূরে থাকুক, ঘৃণাই ছিল। তিনি পুত্রের প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার করিতেন—তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, একাধিক বার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এইরূপ অস্বাভাবিক নির্দ্দয় পিতার ব্যবহারে ফ্রেডরিকের প্রকৃতি বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাজ্যাংশ দিয়া ফ্রেডরিকের সহিত সন্ধি-সংস্থাপনের বেদনা থেরেসার হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। তিনি যখন দেখিলেন, ফ্রেডরিকের বলবৃদ্ধিতে নৃপতিবৃন্দ শঙ্কিত হইতেছেন, তখন তিনি প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে

এক শক্তিসঙ্ঘ সংস্থাপিত করিলেন। ফ্রান্স, রুসিয়া ও স্যাকসনী সে সঙ্ঘে যোগ দিলেন। প্রসিয়ার পক্ষে ইংলণ্ড সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ফ্রেডরিক শত্রুদলের সম্মিলনের পূর্ব্বেই স্যাকসনী আক্রমণ করিলেন। আবার সাত বৎসর যুদ্ধ চলিল। তখন প্রায় অর্দ্ধ য়ুরোপ ফ্রেডরিকের বিপক্ষে দণ্ডায়মান। কিন্তু রণকৌশলে ফ্রেডরিক সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিতে লাগিলেন। শেষে দীর্ঘকাল যুদ্ধে—বলক্ষয়ে—ধনক্ষয়ে যখন উভয় পক্ষের মিত্রগণ স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সমরশ্রান্ত প্রসিয়ায় ও অষ্ট্রীয়ায় সন্ধি হইল। যে রাজ্যাংশ প্রসিয়ার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা প্রসিয়ার হস্তগত রহিল।

যুদ্ধের পর জয়ী ফ্রেডরিক রাজ্যের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইলেন। যুদ্ধে তাঁহার রাজ্যে ১৪ হাজার ৫ শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছিল; স্যাকসনীতে এক লক্ষ এবং বোহিমিয়ায় এক লক্ষ আশি হাজার লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কৃষক ছিল না যে, জমীতে চাষ দিবে। তখন লোক আলুর চাষ করিতে চাহিত না। ফ্রেডরিক বলপূর্ব্বক আলুর চাষ করাইয়াছিলেন। তাহাতে বহু লোকের জীবনরক্ষা হইয়াছিল। তিনি বিনষ্ট গৃহের পুনর্নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন; কৃষকদিগকে বীজ-শস্য দিলেন; রাস্তা করিতে লাগিলেন; খাল কাটাইয়া জলাভূমিতে চাষের সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসর তিনি সমগ্র রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া দেশের লোকের অবস্থা দেখিতেন; কোন অনাচার দেখিলে তাহার প্রতীকার করিতেন। কোন পতিত জমীতে চাষ হইয়াছে দেখিলে তিনি বলিতেন, "আমি একটি নূতন প্রদেশ জয় করিয়াছি।" তিনি বিজ্ঞানের ও শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন, বিদ্যালয় নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, বিচার-কার্য্যের উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি প্রজার অবস্থা বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তাহাদিগের কোন

অসুবিধা দেখিলে তাহার প্রতিবিধান করিতে বিলম্ব করিতেন না। তিনি কৃষকদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ অবগত হইতেন। তাই কৃষকগণ তাঁহাকে ভালবাসিত এবং পিতা বলিয়া সম্বোধন করিত। তরুণ বয়সে তিনি ধর্ম্মজ্ঞানহীন ফরাসী গ্রন্থকারদিগের রচনা পাঠ করিয়া ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। সেই জন্য অপরের ধর্ম্মাচরণসম্বন্ধে উদার ছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালে ধর্ম্ম লইয়া কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হইত না, কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস না থাকায় তিনি সদসদ্বিচারবুদ্ধি-বিহীন হইয়াছিলেন। তিনি যে প্রজার হিতে প্রাণপণ করিতেন সে স্বার্থপরতাহেতু, কি প্রজার সমৃদ্ধিতেই তাঁহার ক্ষমতা এই জ্ঞানহেতু কি তিনি সত্য সত্যই হৃদয়বান্ ছিলেন বলিয়া, তাহা বলা যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রক্ষীদিগের একজন দারিদ্র্যহেতু ঘড়ী কিনিতে না পারিয়া চেনের সহিত একটি বন্দুকের গুলী সংযুক্ত করিয়া পরিত। রাজা এক দিন তাহাকে কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, সে গুলীটি বাহির করিয়া বলিয়াছিল, "আমার ঘড়ীতে একই সময় দেখা যায়—সে সময় আমি আমার সম্রাটের জন্য মরিতে প্রস্তুত।" শুনিয়া ফ্রেডরিক তাহাকে তাঁহার সোণার ঘড়ী দিয়াছিলেন। তিনি নস্য লইতে ভালবাসিতেন, সেই জন্য তাঁহার পোষাক সর্ব্বদাই ময়লা হইত। একবার তিনি অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকালে অষ্ট্রীয়ার পোষাক পরিয়াছিলেন। তাহা শ্বেতবর্ণের। তাঁহার নস্যের ময়লায় তাহা মলিন হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাই অষ্ট্রীয়ানদিগকে বলিয়াছিলেন, "দেখুন, আমি আপনাদের মত পরিষ্কার নহি—আপনাদের পোষাক পরিবার উপযুক্ত নহি।" তিনি বলিতেন, "মৃত্যুর সহিত আলস্যের সাদৃশ্য যত অধিক—আর কিছুরই তত অধিক

নহে। আমার বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন নহে—কিন্তু যে কয়দিন জীবিত থাকি, সে কয় দিন কার্য্যে ব্রত থাকা প্রয়োজন।" তিনি বংশীবাদন-প্রিয় ছিলেন এবং যখন রাজকার্য্যের বিষয় চিন্তা করিতেন, তখন বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি শাসনগুণে য়ুরোপে প্রসিয়াকে অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মত প্রথম শ্রেণীর রাজ্যে উন্নীত করেন। তাঁহার সেনাবল তাঁহার শাসনে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে জার্ম্মাণগণ বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্য সমৃদ্ধ, তাহাতে ষাট লক্ষ লোকের বাস, সেনাদল সুশিক্ষিত, রাজকোষ ধনপূর্ণ। ফ্রেডরিক জার্ম্মাণীর ইতিহাসে "ফ্রেডরিক দি গ্রেট" নামে পরিচিত।

যখন দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের অবসান হইল, তখন জার্ম্মাণী দুই শত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্যে বিভক্ত। তখন ফ্রান্সই জার্ম্মাণীর আদর্শ। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণীতে জ্ঞানদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল—কিন্তু ফ্রান্স তখন সুশিক্ষিত ও সুসভ্য। কাযেই জার্ম্মাণ অভিজাতবংশীয়গণ ফরাসীদিগের অনুকরণ করিতেন। কিন্তু ফরাসী সভ্যতা অন্তঃসারশূন্য—বাহ্যসৌন্দর্য্য-সমুজ্জ্বল ছিল।

ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুইও বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে ও রাজগুণে ফ্রেডরিকের বিপরীত ছিলেন। লুই স্বয়ং খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার কালে যে বিদ্রোহের বীজবপন হইয়াছিল—তাহাতেই পরে ফরাসী সিংহাসন বিনষ্ট হয়। ফ্রেডরিক প্রসিয়াকে সমৃদ্ধ করিয়া সিংহাসন এমত দৃঢ় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন যে, উত্তর কালে প্রসিয়াই বিশাল জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইয়া নবীন জার্ম্মাণী গঠিত করিয়াছিল। দুই

রাজার এইরূপ প্রভেদ ছিল। লুই যখন ভার্সেলসে প্রাসাদরচনা করিয়া বালুকাবৃত ভূভাগে সহর নির্ম্মিত করিলেন, তখন জার্ম্মাণগণও অনুপযুক্ত স্থানে নগর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। জর্জ্জ সাপুয়েল অন্য স্থানের অভাবে পর্ব্বতের উপর গ্রাম রচিত করিতে লাগিলেন। বাকবার্গের কাউন্ট ফরাসীর অনুকরণে দুর্গনির্ম্মাণ করিতে সমুৎসুক হইয়া একটি বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মিত ও সজ্জিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্পত্তি অতি ক্ষুদ্র—দুর্গমধ্যে রক্ষার জিনিষ—কতকগুলি কুটীর, একটা মানমন্দির আর একখানি আলুর ক্ষেত! এইরূপে অনেক প্রাসাদাদি রচিত হয়—তাহাতে প্রজার অর্থ নষ্ট করিতে ভূস্বামীরা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আর সবই এমন নক্সা কাটিয়া সমভাবে গঠিত যে, তাহাতে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না। কোন কোন গৃহে প্রায় তিন শত কক্ষও ছিল!

অষ্ট্রীয়ার রাণী থেরেসার পুত্র জোসেফ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বকার্য্যে ফ্রেডরিককেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। জোসেফ বিনয়ী ও প্রজার হিতকামী ছিলেন। তখন সকলেই জুয়া খেলিত। কিন্তু জোসেফ খেলিতেন না। তিনি বলিতেন, রাজা জুয়াখেলায় যে টাকা হারেন—সে টাকা ত প্রজার। কিন্তু তিনি সংস্কারসাধনে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া ফ্রেডরিক বলিতেন, তিনি প্রথম পদ না বাড়াইয়াই দ্বিতীয় পদ বাড়াইয়া থাকেন। তিনি যেমন ফ্রেডরিকের প্রশংসা করিতেন—,ফ্রেডরিকও তেমনই তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। তখন লোক সব বিষয়ে সমতালাভের চেষ্টা করিত। জোসেফ সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অষ্ট্রীয়ায় প্রধানতঃ দশটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হইত; প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন আইন ও শাসনপ্রণালী ছিল। জোসেফ ধর্ম্ম, ভাষা, আইন ও আচারগত পার্থক্য দূর করিয়া

সমগ্র রাজ্য একই প্রণালীতে শাসন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন দেশে ত্রয়োদশ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। তিনি সে গুলির উচ্ছেদ-সাধন করিলেন; জার্ম্মাণ ভাষাই রাজভাষা করিলেন—কর্ম্মচারী-দিগকে দুই বৎসরের মধ্যে সে ভাষা শিক্ষা করিতে আদেশ দিলেন; পুরাতন নিয়মাদির পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ভালই ছিল। নানা আইনে শাসিত নানা জাতীয় লোকের শাসনকার্য্য জটিল ও দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু প্রত্যেক জাতি স্বীয় আচার ও আইন এতই ভালবাসে যে, পরিবর্ত্তনের নামে শঙ্কিত ও বিরক্ত হয়। তাই জোসেফের চেষ্টায় দেশে কেবল গোলযোগ হইয়াছিল। তাহার পর তিনি আদেশ ও নিষেধ তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে তাহা শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার একটু নমুনা দিতেছি—কেহ দেশ হইতে খরগোশের চামড়া রপ্তানী করিবে না। কেহ অনাবশ্যক কুকুর পুষিবে না। কেহ বিনানুমতিতে তামাকের চাষ করিবে না।

জোসেফ ভুল করিয়া থাকিলেও দেশের কল্যাণকর কার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ভালই ছিল; কিন্তু উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কি অবস্থায় কি কাজ করা সঙ্গত, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। তিনি কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। যে সকল মঠে লোকের কোন উপকার হইত না, তিনি সে সকল মঠ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—তাহাতে রাজ্যমধ্যে মঠের সংখ্যা দুই হাজার হইতে সাত শত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা হয় শিক্ষা দিবেন, নহে ত ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, নহেত পীড়িতের শুশ্রূষা করিবেন—ইহাই তাঁহার মত ছিল। মঠ তুলিয়া দেওয়াতে যে অর্থ সরকারের হস্তগত হয়, তাহাতে তিনি বিদ্যা-

লয়, হাঁসপাতাল, পুস্তকালয় প্রভৃতি লোকহিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে মঠমধ্যে বহুবিধ অনাচারের সন্ধান পাইয়া তিনি সে সকলের প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পোপ ষষ্ঠ পায়স জোসেফের এই সব কার্য্যে আপনার ক্ষমতালোপ শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে স্বয়ং ভিয়ানায় আসিয়াছিলেন। জোসেফ তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখান নাই; পাছে তিনি রাজ্য মধ্যে অশান্তিবিস্তার করেন, এই ভয়ে তাঁহাকে প্রায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পোপের বাসগৃহের সদরদরজা ভিন্ন আর সব দরজা গাঁথিয়া বন্ধ করা হয় এবং দ্বারে প্রহরীর ব্যবস্থা হয়। চারি সপ্তাহ এইরূপে কাটাইয়া পোপ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কিন্তু জোসেফ দেশে যে সকল পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে দেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়। বেলজিয়ম কর দিতে অস্বীকৃত হয় ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হাঙ্গেরীতেও বিদ্রোহ হইলে তিনি পরিবর্ত্তন প্রত্যাহরণ করিতে বাধ্য হয়েন। তুর্কদিগের সহিত যুদ্ধেও তাঁহার পরাভব হয়। এই অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর লোক তাঁহার সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করিবে।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান জোসেফের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা লিয়োপোল্ড সিংহাসনের অধিকারী হয়েন। তখন সিংহাসন বিপদে বেষ্টিত—জোসেফের সংস্কারসাধনপ্রয়াস কালোচিত হয় নাই বলিয়া রাজ্যমধ্যে অশান্তি ব্যাপ্ত হইয়াছে। নবীন নৃপতি বুদ্ধিবলে সে সকল বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্ম্মাণীতে সাহিত্যসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হয়। লেসিং প্রচলিত কৃত্রিম নিয়মনিগড়বদ্ধ সাহি-

ত্যকে মুক্তি দিয়া সে উন্নতির সূত্রপাত করেন। তিনি ফরাসী লেখক-দিগের অনুকরণ নষ্ট করিয়া জার্ম্মাণ সাহিত্যে মৌলিকতার যুগপ্রবর্ত্তন করেন। সেই যুগেই গেটের ও সিলারের আবির্ভাব। ইংরাজ লেখকরা স্বীকার করেন, সাহিত্যক্ষেত্রে গেটের স্থান কেবল সেক্সপীয়ারের নিম্নে। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন; কিন্তু তাঁহার গর্ব্বের মাত্রা কিছু অধিক ছিল। কার্লাইল তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন। স্কট, সাদে, কার্লাইল প্রভৃতি তাঁহার জন্মদিনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কার্লাইল বলেন, সে সময়ের প্রধান লোক দুই জন—গেটে ও নেপোলিয়ন; তবে গেটে নেপোলিয়নের অপেক্ষা অনেক বড়!

এই সময় জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ভূগোলে, ইতিহাসে, সমালোচনায়, দর্শনে, ধর্ম্মতত্ত্বে সকল দিকেই লেখকগণ সাহিত্যের উন্নতিবিধানে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। জার্ম্মাণীতে সঙ্গীতের উন্নতি পূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়াছিল—এখন তাহার পূর্ণ-পরিণতি পরিলক্ষিত হইল। এই সময় হইতে জার্ম্মাণীর জ্ঞানে নূতন উন্নতির সূত্রপাত হইল।

এ দিকে ফ্রান্সের রাজনীতিক কারণপরম্পরায় বজ্রগর্ভ প্রলয়মেঘের সঞ্চার হইতেছিল; যে বিপ্লবে য়ুরোপের রাজনীতিতে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার সূচনা হইতেছিল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইর মৃত্যুর পর যিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন, তিনি ছয় বৎসরের বালক। ডিউক অব অর্লিন্স রাজরক্ষক নিযুক্ত হইয়া কায চালাইতে লাগিলেন। ডিউক চরিত্রহীন—উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করিতেন। হীন আদর্শ সহজেই অনুকৃত হয়—এ ক্ষেত্রেও হইল। পারিষদপুঞ্জ তাঁহার হীন আদর্শের অনুকরণ করিতে লাগিল। তাঁহার অমিতব্যয়িতায় সরকারী ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিল। রাজা সাবালক হইলেও এ অব-

স্থার পরিবর্ত্তন হইল না। তিনিও বিলাসব্যসনে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইলেন। মন্ত্রীরা ও পারিষদবর্গ যাহা ইচ্ছা করিতে লাগিল। লোক পাপ করাই গৌরবজনক মনে করিতে লাগিল—যাহারা পাপানুষ্ঠান করিত না, তাহারাও পাপানুষ্ঠানের ভাণ করিত! অনেক লেখক কেবল ধর্ম্মের নিন্দা করিবার জন্য লেখনীধারণ করিতেন।

আবার দেশের মধ্যে অশান্তির বীজ ব্যাপ্ত হইতেছিল। শাসনপ্রণালীর ক্রটি প্রদর্শিত করিয়া সংস্কারপ্রবর্ত্তন ও অনাচারণনিবারণ করিবার জন্য লোককে উত্তেজিত করিতে পুস্তিকার প্রচার হইতে লাগিল। রাজসভার পাপ, সরকারের অমিতব্যয়িতা ও তজ্জনিত বিপদ্, সরকারী ঋণের বৃদ্ধি এই সকল দেখাইয়া লোককে উত্তেজিত করা হইতে লাগিল। তখন অভিজাতবংশীয়গণ ও পুরোহিত-সম্প্রদায় করদান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই ব্যবসায়ীরা ও কৃষকগণ দুর্ব্বহ করভারে পীড়িত হইত। ইংলণ্ডে এই অনাচারের প্রতীকার হইয়াছিল—কিন্তু ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে প্রতীকার হয় নাই। এই সময় আবার উত্তর-আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ফ্রান্স ইংলণ্ডের শত্রুতাসাধনজন্য আমেরিকায় ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বহু লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল,—প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রশংসায় "পঞ্চমুখ" হইয়াছিল। তাহারা নূতন শাসনপ্রণালীর সহিত তুলনা করিয়া ফ্রান্সের প্রাচীন দুষ্ট শাসনপ্রণালীর নিন্দা করিতেছিল।

এইরূপে লোকের মনে—করদানদায়মুক্ত অভিজাতবংশীয়দিগের প্রতি ও ধর্ম্মযাজকদিগের উপর বিষম ঘৃণা ও ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে ঘৃণা ও ক্রোধ অনাচারের উৎস রাজাকেও স্পর্শ করিল।

যখন দেশের এই অবস্থা সেই সময় ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি অষ্ট্রীয়ার মেরিয়া থেরেসার কন্যা মেরী অ্যাণ্টইনেটকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে লোক মনে করিল, রাজ্যে অনাচার নিবারিত হইবে। লুই সজ্জন ছিলেন—তিনি সচ্চরিত্র ও প্রজাবৎসল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি দীর্ঘকালস্থায়ী অনাচারতরু সমূলে উৎপাটিত করেন। তাঁহার রাণী বিলাসিনী ছিলেন—সুতরাং তাঁহার আদর্শ অমিতব্যয়িতা নিবারণের উপযোগী ছিল না। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি যে স্তাবকদলে পরিবৃত থাকিতেন, তাহারা তাঁহাকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে দিত না। উনবিংশ বর্ষ বয়সে তিনি রাণী হয়েন। তিনি স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন —সন্তানদিগকে স্নেহ করিতেন। তিনি অসামান্য রূপবতী ছিলেন। হয় ত তোষামোদের আতিশয্যে তাঁহার স্বভাবের বিকৃতি ভাবও ঘটিয়াছিল।

দেশের দুর্দ্দশা বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজকোষ অর্থশূন্য হইল। রাজস্বে আর ব্যয়সঙ্কুলান হয় না। শেষে গত্যন্তর না দেখিয়া রাজা অভিজাতবংশীয়গণের ও পুরোহিত-সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা কখনও কর দেন নাই—ধনসঞ্চয় রিয়াছিলেন। তাঁহারা করদানে অস্বীকৃত হইলে রাজা জনসাধারণের শরণ লইলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি সভা আহ্বান করিলেন। সে সময় সাধারণ লোকের ও কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসংখ্যা অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসংখ্যার সমান। অভিজাতবংশীয়গণ ও পুরোহিতরা কর দিতে ও সাধারণ লোকের প্রতিনিধিদিগের সহিত এক সভায় বসিতে অস্বীকার করিলে শেষোক্ত দল স্বতন্ত্র সভায় সমবেত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত

দলের কেহ কেহ তাহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। সম্মিলিত দল স্থির করিলেন, তাঁহারা শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবেন। এই সংবাদে প্যারিসের ইতর-সাধারণ উন্মত্ত হইয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাচীর ভূমিসাৎ করিল। এই দুর্গ কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। বাস্তিল দুর্গনাশ য়ুরোপের রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের সূচনা সূচিত করিল। তাহার পর বহু নর-নারী ভার্সেলস প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া কয়জন রক্ষীকে সংহার করিল। রাজা ভীত হইয়া প্যারিসে আসিলেন। এ দিকে জনসাধারণের সভাও প্যারিসে আসিল। সাফল্যে প্রফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া সভা সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিল। তাহারা সাব্যস্ত করিল, অভি-জাতবংশীয়দিগকে কর দিতে হইবে। তাহারা মঠাদির বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে লাগিল। জাতির মধ্যে সব প্রভেদ লুপ্ত হইল—সকলেই সমান। স্থির হইল, দেশের লোকে দেশের রাজা; রাজা সর-কারের সর্ব্বপ্রধান ভৃত্য।

রাজার দুই ভ্রাতা ও বহু অভিজাতবংশীয় ব্যক্তি বিদ্রোহের আরম্ভেই দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে কৃষকগণ বিদ্রোহী হইয়া ভূস্বামি-গণের জমীসংক্রান্ত দলিলপত্র দগ্ধ করিয়া দিল। এ দিকে জনসাধারণের সভা অটল রহিল—সমগ্র ফ্রান্সকে ৮৩ বিভাগে বিভক্ত করিল। সভা লোকের অধিকার বিবৃত করিয়া এক তালিকা প্রচার করিল। গোল কেবলই বাড়িতে লাগিল। রাজপরিবার পলায়নের চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা ফলবতী হইল না।

তত দিনে ইতর-সাধারণ দেশে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছে। তাহারা প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রাজার সুইস্ রক্ষিগণকে নিহত করিয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চাহিল। এই উচ্ছৃঙ্খল জনতার হস্ত

হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজা সপরিবারে সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। সভা রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া রাজপরিবারকে বন্দী করিল। রাজার পক্ষসমর্থনকারীরাও বন্দী হইল।

তখন অষ্ট্রীয়ার সম্রাট লিয়োপোল্ড ও প্রসিয়ার রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়ম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সই প্রথমে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। প্রসিয়ার রাজা স্বীয় রাজ্যের ৫০ হাজার ও অষ্ট্রীয়ার ৩০ হাজার সৈনিক লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

এই সংবাদে ফ্রান্সের ইতর-সাধারণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। বিদ্রোহীরা বহু ভাগে বিভক্ত ছিল—জেকবিনগণ তাহাদিগের সর্ব্বপ্রধান। সেই জেকবিনগণ প্রচার করিতে লাগিল—জার্ম্মাণগণ ফরাসীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা ভায়ানক শত্রু নহে—সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক শত্রুরা প্যারিসের কারাগারে বদ্ধ। উন্মত্ত জনগণ কারাগারে কারাগারে যাইয়া বন্দীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। এই ব্যাপার চলিতে লাগিল। এই সময় রবস্পীয়র জননায়ক হইলেন। সম্মিলিত সেনার আক্রমণ পরাভূত করিয়া শত্রুরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ফরাসী সেনাদল অগ্রসর হইল। ফরাসীরা নেদারল্যাণ্ডস্ আক্রমণ করিল ও অষ্ট্রীয়ানদিগকে পরাভূত করিল। জার্ম্মাণ রাজগণের সম্মিলনেই ফ্রান্সে রাজার সর্ব্বনাশসংসাধিত হইল। জনসাধারণের সভা তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। লুই অবিচলিতভাবে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়া বলিলেন, "ফরাসীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধের অভিযোগ করিয়াছে, আমি সে সকল অপরাধে অপরাধী নহি। যাহারা আমাকে বধ করিতেছে, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে,—তোমরা আজ যে রক্তপাত করিতেছ,

ফ্রান্সকে যেন তাহার জন্ত রক্তদান করিতে না হয়।" সেই তাঁহার শেষ কথা। তাঁহার মন্ত্রী নেকার যথার্থই বলিয়াছিলেন, লুই উদার ও সাধু ছিলেন। পিতা যেমন সন্তানদিগকে ভালবাসে, তিনি প্রজাদিগকে তেমনই ভালবাসিতেন। তিনি যাহা ভাল ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা করিতেন। তিনি কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি করিয়াছিলেন, অত্যাচার নিবারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবন সৎকার্য্য-সাধনে ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি আপনার দোষের জন্ত দণ্ডভোগ করেন নাই—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পাপে তিনি দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন।

রাজার প্রাণনাশের পর রাণীর প্রাণনাশ করা হইয়াছিল। তখন রাণীর বয়স ৩৮ বৎসর মাত্র।

রাজহত্যায় সমগ্র য়ুরোপে ভীতির ও বিরক্তির সঞ্চার হইল। ফ্রান্সেও কোন কোন স্থানে জনসাধারণের সভার উপর লোক বিরক্ত হইয়া উঠিল। অধিকাংশ য়ুরোপীয় নৃপতি ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সম্মিলিত সেনাদল ফরাসী রাজ্যের সীমান্তে অগ্রসর হইল। সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ যদি পরস্পর ঈর্ষ্যায় পর-হিতদ্বেষী না হইতেন, তবে অচিরে ফরাসী প্রজাতন্ত্র-সরকারের সর্ব্বনাশ হইত। কিন্তু তাহা হইল না—তাঁহারা পরস্পরের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এ দিকে ফরাসীরা বলসঞ্চয় করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় ফরাসীরা সাধারণের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিবার জন্ত একটি সমিতি গঠিত করিল। এই সমিতি যাহাকে ইচ্ছা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। রবস্পীয়র সেই সমিতির নায়ক নিযুক্ত হইলেন। কেবলই নরহত্যা হইতে লাগিল। কাহারও প্রাণ নিরাপদ

রহিল না; ফ্রান্সের সর্ব্বত্র রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারও উপর কোনরূপ সন্দেহ হইলেই তাহার প্রাণসংহার করা হইত।

তাহার পর ফরাসীরা শত্রুদিগকে পরাভূত করিতে সচেষ্ট হইল—তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতীও হইল। প্রসিয়া স্বতন্ত্রভাবে ফ্রান্সের সহিত সন্ধিসংস্থাপিত করিল। বেলজিয়ম ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হইল; হল্যাণ্ডে তাহার অধীনে প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংলণ্ড নিশ্চেষ্ট রহিলেন। কেবল অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয়া ফরাসী সেনাদলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

এ দিকে ফ্রান্সে অত্যাচারের শেষ হইল। রবসপীয়ারের ব্যবহারে তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিরাও শঙ্কিত হইয়াছিল। সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। রবস্পীয়ারের স্বহস্তবর্দ্ধিত বিষবৃক্ষে বিষফল ফলিল।

ফ্রান্সে আবার নূতন শাসনপ্রতিষ্ঠা হইল; পাঁচ জন লোক প্রজাতন্ত্রের নিয়ন্তা নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে ফরাসী রাজনীতি-গগনে নেপোলিয়নের আবির্ভাব। তাঁহার পিতা একজন ব্যবহারাজীব ছিলেন। নেপোলিয়ন ষোল বৎসর বয়সে সেনাদলে প্রবেশ করিয়া ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ইটালীয় সেনাবলের নায়কপদ প্রাপ্ত হয়েন। তখন সৈনিকদিগের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না; তাহাদের রসদ, অর্থ, পোষাক কিছুই ছিল না। কাযেই সেনাদল তখন অসন্তুষ্ট ও বিশৃঙ্খল। এ অবস্থায় নেপোলিয়ন ভয় পাইলেন না। তিনি সৈনিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তাহারা বিপন্ন—কিন্তু তিনি তাহাদিগকে যে সকল স্থানে লইয়া যাইবেন, সে সকল স্থানে তাহারা খ্যাতি, ধন ও আরাম পাইবে। এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেনাদল তাঁহার অনুগামী হইল। তিনি

অত্যল্পকালমধ্যে ইটালীর অধিকাংশভাগ জয় করিয়া সেগুলিতে প্রজাতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অষ্ট্রীয়ান সেনাপতিরা নেপোলিয়নের মত রণকুশল সেনাপতির সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেন না। অষ্ট্রীয়ানরা প্রথেম যেমন জয়লাভ করিয়াছিল—এখন তেমনই কেবল পরাজিত হইতে লাগিল।

শীতের শেষে বরফ গলিয়া পথ বাহির হইলেই নেপোলিয়ন আল্পস পর্ব্বত অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিলেন। এই সময় নেপোলিয়ন বিপন্ন হইয়া সন্ধিসংস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। তখন তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিনি যে সর্ত্তে সন্ধিসংস্থাপিত করিলেন, তাহাতে ফ্রান্সের সুবিধাই হইল। সন্ধিসর্ত্তে অষ্ট্রীয়া ভেনিস পাইলে তাহা লইয়া অষ্ট্রীয়ায় ও প্রাসিয়ায় মনোমালিন্য উদ্ভূত হইল। তাহাই নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় তৃতীয় ফ্রেডরিক উইলিয়ম অষ্ট্রীয়ার সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।

এই অবসরে ফরাসীরা সুইটজারলণ্ড আক্রমণ করিয়া তাহাকে এক স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র-শাসিত রাজ্যে পরিণত করিলে, ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে বাধা দূর হইয়া গেল। তথনও যুদ্ধের অবসান হইল না।

ফরাসীরা এত দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে পরাভূত করিতে পারে নাই। এখন ইংলণ্ডের বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য এবং ইংলণ্ডের এসিয়াস্থিত রাজ্য বিপন্ন করিবার জন্য নেপোলিয়ন একদল সৈনিক লইয়া মিশরযাত্রা করিলেন। তথায় স্থলে নেপোলিয়ন জয়লাভ করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু জলে ইংরাজ নৌবহরের সেনাপতি নেলসন ফরাসী নৌবহর বিনষ্ট করিলেন। নেপোলিয়নের মিশরে অবস্থানকালে সুইটজারলণ্ডেও ফরাসী সেনারা পরাভূত হইল। এ দিকে আত্মকলহে রাজ্যরক্ষকদিগের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন সেনাদল মিশরে

রাখিয়া ইংরাজদিগের অজ্ঞাতে ফ্রান্সে আসিয়া সেনাপরিচালনভার লইলেন। তিনি ও আর দুই জন কন্‌সল নিযুক্ত হইলেন। তখন ইংলণ্ড, রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইলেন।

নেপোলিয়নের শিক্ষাগুণে ফরাসী সেনা সর্ব্বত্র জয়ী হইতে লাগিল। অষ্ট্রীয়ানরা তাঁহার অভিযানের সংবাদ পাইতে না পাইতে নেপোলিয়ন সেনাদল লইয়া আল্পস্ পর্ব্বত পার হইয়া আসিলেন। তিনি একাধিক-যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ানদিগকে পরাভূত করিলে অষ্ট্রীয়াকে বাধ্য হইয়া সন্ধি সংস্থাপিত করিতে হইল। রাইন নদীর বামকূলে ফরাসীর অধিকার বিস্তার হইল—ইটালীতে,সুইটজারলণ্ডে ও হলাণ্ডে—ফরাসীরা যে সকল প্রজাতন্ত্রশাসনশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সে সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গৃহীত ও স্বীকৃত হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এই সব ঘটনা ঘটিল।

কন্‌সল হইয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সে সুশাসন-প্রবর্ত্তন করিয়া—সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া রাজ্যের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি করিতে—দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ক্ষত দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। ফরাসীবিপ্লবে দেশে খৃষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদ হইয়াছিল। নেপোলিয়ন পোপের সহিত মিলিত হইয়া আবার ধর্ম্মাচরণের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মমতের জন্য কাহারও কোন অসুবিধা রহিল না। দেশে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা হইল; ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাস্তা রচিত হইতে লাগিল—খাল কাটান হইতে লাগিল। এইরূপে নেপোলিয়ন দেশের জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করিলেন। দেশের লোক প্রজাতন্ত্রনায়কদিগের নৃশংস ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছিল, এখন তাহারা নেপোলিয়নের সুশাসনে সুখের ও শান্তির আস্বাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। আবার তাঁহার যুদ্ধজয়ে ফরাসীরা প্রীতিলাভ করিল। এইরূপে দিন দিন নেপোলিয়নের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও

তিনি "রাজা" উপাধি গ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না; কারণ, দেশের লোক সে উপাধি শুনিলে বিরক্ত হইত। শেষে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে তিনি ফরাসী প্রজাতন্ত্র-শাসন উচ্ছিন্ন করিয়া আপনাকে পুরুষানুক্রমে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার ভয়ে পোপ সপ্তম পায়াস বাধ্য হইয়া প্যারিসে আসিয়া তাঁহার অভিষেকোৎসব সম্পন্ন করিলেন। সার্লামেনের অভিষেকে যেরূপ উৎসব হইয়াছিল, নেপোলিয়নের অভিষেকে তেমনই উৎসব হইল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি স্বহস্ত-সংস্থাপিত ইটালীয়ান প্রজাতন্ত্র উৎপাটিত করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। তিনি সমগ্র য়ুরোপের সম্রাট হইয়া —সামন্তনৃপতিশিরোমণি হইবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। এমন কল্পনা আর কোন কালে কোন রাজা করেন নাই। ইহা য়ুরোপের মানচিত্রকার নেপোলিয়নেরই উপযুক্ত ছিল।

এই সময় তিনি হানোভার আক্রমণ করিলেন। নিরপেক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ হানোভার পাইবার আশায় প্রাসিয়া তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিলেন না! এ দিকে ইংলণ্ডের প্ররোচনায় অষ্ট্রীয়া, রুসিয়া ও সুইডেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইলেন। প্রাসিয়া সে সম্মিলনে যোগ দিলেন না—স্বদেশের অত্যাচার-নিবারণের কোন চেষ্টাই করিলেন না। প্রাসিয়ার এই কলঙ্ক কোন কালে মুছিবে না।

নেপোলিয়নও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অষ্ট্রীয়ান সেনাপতি তাঁহার আগমনে এমনই ভয় পাইলেন যে, তাঁহার ষাট হাজার সৈনিক থাকিলেও বিনাযুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিলেন। প্রসিদ্ধ সেনাপতি আর্চডিউক চার্লস তখন ইটালীতে। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই নেপোলিয়ন ভিয়ানায় প্রবেশ করিলেন। রুসিয়ার সম্রাট প্রথম আলেক্জাণ্ডার অষ্ট্রীয়ার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে, অষ্ট্রীয়ার সম্রাট অবশিষ্ট সেনা লইয়া

তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। উভয়েই স্বদেশের ও সমগ্র য়ুরোপের কল্যাণ-কামনায় তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবার জন্য প্রাসিয়াকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রাসিয়ার রাজা হানোভার প্রাপ্তির আশায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করিলেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে অষ্টারলিজের যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ করিলেন। তখন প্রাসিয়া নেপোলিয়নের সঙ্গে যোগ দিলেন। অপমানিত—বিপন্ন অষ্ট্রীয়া ভেনিস টাইরোল প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। বেভেরিয়া, বেডেন প্রভৃতি যে সকল স্থানের ডিউকরা নেপোলিয়নের সাহায্য করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ন তাঁহাদিগকে রাজপদে উন্নীত করিলেন। এইরূপে ষোল জন জার্ম্মাণ ভূস্বামী জার্ম্মাণপ্রাধান্য অস্বীকার করিয়া ফরাসী-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস জার্ম্মাণীর সম্রাট উপাধি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি আপনাকে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

এত দিনে প্রাসিয়ার চৈতন্যোদয় হইল। প্রাসিয়ানরা বুঝিতে পারিল, অষ্ট্রীয়ার সহিত যোগ না দিয়া তাহারা আপনাদেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এখন নেপোলিয়ন প্রাসিয়ার রাজ্যাংশ লইবার উদ্যোগ করিলেন। প্রাসিয়ার রাণী সর্ব্বাগ্রে এই বিপদের আশঙ্কা করিয়া রাজাকে তদনুরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। রাজা তখন সে কথা শুনেন নাই। এখন রাণীর কথায় ও রুসিয়ার সম্রাটের কথায় লজ্জায় ও ক্ষোভে চঞ্চল হইয়া তিনি যুদ্ধঘোষণা করিলেন। কিন্তু তখন আর প্রাসিয়ার সেনাদলে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের সময়ের সে-শৃঙ্খলা নাই। প্রাসিয়ানরা ও রুসিয়ানরা পুনঃপুনঃ পরাজিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন প্রাসিয়ার রাজধানী বার্লিনে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন ভিয়ানায় প্রবেশ

করিয়াছিলেন, তখন ভিয়ানার জনগণের ব্যবহারে ঘৃণা ও বিরক্তি সপ্রকাশ হইয়াছিল। বার্লিনের পদস্থ ব্যক্তিরা নেপোলিয়নের ভয়ে জনগণকে তাঁহার অভ্যর্থনায় উৎসাহিত করিলেন। লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সরকারী ধনভাণ্ডার দেখাইয়া দিতে লাগিল। তাহাদের নীচতা দেখিয়া নেপোলিয়ন বলিলেন, "আমি আমার সাফল্যে আনন্দিত হইব, না ইহাদের জন্ত লজ্জিত হইব?" রাণী যে তাঁহার বিরুদ্ধে রাজাকে অস্ত্রধারণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা নেপোলিয়ন জানিতেন। এখন তিনি রাণীকে অপমানিত করিলেন। তিনি ফ্রেডরিক দি গ্রেটের সমাধিতে যাইয়া তাঁহার বংশধরকে গালি দিলেন। একে একে প্রাসিয়ান দুর্গগুলি নেপোলিয়নের হস্তগত হইতে লাগিল। শেষে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে প্রাসিয়া সন্ধি করিলেন। প্রাসিয়ান রাজ্যের অর্দ্ধাংশ নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া আবার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন পাঁচ দিন পাঁচটি যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সেনাদলকে পরাভূত করিলেন। শেষে আর্চ ডিউক চার্লস নূতন সেনাসংগ্রহ করিয়া দুই দিনব্যাপী যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করিলেন। তাহার পূর্ব্বে নেপোলিয়ন আর কখনও যুদ্ধে পরাজিত হয়েন নাই। কিন্তু কয় মাস পরে অষ্ট্রীয়া আবার এক যুদ্ধে পরাভূত হইলে সন্ধিসংস্থাপিত হইল। এ সন্ধিতে অষ্ট্রীয়ার আরও ক্ষতি হইল।

এই সময় কৃষকসেনা লইয়া টাইরোলের লোক যেরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা কখন পর্ব্বতোপরি হইতে, কখন তৃণস্তূপের অন্তরাল হইতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া শত্রুসেনা ধ্বংস করিয়াছিল। এই যুদ্ধে দেশের রমণীরাও যেরূপে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল—সেরূপ দৃষ্টান্ত এক রাজপুতনার ইতিহাস ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না।

যখন সন্ধিসর্ত্তে অষ্ট্রীয়া টাইরোল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখনও তদ্দেশবাসীরা ফরাসীপ্রাধান্য স্বীকার করিল না। তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন নেপোলিয়ন বহু সৈন্য পাঠাইয়া এই বীর-জাতিকে পরাভূত করিলেন।

এই সময় নেপোলিয়নের সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্যগগনে উপনীত হইল। এক ইংলণ্ড ব্যতীত আর সকল দেশই তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত হইল। কেবল ইংলণ্ডের নৌ-বহর ফরাসী নৌ-বহরকে পরাভূত করিতে লাগিল। নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের অনিষ্টসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া ইংলণ্ডের পণ্যবিক্রয় বন্ধ করিলেন—ইংলণ্ডের বাণিজ্য বিনষ্ট করিবার জন্য য়ুরোপের সব দেশের বন্দরে ইংরাজের ব্যবসা বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। রুসিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁহার এই আদেশপালনে অসম্মত হইলেন। তাই নেপোলিয়ন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলেন। সে আয়োজন বিরাট। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি ছয় লক্ষ সৈনিক লইয়া রুসিয়ার রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে তিনি জার্ম্মাণীর রাজাদিগকে ড্রেসডেনে সম্মিলিত করিয়া এক বক্তৃতা দিলেন। তাহাতে তিনি যেরূপ ভাষায় যেরূপ ভাব ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে সমবেত নৃপতিবৃন্দ অপমানে ও ক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অষ্ট্রীয়ার সাম্রাজ্ঞী ও প্রাসিয়ার রাণী অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না—অনেকে ক্রোধে অধর দংশন করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের সৈনিকদিগের অধিকাংশই জার্ম্মাণ। আরও নানাজাতীয় সৈনিক লইয়া নেপোলিয়ন তাঁহার সেনাবল পুষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মাণদিগকে এমন ভাবে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা আপনাদের সংখ্যাধিক্য বুঝিতে পারে নাই। যাহাতে কোন বিপদ না ঘটে, তজ্জন্য নেপোলিয়ন ফরাসী সেনাপতিদিগকে প্রাসিয়ান দুর্গরক্ষার ভার দিয়া-

ছিলেন; যে সকল প্রাসিয়ান সৈনিক রুসিয়ায় গমন করিয়াছিল, তাহাদের নায়কত্বও ফরাসীরা করিয়াছিল। ষাট হাজার ফরাসী প্রাসিয়া রাজ্য দখল করিয়া বসিল আর জার্ম্মাণগণ বিজেতার আদেশে বিদেশে যুদ্ধ করিতে গেল। তখন প্রাসিয়া কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া পাপের পরিণাম বুঝিতে পারিল।

নেপোলিয়ন বিপুল বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে কেহ তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টাও করিল না। তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রুসিয়ানগণ ততই পশ্চাতে যাইতে লাগিল। নেপোলিয়ন রুসিয়ার জনশূন্য প্রান্তরে উপনীত হইলেন। শেষে দুই মাসের অধিককাল অগ্রসর হইয়া ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি যে স্থানে উপনীত হইলেন, তথা হইতে মস্কোনগরের সৌধচূড়া লক্ষিত হইতে লাগিল। রুসিয়ার সেই রাজধানীতে জনকোলাহল শ্রুত হইল না—কোথাও কোন শব্দ নাই! সহর হইতে কৌতূহলপূর্ণ নগরবাসীরা বিজেতার বিরাট বিজয়-বাহিনী দেখিতে আসিল না। কেহ পরাভব স্বীকার করিয়া বিজেতার পদপ্রান্তে সহরের প্রবেশদ্বারের চাবি রাখিতে আসিল না! নেপোলিয়নের আগমনের পূর্ব্বেই রুসিয়ানগণ সহর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

নেপোলিয়ন রুস-সম্রাটের প্রাসাদে জয়স্কন্দাবার সংস্থাপিত করিলেন। সহসা সহরের নানাস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শরতের বাত্যা অগ্নি ব্যাপ্ত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিশাল নগর অগ্নিশিখায়—তরঙ্গায়িত বহ্নিসাগরের মত দেখাইতে লাগিল। নেপোলিয়ন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিলেন না। প্রাসাদও দগ্ধ হইয়া গেল। রুসিয়ানরা ফরাসী-বাহিনীর বিনাশজন্য আপনাদের গৃহমধ্যে দাহ্যপদার্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা আপনাদের

রাজধানী নষ্ট করিয়াও ফরাসীদিগের সর্ব্বনাশ-সংসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মস্কো নগরকে বিরাট জতুগৃহে পরিণত করিয়াছিল। নেপোলিয়নের গর্ব্বই তাঁহার কাল হইল। তখন শীত সমাগত; তিনি শীতকালে শিবিরসংস্থাপনের জন্ত সেনাদলকে দক্ষিণে উর্ব্বর প্রদেশে না লইয়া মস্কোর ভস্মরাশিমধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; মনে করিলেন, রুস-সম্রাট বাধ্য হইয়া সন্ধিসংস্থাপন করিতে আসিবেন। শেষে শীতের বাতাস বহিতে লাগিল—তুষারপাত হইতে লাগিল। তখন তিনিই বাধ্য হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। রুস-সম্রাট কোন উত্তর দিলেন না। তখন রুসিয়ায় শীতকাল। গত বৎসর শীত তেমন প্রবল হয় নাই—এবার প্রবল হইল। দেশ বরফে ছাইয়া গেল, খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইল। নেপোলিয়ন দেখিলেন, এই শত্রু শীতঋতুর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইবার আশা নাই। তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। ভূমি তুষারাবৃত—দলে দলে অশ্ব প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল—খাদ্য নাই—রুসিয়ার কসাকদল সুযোগ পাইলেই সৈনিকদিগকে হত্যা করে। এই অবস্থায় সেনাদল প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। শীর্ণদেহ—ক্ষুধার্ত্ত—ভীষণদর্শন সৈনিকগণ ক্ষুধার তাড়নায় মৃত অশ্বের মাংসের জন্ত পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল—এক টুকরা রুটীর জন্ত পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া যে যে স্থানে পড়িতে লাগিল, সে সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। আবার রুসিয়ানগণ সুবিধা পাইলেই তাহাদিগের বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইতে লাগিল। শেষে—তাহারা যখন বেরেসিনায় উপনীত হইল, তখন বরফ গলিয়া নদীতে স্রোত বহিতেছে। এই সময় রুসিয়ানগণ উপস্থিত হইয়া শত্রুদলকে অগ্নিবর্ষণে—অস্ত্রাঘাতে বিপন্ন করিতে লাগিল। তখন নেপোলিয়নের সেনাদল কোনরূপে স্রোতের উপর সেতু নির্ম্মিত করিল। সকলেই

ব্যস্ত হইয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করায় পেষণে অনেকের মৃত্যু হইল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করায় সেতুর বৃতি ভাঙ্গিয়া গেল - বহু সৈনিক, বহু অশ্ব জলে পড়িয়া গেল। শেষে সেতু ভাঙ্গিয়া গেল। সেতুর উপর যাহারা ছিল, তাহারা সেই শীতল জলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনেকে শত্রুর হস্তে বন্দী হইল।

শেষে নেপোলিয়ন ৫ই ডিসেম্বর তারিখে গোপনে পলায়ন করিলেন। তাঁহার পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে সেনাদলে শৃঙ্খলার শেষ চিহ্নও মুছিয়া গেল -যে যাহার সুবিধা সন্ধান করিতে লাগিল। নেপোলিয়ন যে বিপুল বাহিনী লইয়া রুসিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার ছয় লক্ষ সৈনিকের মধ্যে ত্রিশ হাজারও দেশে ফিরিল না!

নেপোলিয়নকে বিপন্ন দেখিয়া সমগ্র য়ুরোপে এই সুযোগে তাঁহার প্রভুত্বনাশের চেষ্টা লক্ষিত হইল। সর্ব্বাগ্রে প্রাসিয়ার রাজা সেই চেষ্টা করিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি রুসিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইলেন। কিন্তু তখন বার্লিন ফরাসীদিগের হস্তগত। তবে পূর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিতে কৃতসঙ্কল্প প্রাসিয়ানগণ সরকারের জন্য ধনপ্রাণ দান করিতে উদ্যত হইল। দেশের অস্ত্রধারণক্ষম ব্যক্তি সকলেই সৈনিক হইল। যখন প্রাসিয়ার রাজা ও রুসিয়ার সম্রাট জার্ম্মাণদিগকে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান করিলেন, তখন সকলে সানন্দে ও সাগ্রহে সেই আহ্বানানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সমগ্র জার্ম্মাণীতে সৈনিকপদশব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সংবাদ শুনিয়া নেপোলিয়ন বলিলেন, "হোঃ—জার্ম্মাণরা স্পেনিয়ার্ডদিগের মত যুদ্ধ করিতে পারে না।" সেনাসংগ্রহে ও সেনাপরিচালনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি আবার তিন লক্ষ

সৈনিক সংগ্রহ করিলেন। তখন আবার জার্ম্মাণীর কোন কোন ভূস্বামী তাঁহার পক্ষই অবলম্বন করিলেন। অষ্ট্রীয়া তখন রক্তপাতে এমনই দুর্ব্বল যে, প্রাসিয়ার সাহায্য করিয়া শত্রুসংহারে সহায়তা করিতে অক্ষম। কিন্তু যে পাপের পথে বিচরণ করিয়াছে সে সহসা পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যপথের পথিক হইলে যেমন সাগ্রহে সে পথে অগ্রসর হয়, জার্ম্মাণগণ তেমনই সাগ্রহে স্বদেশের উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সমগ্র দেশ নবীন উৎসাহে উৎসাহিত, নবীন আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নবীন শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া দেশের শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সমগ্র দেশ একটি বিরাট স্কন্ধাবারে পরিণত হইল। অজাতশ্মশ্রু বালক ও পলিতকেশ বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী ও ভূস্বামী সকলেই অস্ত্রধারণ করিতে লাগিল। এমন কি যুবতীরাও পুরুষের ছদ্মবেশে সেনাদলে যোগ দিতে লাগিল। যে সেনাদলে যোগ দিতে পারিল না, সে আপনার অর্থ দিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে না হইতে নেপোলিয়ন স্যাকসনীতে অবতীর্ণ হইলেন। রুসসেনা প্রাসিয়ান সেনার সহিত সম্মিলিত হইল। কিন্তু দুইটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধে সম্মিলিত সেনা নেপোলিয়নের নিকট পরাভূত হইল।

তখন অষ্ট্রীয়ার সম্রাট মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইতে চাহিলেন। তিনি তাঁহার মন্ত্রী কাউণ্ট মেটারনিককে নেপেলিয়নের নিকট পাঠাইলে নেপোলিয়ন বলিলেন, "বটে! তুমি মধ্যস্থতা করিতে আসিয়াছ? যদি তাহাই হয়, তবে তুমি আমার বিপক্ষ।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, মেটারনিক, বল দেখি, এই কাযের জন্ত ইংলণ্ড তোমাকে কত টাকা ঘুস দিয়াছে?" মেটারনিক নত হইয়া টুপী তুলেন কি না দেখিবার জন্ত তিনি আপনার টুপীটি মেজের ফেলিয়া দিলেন। মেটারনিক নত হইয়া টুপী তুলিলেন না। নেপোলিয়ন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের যুদ্ধঘোষণা হইয়া গেল। প্রাসিয়ার ও রুসিয়ার সেনাদল বোহিমিয়ায় প্রবেশ করিল—তথায় অষ্ট্রীয়ার সম্রাট স্বয়ং সেনাদল লইয়া তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

২৩শে আগষ্ট তারিখে দুই দলে একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। অশিক্ষিত জার্ম্মাণ কৃষকগণ বহু ফরাসী সৈনিককে হত ও আহত করিল। অনেকে বন্দীও হইল। তিন দিন পরে ব্লুচারও এক দল ফরাসীসেনা বিনষ্ট করেন। ফরাসী সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ড একাকী পলাইয়া যাইয়া ড্রেসডেনে নেপোলিয়নকে সংবাদ দিলেন, সেনাবল বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সেই দিনই নেপোলিয়ন সম্মিলিত সেনাদিগকে পরাজিত করেন। জার্ম্মাণীতে নেপোলিয়ন আর কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই।

চারিদিকে পরাভূত হইয়া নেপোলিয়নের সেনাপতিরা ড্রেসডেনে সমাগত হইতে লাগিলেন। তথায় বেভেরিয়ার সৈনিকগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বনে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার শত্রুপক্ষে যোগ দিল ও তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনপথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সংবাদে তাঁহার সেনাদলস্থ জার্ম্মাণগণ অসন্তুষ্ট হইল এবং তিনি বার্লিন আক্রমণের আদেশ দিলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এইবার নেপোলিয়নের মনে আশঙ্কার সঞ্চার হইল,—তিনি ভবিষৎ ভাবিয়া ভীত হইলেন। কয় দিন তিনি বিমর্ষ রহিলেন; তাহার পর আবার সোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬ই অক্টোবর লিপজিকের যুদ্ধ আরব্ধ হইল। এমন দীর্ঘকালব্যাপী—ভীষণ যুদ্ধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তিন দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল। নেপোলিয়নের সৈনিকসংখ্যা দুই লক্ষ, সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘের সৈনিকসংখ্যা তিন লক্ষ। লিপজিকে দুইটি বড় নদীর সঙ্গমস্থল—তথায় আরও দুইটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী মিলিত হইয়া একটি নদীতে পরিণতিলাভ

করিয়াছে। এই স্থানে জার্ম্মাণীর স্বাধীনতাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। এক পক্ষে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট, রুসিয়ার সম্রাট, প্রাসিয়ার রাজা; অপরপক্ষে স্যাকসনীর রাজা ও নেপ্‌লসের রাজা নেপোলিয়নের সহযাত্রী। সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সেনাসজ্জা করিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রভাতে অজস্র কামান-ধ্বনিতে যুদ্ধঘোষণা হইল—যুদ্ধক্ষেত্র ধূমাচ্ছন্ন হইল। এক দিকে নেপোলিয়নের জয় সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হইয়া আসিল। তাঁহার আদেশে তাঁহার জয়ঘোষণা করিয়া গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজান হইতে লাগিল—তাঁহার জয়বার্ত্তা দিয়া প্যারিসে দূত প্রেরিত হইল। এমন সময় নাটকোচিত বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল—নূতন রুসসেনা সমাগত হইয়া ফরাসী সৈনিকদিগের গতিরোধ করিল। শিলাসঙ্কুল তটে আহত সাগরোর্ম্মির মত ফরাসীসেনা দলভঙ্গ হইয়া পড়িল। সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘের সৈনিকগণ সেই অবসরে আবার অগ্রসর হইল। এক স্থানে উচ্চ মৃৎস্তূপে দাঁড়াইয়া নেপোলিয়ন, আর এক স্থানে মৃৎস্তূপে দাঁড়াইয়া অষ্ট্রীয়ার সম্রাট—রুসিয়ার সম্রাট ও প্রাসিয়ার রাজা যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে রণক্ষেত্র আবৃত হইলে যখন যুদ্ধ বন্ধ হইল, তখন রণক্ষেত্রে সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘই বলবান। পরদিন দিবালোক ফুটিতে না ফুটিতে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ন কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতির প্রার্থনা করিলেন। সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বলক্ষয়ে ফরাসীরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া নেপোলিয়ন প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন পলায়নের একটিমাত্র পথ আছে। রাত্রির অন্ধকারে নেপোলিয়ন লিপজিক সহরে সেনাদল সংগৃহীত করিয়া পরদিন পলায়নের পথচিন্তা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতেই সহরে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। এক পথে সম্মিলিত শক্তি

সজ্ঞ সানন্দে সহরে প্রবেশ করিলেন,আর এক পথে নিরানন্দ—পরাজিত ফরাসীসেনা লইয়া বীরবর নেপোলিয়ন সহর ত্যাগ করিলেন। নেপোলিয়নের সেনাপতিদিগের প্রাণান্ত চেষ্টায় তাঁহার পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হইল। এই ভীষণ যুদ্ধে ফরাসীদিগের আটাত্তর হাজার সৈনিক হত, আহত ও বন্দী হইয়াছিল। চক্রনেমীর এক আবর্ত্তনে নেপোলিয়নের সৌভাগ্যোদয়, আর এক আবর্ত্তনে তাঁহার দর্পচূর্ণ। এই যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণী ফরাসীর অধিকারমুক্ত হইল। জার্ম্মাণীতে আনন্দের স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তখন বিজয়ী নৃপতিরা সমবেত হইয়া সন্ধির সর্ত্ত স্থির করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন—রাইন নদী,আল্পস পর্ব্বত, পীরেনিজপর্ব্বত ও সমুদ্র ফ্রান্সের সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এ প্রস্তাবে নেপোলিয়ন সম্মত হইলেন না। কাযেই আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। ব্লুচার কয়টি যুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাজিত করিলে আবার সন্ধির প্রস্তাব করা হইল। নেপোলিয়ন সে প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না। আবার যেন তাঁহার সৌভাগ্যোদয়স্থচনা লক্ষিত হইল। তিনি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শত্রু সেনাদলকে পরাজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার শত্রুদল সম্মিলিত হইয়া প্যারিসে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সম্রাট নেপোলিয়নকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ষোড়শ লুইর ভ্রাতাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নেপোলিয়ন আপনার সম্মান রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। তিনি মুকুট ত্যাগে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। কেবল তাঁহার সম্রাট উপাধিও এলবা দ্বীপে আধিপত্য রহিল। জার্ম্মাণী যে অসাধারণ ক্ষতি সহ্য করিয়াছিল, তাহার জন্য ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থাই হইল না। জার্ম্মাণ রাজ্যগুলির ব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য ভিয়ানায় সভা হইবে স্থির হইল। প্যারিস হইতে প্রাসিয়ার রাজা, রুসিয়ার

সম্রাট ও বিজয়ী সেনাপতিরা ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা সম্মানিত হইলেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে য়ুরোপের নৃপতিবৃন্দ, তাঁহাদের মন্ত্রীরা ও সেনাপতিরা ভিয়ানায় সমবেত হইলেন। তখন পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা আত্মপ্রকাশ করিল। টালেরাণ্ডও তথায় ছিলেন। তিনি না পারিতেন এমন কায ছিল না। তিনি সমবেত নৃপতি-সমাজকে কুপরামর্শ দিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিরোধের সৃষ্টিও হইল। এলবা দ্বীপে নেপোলিয়ন সে সংবাদ পাইলেন। তিনি এইরূপ সুযোগের অপেক্ষাই করিতেছিলেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে অতর্কিত ভাবে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে উপনীত হইলেন। ফরাসীরা সানন্দে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। যে সব সৈনিক তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারাই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। ২০শে তারিখে নেপোলিয়ন প্যারিসে প্রবেশ করিলেন। সেনাদল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রাজা লুই নেদারল্যাণ্ডসে পলায়ন করিলেন। তখনও নৃপতিগণ ভিয়ানায়। এই আকস্মিক বিপৎপাতে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা ঈর্ষ্যা ভুলিয়া আবার নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সমবেত হইলেন। নেপোলিয়ন তাঁহাদিগকে উৎকোচদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রয়াস হইলেন। তাঁহারা নেপোলিয়নকে পরাভূত করিবার জন্য দশ লক্ষাধিক সৈনিক-সংগ্রহে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু ফরাসীরা নেপোলিয়নের পক্ষাবলম্বী রহিল। ইংরাজ সেনা লইয়া ডিউক অব ওয়েলিংটন ও প্রাসিয়ান সেনা লইয়া ব্লুচার সীমান্ত অতিক্রম করিতেছেন,এই সংবাদ পাইয়া নেপোলিয়ন ১ লক্ষ ৫০ হাজার সৈনিক লইয়া বেলজিয়মে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১৬ই জুন তিনি ব্লুচারকে পরাভূত করিলেন ; ৩৫ হাজার ফরাসী সৈনিক

প্রত্যাবর্ত্তনপর প্রাসিয়ানদিগকে আক্রমণ করিয়া চলিল। সেই দিনই ফরাসী সেনাপতি নে ইংরাজদিগের নিকট পরাজিত হইলেন। ওয়েলিং-টন তখন ওয়াটারলুর নিকট নেপোলিয়নের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৮ই তারিখে মধ্যাহ্নে ইংরাজ দিগের সহিত নেপোলিয়ানের যুদ্ধ আরব্ধ হইল। ৮টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। ফরাসী সেনাদলের সর্ব্বনাশ হইল। প্রাসিয়ান সৈন্য লইয়া ব্লুচার যুদ্ধের সময় আসিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। তিনি শেষে আসিয়া পলায়মান ফরাসী-দিগের অনুসরণ করিয়া ইংরাজদিগের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। ফরাসী সেনাদল আর যুদ্ধ করিতে পারিল না। নেপোলিয়ন প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার রাজপদ ত্যাগ করিলেন। তিনি আমে-রিকায় পলাইবার চেষ্টা করিয়া বিফলযত্ন হইয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

তখন য়ুরোপের নৃপতিগণ সমবেত হইয়া স্থির করিলেন, তাঁহাকে সেণ্টহেলানা দ্বীপে বন্দী করিয়া রাখা হইবে। তাঁহার রক্ষার ভার ইংরাজ গ্রহণ করিবেন। যিনি অসামান্য প্রতিভাবলে সমগ্র য়ুরোপ পদানত করিয়া একচ্ছত্রাধীন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন—তাঁহার এই শোচনীয় পরিণাম নিতান্তই দুঃখের কারণ। এমন দুর্ভাগ্য আর কাহার? সেণ্টহেলেনায় বন্দী থাকিয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে নেপোলিয়ন প্রাণত্যাগ করেন। তিনি প্রলয়-ঝটিকার মত য়ুরোপের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের পরাভবের পর নৃপতিবৃন্দ আবার প্যারিসে প্রবেশ করিলেন। লুই আবার প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এবার জার্ম্মাণীর হস্তচ্যুত রাজ্যাংশের কিয়দ্ভাগ জার্ম্মাণীকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল—ফ্রান্সকে

ক্ষতিপূরণরূপে প্রচুর অর্থ দিতেও বাধ্য করা হইল। এ দিকে অষ্ট্রীয়া যে সকল রাজ্যাংশ হারাইয়াছিলেন তাহার কতকাংশ পাইয়া সমৃদ্ধ হইলেন। কিন্তু প্রাচীন জার্ম্মাণসাম্রাজ্য আর গঠিত হইল না। এবার ৩৯টি রাজ্য লইয়া জার্ম্মাণ সম্মিলিত রাজ্য গঠিত হইল। এই সকল রাজ্যের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া ফ্রাঙ্কফোর্টে একটি পার্লামেণ্টও সংস্থাপিত হইল। এইরূপে জার্ম্মাণীতে আবার পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল।

নেপোলিয়নের পরাভবের পর য়ুরোপে শান্তি সংস্থাপিত হইলে রাজাপ্রজার সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ফরাসী-বিপ্লবে য়ুরোপে নূতন ভাবের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। কেহ সে ভাব-স্রোতঃ রুদ্ধ করিতে পারিল না। দীর্ঘ ৩০বৎসরব্যাপী যে যুদ্ধের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে প্রজার অধিকার অধিক ছিল। প্রত্যেক খণ্ডরাজ্যে প্রজাপুঞ্জ স্বায়ত্ত-শাসন সম্ভোগ করিত। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে সে সব নিয়ম নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল। তখন হইতে রাজারা আর প্রজার মত লইয়া কার্য্য করিতেন না—স্বেচ্ছায় শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতেন, যুদ্ধঘোষণা করিতেন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতেন, রাজস্ব আদায় করিতেন। কিন্তু ফ্রান্স যে স্বাধীনতার জন্য রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল, এখন লোক সেই স্বাধীনতার স্বাদ পাইতে ব্যস্ত হইল। প্রজারা স্বাধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইল। কিন্তু শাসকগণ স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া প্রজাদিগের অধিকারবৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না।

এ দিকে রুসিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডার, অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস ও প্রাসিয়ার রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়ম পরস্পরকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া এক নূতন সন্ধিতে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা প্রজাদিগকে

পুত্রবৎ শাসন করিবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পিতার কর্ত্তব্যের যে ধারণা লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই ধারণাই ভ্রান্ত। তাঁহারা প্রজাদিগকে শিশুর মত ভাবিয়া তাহাদিগকে কোনরূপ স্বাধীনতা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। ভিয়ানার সম্মিলনে সকল রাজাই প্রজাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক পার্লামেণ্ট দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে কেহই সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন না। লোক অসন্তুষ্ট হইল। জ্ঞানকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অসন্তোষ প্রবল হইয়া উঠিল। বিদ্যার্থীরা সভা করিয়া—সমিতি সংগঠিত করিয়া, নূতন আদর্শের প্রচার করিতে লাগিল। শেষে ভয় পাইয়া রাজারা সমিতি বন্ধ করিতে লাগিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পুলিসের দৃষ্টি পড়িল, বিদ্যার্থীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতে লাগিল। অসন্তোষও দমিত না হইয়া বিস্তার লাভ করিতে লাগিল।

কিন্তু দেশের লোক কেবল যে পার্লামেণ্ট অর্থাৎ স্বায়ত্ত-শাসনই চাহিল এমন নহে। তাহারা প্রকাশ্যভাবে জুরীর সাহায্যে বিচারের দাবীও করিতে লাগিল। তখন বিচারের ব্যবস্থা ভাল ছিল না। সবই গোপনে হইত—পক্ষপাতও যে হইত না এমন নহে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ড্রেসডেনে একজন শিল্পী খুন হইলে, পুলিস এক জন নিরপরাধ লোককে ধরিয়া এমন নির্ম্মম ভাবে নির্য্যাতিত করে যে, সে আপনাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করে। শেষে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পালনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেখা যায়, সে দোষী নহে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এক জন সূত্রধর তাহার শিক্ষানবিশ কর্ত্তৃক স্ত্রীহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ৯বৎসর কারাগারে বদ্ধ থাকে। তাহার পর প্রমাণিত হয়, অভিযোক্তাই অপরাধী—অভিযুক্ত নিরপরাধ! এই সব ব্যাপারে দেশের লোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—প্রতীকারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল।

আরও এক কারণে দেশে অসন্তোষ-বিস্তার হইতেছিল। দেশে এক জন রাজকর্ম্মচারীর আদেশ ব্যতীত কোন পুস্তক বা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে পারিত না। ফলে লোক লুকাইয়া পুস্তক ও পত্র প্রচারিত করিত। কিন্তু তাহাতে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

দেশে অসন্তোষ-বিস্তারে শঙ্কিত হইয়া কোন কোন খণ্ডরাজ্যের অধীশ্বর প্রজাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে আবার বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া প্রজারা লুই ফিলিপকে রাজা করিল। জার্ম্মাণীতেও লোক স্বাধীনতার জন্য ও সংস্কারের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা আর শিশুর মত শাসনাধীন থাকিতে অসম্মত হইল। কিন্তু তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিপ্লব উৎপাদিত করিতে না পারায়, সামান্য সামান্য অধিকার মাত্র পাইল। অষ্ট্রীয়া ও প্রাসিয়া প্রজাদিগকে কোন অধিকারই দিলেন না।

এই সময় প্রবর্ত্তিত একটি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। এই সময় জুলভেরিণ বা শুল্কসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে কোনও খণ্ড রাজ্যের পণ্য অন্য খণ্ডরাজ্যে লইতে হইলেই শুল্ক দিতে হইত। সেই শুল্কের দায় এড়াইবার জন্য লোক খুব গোপনে পণ্য পাঠাইত, আর তাহা ধরিবার জন্য সব রাজ্যে বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী রাখিতে হইত। ফলে সব দেশেরই ক্ষতি হইত—পণ্যও অধিক উৎপন্ন হইত না। সেই জন্য বহু জার্ম্মাণ রাজ্য প্রাসিয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়া শুল্কসঙ্ঘ সংস্থাপিত করেন। অষ্ট্রীয়া ও কয়টি রাজ্য এই সঙ্ঘে যোগ দেন নাই।

এ দিকে লুই ফিলিপ ফরাসীদেশের রাজা হইয়া নিয়মবদ্ধ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতিপালন-পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি

দেখিলেন, চক্রনেমীর অতর্কিত আবর্ত্তনে তিনি যেমন সৌভাগ্যচূড়ায় উঠিয়াছেন, তেমনই আর এক আবর্ত্তনে তাঁহার অধঃপতন হইতে পারে। তাই তিনি সুদিনে দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। সুতরাং তিনি দেশহিতে লক্ষ্য না রাখিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। নিয়মবদ্ধ শাসনপ্রণালী তাঁহার সে চেষ্টার অন্তরায় হয় দেখিয়া, তিনি যথেচ্ছ শাসনই করিতে লাগিলেন। দেশের লোক বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহঘোষণা করিল। লুই বিপদ গণিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। ফরাসীরা আবার প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রতিষ্ঠা করিল। প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইলেন—লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ইহাঁর পরিচয় পাঠকদিগকে দিতে হইবে। বীরবর নেপোলিয়ন ব্যবহারাজীবের পুত্র ছিলেন। কিন্তু সম্রাট হইয়া তিনি আপনার পূর্ব্বাবস্থার "কলঙ্ক" প্রক্ষালিত করিবার দুরাশায় যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কলঙ্ক তাঁহার চরিত্র হইতে কোন কালে প্রক্ষালিত হইবে না। তিনি পত্নী জোসেফাইনকে ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের দুহিতাকে বিবাহ করেন। সম্রাট ভয়ে তাঁহাকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে নেপোলিয়নের এক পুত্র জন্মে। ওয়াটারলুর যুদ্ধে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও নেপোলিয়ন এই পুত্রকে দ্বিতীয় নেপোলিয়ন বলিয়া ঘোষণা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ক্ষয়রোগে একবিংশ বর্ষ বয়সে তাঁহার পুত্রের প্রাণান্ত হয়। নেপোলিয়ন তাঁহার ভ্রাতা লুইকে হলাণ্ডের রাজা করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট লুই তাঁহারই পুত্র। প্রেসিডেণ্ট হইয়া তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সমিতির উচ্ছেদ সাধিত করেন এবং ঠিক এক বৎসর পরে আপনাকে তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে সম্রাট বলিয়া ঘোষিত করেন। যেন বীরবর নেপো-

লিয়নের পর তদীয় পুত্র দ্বিতীয় নেপোলিয়নই সম্রাট ছিলেন—লুই তাঁহারই পরবর্ত্তী।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়, তাহার ফলে সমগ্র য়ুরোপের শাসননীতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। জার্ম্মাণগণ এই সময় চারিটি অধিকার প্রার্থনা করে—

(১) বক্তৃতার ও রচনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; দেশের সরকারের কার্য্য প্রজারা অবাধে আলোচনা করিতে পারিবে—তাহাদিগের বক্তৃতা বা প্রবন্ধ কেহ বন্ধ করিতে বা সেজন্য কেহ তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতে পারিবে না।

(২) সার্ব্বজনীন সৈনিকবৃত্তি। দেশের সব লোক অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে এবং রাজনীতিক বা অন্য উদ্দেশ্যে যে স্থানে ইচ্ছা সমবেত হইতে পারিবে।

(৩) জুরীর বিচার ও প্রকাশ্য বিচারালয়ে বিচার।

(৪) রাজ্যসংস্কার।

লুই ফিলিপের পরিণামচিন্তায় শঙ্কিত বহু নৃপতি প্রজাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু এবারও প্রাসিয়ার রাজা ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে অসম্মত হইলেন। প্রজারা বিদ্রোহী হইল। ভিয়ানায় ও বার্লিনে সেনাদল অস্ত্রাঘাতে প্রজাদিগকে পরাজিত করিল। প্রজারা পরাজিত হইল—কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পরাজয়ই প্রকৃত জয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। শেষে অষ্ট্রীয়ায় ও প্রাসিয়ায় নিয়মবদ্ধ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল।

জার্ম্মাণীর প্রজারা পার্লামেন্টের অধিবেশনে দেশের শাসন-নিয়ম পুনর্গঠিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। ছয় শত প্রতিনিধি সম্মিলিত হইলেন। নানা তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, সমগ্র জার্ম্মাণীর জন্য

এক প্রকার আইন রচিত হইবে—জার্ম্মাণী এক সম্মিলিত সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে। প্রাসিয়ার রাজ্যে চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়ম সম্রাট নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি এ সম্মান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "জার্ম্মাণীতে বহু রাজা অবস্থিত, আমি তাঁহাদিগের অন্যতম।"

ইহার পর দেশে আবার বিদ্রোহ দেখা দিল। কৃষককুল বিদ্রোহী হইয়া যে যাহা ইচ্ছা চাহিতে লাগিল। ছাত্রগণ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা চাহিল; কৃষকগণ বলিতে লাগিল, ইহুদী মহাজনরা তাহাদিগকে ঋণ দান করিয়া যে সব খত লইয়াছে সে সব বিনষ্ট করা হউক। বহু কষ্টে বিদ্রোহ বিনষ্ট করা হইল। কিন্তু এই বিদ্রোহে প্রজার অনেক অধিকার লাভ হইয়া গেল। প্রজারা যে একতার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল—সে একতার সময় তখনও আইসে নাই।

ডেনমার্ক রাজ্যের দুইভাগে বহু জার্ম্মাণের বাস ছিল। তাহাদের সহিত ডেনদিগের মধ্যে মধ্যে বিরোধ হইত এবং তাহারা প্রাসিয়ার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিত। শেষে ডেনমার্কের রাজা ফ্রেডরিক অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে উত্তরাধিকারের সূত্র ধরিয়া প্রাসিয়ার রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ডেনমার্ক রাজ্যের দুই ভাগ প্রাপ্তি প্রাসিয়ার অভিপ্রেত ছিল। ডেনগণ তাহাতে সম্মত হইবে কেন? এ বিষয়ে অষ্ট্রীয়া প্রাসিয়ার সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুই দেশের রাজা প্রবল বলে ডেনমার্ক আক্রমণ করিলেন। ডেনরা যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু বিপক্ষগণের সঙ্গে না পারিয়া শেষে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা পরাভব স্বীকার করিল। তাহার পর প্রাসিয়া যখন ডেনমার্কের দুই অংশ আত্মসাৎ করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন অষ্ট্রীয়া তাহাতে অসম্মত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার ইটালী প্রাসিয়ার পক্ষাবলম্বন করিলেন। অষ্ট্রীয়ানরা ইটালীর সেনাদলকে পরাভূত করিল। কিন্তু

প্রাসিয়ানগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া ভিয়ানায় প্রবেশোদ্যোগ করিল। এই যুদ্ধে দুই কারণে অষ্ট্রীয়ানদিগের পরাজয় হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাহাদিগের সেনাপতিরা সেনাচালনে সুদক্ষ ছিলেন না—দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগের কামান ও বন্দুক ভাল ছিল না। প্রাসিয়ানগণ টোটার বন্দুক ব্যবহার করাতে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এই সময় হইতেই প্রাসিয়ানগণ যুদ্ধাস্ত্রের উন্নতিসাধনে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল; বর্ত্তমান যুদ্ধে সেই চেষ্টার ফল দেখা গিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে জার্ম্মাণদিগের এই কার্য্যে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের মনে শঙ্কার উদয় হওয়া ত পরের কথা, অনেকেই জার্ম্মাণী হইতে অস্ত্র আনয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

শেষে ২৩শে আগষ্ট তারিখে যে সন্ধি হইল, তাহাতে জার্ম্মাণীতে প্রাসিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইটালী অষ্ট্রীয়ার নিকট হইতে ভেনিস পাইলেন। সমগ্র জার্ম্মাণীতে প্রাসিয়ার প্রবল প্রতাপের প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। সুতরাং সমগ্র জার্ম্মাণীকে এক করিয়া এক নূতন সাম্রাজ্যগঠনের সুযোগ উপস্থিত হইল।

এই সময় আর একদিকে প্রলয়ঝঞ্ঝা দেখা দিল। স্পেনের সিংহাসন লইয়া গোল বাধিল। স্পেনের রাণী ইসাবেলার উচ্ছৃঙ্খলতাহেতু জনসাধারণ বিরক্ত হইয়া উঠে। শেষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা বিদ্রোহী হয় ও ইসাবেলা ফ্রান্সে পলায়ন করেন। তখন বিদ্রোহিনেতৃগণ কাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। বুরবনবংশের কাহাকেও রাজা করা দেশের লোকের অভিপ্রেত ছিল না। এক দল এমন প্রস্তাবও করেন যে, পর্ত্তুগালের রাজাকে স্পেনের রাজা করিয়া উভয় দেশ এক রাজ্যে পরিণত করা হউক। কিন্তু পর্ত্তুগালরাজ সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। শেষে সকলে

স্থির করিলেন, প্রাসিয়ার রাজবংশোদ্ভূত প্রিন্স লিওপোল্ডকে রাজা করা হউক। লিওপোল্ড প্রাসিয়ার প্রজা, তাই তিনি এ বিষয়ে প্রাসিয়ার রাজা উইলিয়মের সম্মতি লইলেন। স্পেনের লোক এই ব্যবস্থা করিল। কিন্তু ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করিলেন, প্রাসিয়ার প্রভাববিস্তারকল্পে বিসমার্ক এই কায করিতেছেন। বিসমার্ক প্রাসিয়ার মন্ত্রী। তাঁহাকে উনবিংশ শতাব্দীর চাণক্য বলিলে হয়। তাঁহার মত বুদ্ধিমান লোক য়ুরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে বহুদিন লক্ষিত হয় নাই। ফরাসীরাজ মনে করিলেন, তিনিই জার্ম্মাণ বংশোদ্ভূত লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইয়া প্রাসিয়ার প্রভাব বর্দ্ধিত করিতেছেন। শেষে এমনই দাঁড়াইল যে, নেপোলিয়নকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লিওপোল্ডও স্পেনের সিংহাসন লইতে অস্বীকৃত হইলেন। নেপোলিয়ন তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি প্রস্তাব করিলেন, ভবিষ্যতে কোন হোহেনজোলার্ণকে স্পেনের রাজা করিবার কথা হইলে, উইলিয়ম সে প্রস্তাবের বিরোধী হইবেন। তিনি দেখিলেন, দেশের লোক তাঁহার ব্যবহারে যেরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যুদ্ধঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে তাঁহার আর মুক্তি নাই। সেই জন্যই তিনি এমন অসম্ভব প্রস্তাব করিলেন। উইলিয়ম এ প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফ্রান্সের সহিত প্রাসিয়ার যুদ্ধঘোষণা হইল।

উইলিয়ম তখন এমসে বিশ্রাম সুখলাভ করিতেছেন; তাঁহার প্রধান মন্ত্রীরাও রাজধানীতে নাই। উইলিয়ম যুদ্ধ অনিবার্য্য দেখিয়া দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রীদিগকে সমবেত করিলেন। তখন জার্ম্মাণীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ভাগের প্রতিনিধিরা উইলিয়মের পক্ষাবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন। নেপোলিয়ন মনে করিয়াছিলেন

দক্ষিণ জার্ম্মাণী নিরপেক্ষ রহিবে। তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইল। উত্তর জার্ম্মাণীর যত সৈনিক ছিল, তাঁহার তত সৈনিকও ছিল না। সুতরাং সম্মিলিত জার্ম্মাণীর সৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইবার কোন আশাই তাঁহার রহিল না।

প্যাছে ফরাসীরা জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করে, এই ভয়ে জার্ম্মাণগণ যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াই সৈনিকসমাবেশ করিল। ফরাসীরা যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধঘোষণা করিয়া তাহারা রসদ, সরঞ্জাম সব সংগ্রহ করিতে লাগিল। এ দিকে জার্ম্মাণগণ সম্পূর্ণ সসজ্জ হইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। জার্ম্মাণ পক্ষে বুদ্ধির শৌর্য্যবীর্য্যের ও উৎসাহের যেরূপ সম্মিলন হইয়াছিল. সেরূপ সম্মিলন সচরাচর ঘটে না। রাজা উইলিয়ম স্বয়ং উৎসাহী, যুবরাজ বীর, সমর-সচিব মলকের রণকৌশল বিস্ময়কর, মন্ত্রী বিসমার্ক বুদ্ধিতে অপরা-জেয়। সমরে ফরাসীদিগের কেবলই পরাজয় হইতে লাগিল। শেষে সিডানে নেপোলিয়ন এমন অবস্থায় শত্রুদলবেষ্টিত হইলেন যে, তাঁহার আর প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় রহিল না। শত্রুর পাঁচ শত কামান ফরাসী-সেনার উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন উপায়ান্তরবিহীন নেপোলিয়ন শ্বেত পতাকা উড্ডীন করিয়া যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি উইলিয়মকে সংবাদ দিলেন, তিনি যখন রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন নাই—তখন তিনি (পরাজয় স্বীকার করিয়া) উই-লিয়মকে স্বীয় তরবারি প্রদান করিতেছেন। ইহা পরাভবের চিহ্ন। উই-লিয়ম সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ফরাসী সেনার আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করিবার জন্য বিসমার্ককে পাঠাইয়া দিলেন। এক দরিদ্র তন্তুবায়ের গৃহে বিসমার্কের সহিত নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু সন্ধির কোন কথাই নেপোলিয়ন শেষ করিতে পারিলেন না। তাহার পর জয়ী

উইলিয়মের সহিত পরাজিত নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ হইল। স্থির হইল, ফরাসী সেনা বন্দী বলিয়া শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিবে। যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারী এই যুদ্ধে জার্ম্মাণদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইবেন, তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হইবে। অস্ত্রশস্ত্র ও পতাকাগুলি জার্ম্মাণরা পাইবেন। এইরূপে ৫০ জন সেনাপতি, ৫ হাজার সৈনিক কর্ম্মচারী ও ৮৩ হাজার সৈনিক জার্ম্মাণদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। জার্ম্মাণগণ ৫ শত ৫৮টি কামান ও ৬ হাজার অশ্বও পাইল। তাহার পূর্ব্বে জার্ম্মাণগণ ২৮ হাজার লোককে বন্দী করিয়াছিল। ১৪ হাজার আহত সৈনিক তখন সিডানে রহিয়াছে। ৩ হাজার সৈনিক পলায়ন করিয়াছিল। তাহাদিগকেও নিরস্ত্র করা হইল। এইরূপে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার সৈনিক লইয়া ফরাসীরাজ জার্ম্মাণদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এই যুদ্ধে ঘটনাস্রোতঃ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। ৪ঠা আগষ্ট জার্ম্মাণসেনা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে—১লা সেপ্টেম্বর সিডানের যুদ্ধ শেষ হয়। ২রা আগষ্ট তারিখে নেপোলিয়ন প্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন—প্রথম কামানধ্বনি ধ্বনিত হয়—২রা সেপ্টেম্বর তিনি জার্ম্মাণদিগের বন্দী হয়েন।

এ দিকে নেপোলিয়নের পরাভবসংবাদে প্যারিসে বিদ্রোহ ঘোষিত হয় ও আবার প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রতিষ্ঠা হয় (৪ঠা সেপ্টেম্বর)। তখন ফরাসীরা স্থির করে, যুদ্ধ চালাইতে হইবে, পরাভব স্বীকার করা হইবে না। কিন্তু ফরাসী প্রতিনিধিসভার অধিকাংশ সদস্যই ব্যবহারাজীব—যুদ্ধের কিছুই বুঝেন না। জার্ম্মাণগণ ফরাসী সম্রাটকে বন্দী করিয়াই নিবৃত্ত হইল না। তাহারা রিমস দখল করিয়া ১৫ই তারিখে প্যারিস অবরুদ্ধ করিল। প্যারিস বহু দুর্গে সুরক্ষিত হইলেও ফরাসীরা জার্ম্মাণদিগকে

পরাভূত করিতে পারিল না। ৫ই অক্টোবর উইলিয়ম ভার্সেলস প্রাসাদে অবস্থিত হইলেন। প্রথমে বড় কামানের অভাবে জার্ম্মাণগণ প্যারিস বিপন্ন করিতে না পারায় আত্মরক্ষার উপায় করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্যারিস অবরুদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নূতন ফরাসী সরকারের কয়জন কর্ম্মকর্ত্তা প্যারিস হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ব্যবহারাজীব গাম্বেটা বেলুনে উঠিয়া প্যারিস হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশের অস্ত্রধারণক্ষম অধিবাসীদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে আদেশ করিলেন, বিদেশ হইতে সমরসরঞ্জাম আনিতে দিলেন, নবগঠিত সেনাদল শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ অশিক্ষিত সেনা লইয়া সুশিক্ষিত জার্ম্মাণদিগকে সমরে পরাভূত করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ফরাসীরা যে কিছুতেই পরাভবস্বীকার না করিয়া দেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, সেজন্য তাহাদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু তাহাদের কার্য্যে দেশের দুর্দ্দশা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া প্যারিসের উদ্ধারসাধন অসম্ভব বুঝিয়া গাম্বেটা আর এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি জার্ম্মাণী আক্রমণের আয়োজন করিলেন। তাহা হইলে স্বদেশরক্ষার্থ জার্ম্মাণগণ দেশে ফিরিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণরা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, তদনুসারে ব্যবস্থা করিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হইতে লাগিল। শেষে ফ্রান্সের পক্ষে আর শত্রুর গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী সন্ধির সর্ত্ত সাব্যস্ত হইল—১৫ই মার্চ্চ সন্ধি সংস্থাপিত হইল। স্থির হইল, ফ্রান্স আলসেস ও লোরেন জার্ম্মাণীকে দিবেন এবং ক্ষতিপূরণজন্য বহু অর্থ দিবেন। সে অর্থ শোধ না

হওয়া পর্য্যন্ত ফরাসী দেশের কতকাংশ ও প্যারিসের নিকটস্থ কয়টি দুর্গ জার্ম্মাণদিগের অধিকারে রহিবে। ব্রাসেলসে সম্মিলিত প্রতিনিধিদিগের দ্বারা ১০ই মে এই সব সর্ত্ত স্বীকৃত হয়।

যে যুদ্ধে জার্ম্মাণীর জয় হইল, সেই যুদ্ধই নবীন জার্ম্মাণীর প্রতিষ্ঠার কারণ। এই যুদ্ধে সমগ্র জার্ম্মাণী একযোগে কায করিয়াছিল, দক্ষিণ জার্ম্মাণীর প্রতি উত্তর জার্ম্মাণীর বিরাগ বিদূরিত হইয়াছিল, সকল রাজ্য সম্মিলিত হইয়া এক সাম্রাজ্যে পরিণত হইবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

জার্ম্মাণীর নৃপতিরা রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট বলিয়া অভিহিত হইতেন। সারলামেনের সময় এই উপাধির উৎপত্তি। বহুদিন জার্ম্মাণীর নৃপতিবৃন্দ এই শূন্যগর্ভ সম্মানের জন্য অনেক সুবিধা নষ্ট করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের জন্য সে ভ্রান্তির শেষ হইয়াছিল। এবার আর একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। জার্ম্মাণীর রক্তসিক্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে উপদেশ লিখিত হইয়াছিল, জার্ম্মাণগণ সে উপদেশ গ্রাহ্য করে নাই। আপনাদের স্বার্থের জন্য তাহারা দেশের স্বার্থ ভুলিয়া থাকিত—একতার শিক্ষা করে নাই। যে দেশের সহিত চিরদিন জার্ম্মাণীর প্রবল শত্রুতা ছিল,—যে দেশের রাজনীতিকরা জার্ম্মাণীর অন্তর্বিচ্ছেদে আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেন—এত দিনে সে দেশের পরাজয় সম্পূর্ণ হইল। আর জার্ম্মাণীর একতাই সে পরাজয়ের কারণ।

এইবার জার্ম্মাণরা বুঝিতে পারিল, একতাই বল—"তৃণৈ গুণত্বমাপন্নৈ বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ" যে তুচ্ছ তৃণ অতি অল্প আয়াসেই ছিন্ন হয়, তাহাই একত্রিত হইয়া রজ্জুতে পরিণত হইলে মত্ত হস্তীকে বদ্ধ করা যায়। তাই সকল খণ্ডরাজ্যের রাজারা সমবেত হইয়া প্রাসিয়ার

রাজাকে সম্রাট করিতে চাহিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ঘোষণা করা হইল যে, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত হইল। ১৮ই তারিখে বিজিত ফ্রান্সের ভার্সেলস প্রাসাদে প্রাসিয়ার রাজা উইলিয়ম জার্ম্মাণীর সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। জার্ম্মাণীর সকল রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই ঘোষণা করিলেন। ২৮শে তারিখে অবরুদ্ধ প্যারিস শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। সমগ্র সাম্রাজ্যের সম্মিলিত প্রতিনিধি-সভার প্রথম অধিবেশন ২১শে মার্চ্চ তারিখে হইল।

এই ব্যবস্থায় লোকের অনেক সুবিধা হইল। পূর্ব্বে লোককে এক রাজ্য হইতে অন্যরাজ্যে যাইতে হইলে টাকা বদলাইতে হইত—তাহাতে লোকের অসুবিধার এক শেষ হইত। তখন সমগ্র জার্ম্মাণীতে একই প্রকার মুদ্রা চলিত হইল। তাহাতে ব্যবসার যে কত সুবিধা হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার প্রত্যেক রাজ্যে স্বতন্ত্র আইন চলিত ছিল। এখন সব রাজ্যের আইনে সমতাসাধনের চেষ্টা হইল। কিন্তু সম্মিলনের সুফল ইহাতেই পর্য্যবসিত হইল না। সম্মিলিত সাম্রাজ্যের শক্তি বর্দ্ধিত হইল,—প্রজারও প্রতাপ বর্দ্ধিত হইল। জার্ম্মাণরা একটি গান গাহে তাহার ভাব এই—জার্ম্মাণ মাতৃভূমি কোথায়?—প্রাসিয়ায় না সার্ভিয়ায়, না দ্রাক্ষাক্ষেত্রপূর্ণ রাইনতীরে, না বেভেরিয়ায়, না স্যাক্সনীতে? মাতৃভূমি এ সকল অপেক্ষা বৃহৎ। শেষে আছে—যে স্থানে জার্ম্মাণ ভাষা ব্যবহৃত হয়, জার্ম্মাণ সঙ্গীত গীত হয়, বিদেশী মিথ্যা ঘৃণিত হয়, সত্যের আদর হয়, সেই স্থানেই জার্ম্মাণ মাতৃভূমি। জার্ম্মাণী যদি এই আদর্শেরই অনুসরণ করিত—তবে জার্ম্মাণী জগতের সভ্যতায় যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিতে পারিত; তবে জার্ম্মাণী জগতে যে শান্তি-রক্ষার ভাণ করিয়া, সমরানলে সমগ্র জগৎ দগ্ধ করিয়াছে, সেই শান্তি-রক্ষার অমিত গৌরবে উজ্জ্বল হইত।

কিন্তু জার্ম্মাণীর—নবীন জার্ম্মাণীর শক্তিকেন্দ্রেই তাহার দৌর্ব্বল্য নিহিত ছিল। নবীন জার্ম্মাণীকে যুক্ত ও শক্তিশালী করিবার জন্ত জার্ম্মাণদিগকে ক্ষাত্রশক্তির পূজা করিতে হইয়াছিল—সমগ্র জাতিকে সৈনিকে ও সমগ্র সাম্রাজ্যকে জয়স্কন্ধাবারে পরিণত করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক অস্ত্রধারণক্ষম জার্ম্মাণকে তিন বৎসর সৈনিকের কায করিতে হয়। কেবল যাহারা ডাক্তারী ওকালতী প্রভৃতি ব্যবসার জন্ত শিক্ষা-লাভ করে, তাহারাই একটি বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এক বৎসর সৈনিক থাকিয়াই নিষ্কৃতি পায়। এ ব্যবস্থায় যে দেশের ও দেশের লোকের উপকার হয়, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণীর সৈনিক-শিক্ষা শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা—তাহাতে অলসদিগকেও শ্রমশীল করে—লোকের বুদ্ধিবিকাশে সহায়তা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার অসুবিধার কথাও মনে রাখিতে হয়। সমগ্র জাতির অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষ-দিগকে সৈনিক করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধকার্য্যে শিক্ষা দিবার ব্যয় সামান্ত নহে। সে ব্যয় দেশের প্রজাদিগকেই বহন করিতে হয়। ফলে রাজস্বের মাত্রা বাড়িয়া যায়। কিন্তু অপচয় কেবল যে অর্থেরই হয়, এমন নহে। কেবল যে সৈনিকদিগের আহারের, বেশের, সমর-সর-ঞ্জামের ব্যয় যোগাইয়াই জার্ম্মাণগণ নিষ্কৃতি পায়—এমন নহে। সৈনি-কের কার্য্যশিক্ষায় যুবকদিগের জীবনের কয় বৎসর ব্যয়িত হয়। সে সময়ে তাহারা বিদ্যাচর্চ্চার সুযোগ পাইলে দেশের ও আপনাদের উন্নতির উপায় করিতে পারে। এই ক্ষাত্রশক্তির যূপকাষ্ঠে তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যম বলি দেওয়া হয়। সকল লোকই যে সৈনিককার্য্য ভালবাসিবে, এমন কথা নাই। তাই দেশের কোন কোন লোক এই কাযের দায় এড়াইবার জন্ত আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে পলায়ন করে। ইহাতে জার্ম্মাণীর ক্ষতি হয়। কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কোন

ব্যবসায়ে বাধ্য করিলে সুফল ফলে না। প্রাচীন স্পার্টানরা স্বদেশকে দুর্গে পরিণত করিয়া জগতের ইতিহাসে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল—কিন্তু তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছে? ক্ষাত্রশক্তি যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে তাহা হইতে দেশের সর্ব্বনাশ সমুদ্ভূত হয়। সেই জন্য ভারতে যখন আর্য্যগণ যুদ্ধ করিয়া ক্ষাত্রশক্তির বলে পরাভূত অনার্য্যদিগকে পদানত রাখিতেন, তখনও তাঁহারা ব্রহ্মবলকে ক্ষাত্র্য-শক্তির উপর আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া জাতির উন্নতির উপায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। জার্ম্মাণী তাহা পারে নাই।

আবার জার্ম্মাণী সমগ্র দেশবাসীকে যোদ্ধা করায় ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, রুসিয়া ও ইটালী বাধ্য হইয়া সেই পথের পথিক হইয়াছেন। সে সব দেশেও অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষমাত্রকেই সৈনিক হইতে হয়। ফলে সে সব দেশেও অকারণ অর্থব্যয় হয়—দেশের লোকের উৎসাহ ও উদ্যম বৃথা কার্য্যে ব্যয়িত হয়। জার্ম্মাণী এক বিপদ এড়াইয়া আর এক বিপদের সৃষ্টি করিয়াছিল—আজ জার্ম্মাণী সেই স্বখাত সলিলে ডুবিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সভ্য জগৎ ডুবাইতেছে। সময় থাকিতে জার্ম্মাণী যদি এ ভুলের সংশোধন করিত, তবে আজ বিশ্বব্যাপী বহ্নিতে সমগ্র সভ্যজগৎ দগ্ধ হইত না।

বিসমার্ক।

নবীন জার্ম্মাণীর ইতিহাসে বিসমার্ক যে বিপুল স্থান অধিকৃত করিয়া আছেন, তাহাতে সে ইতিহাসে তাঁহার কথা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়। জার্ম্মাণীর ইতিহাসলেখকগণ এই "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধ শাল প্রাংশু মহাভুজ" মন্ত্রীকে নবীন জার্ম্মাণীর স্রষ্টা বলিয়াছেন। বিসমার্কের কথা বলিতে হইলে, প্রথমে সেই উক্তির বিচার করিতে হয়। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে জার্ম্মাণীর যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি,তাহা পাঠ করিলে পাঠকের আর সন্দেহ থাকিবে না যে, খণ্ডরাজ্যগুলিকে এক সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া জগতে উন্নতিলাভের কল্পনা বিসমার্কের নহে; পরন্তু তাঁহার পূর্ব্বগামী। ফরাসীদিগের কার্য্যে জার্ম্মাণীর রোমকসাম্রাজ্যের আধিপত্য সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদূরিত হইয়াছিল—ফরাসীদিগের কার্য্যেই জার্ম্মাণগণ বুঝিয়াছিল, একতাবদ্ধ না হইলে তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং সাম্রাজ্যসংগঠনের কল্পনা তখন দেশবাসীর চিত্ত অধিকৃত করিয়াছিল। সে কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার গৌরবও বিসমার্কের নহে। খণ্ড রাজ্যগুলি ফরাসী সমরে একতাবদ্ধ হইয়া যে সুফলের আশ্বাস পাইয়াছিল—সেই সুফল স্থায়ী করিবার জন্য তাহারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রাসিয়ার রাজা উইলিয়মকে সম্রাট করিয়া সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু বিসমার্কের বুদ্ধিবল

ব্যতীত সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না। বিসমার্কের বুদ্ধি-বল ব্যতীত মলকের রণ কৌশল, যুবরাজের বাহুবল সবই ব্যর্থ হইত। ইহাতেই বিসমার্কের গৌরব। তাঁহার পরিবর্ত্তন—বিশেষতঃ কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়ম যদি বিসমার্কের চরিত্রে দোষের মত গুণেরও অংশ পাই-তেন, তবে আজ বিসমার্কের প্রতিষ্ঠিত জার্ম্মাণসাম্রাজ্য য়ুরোপে কালা-নল প্রজ্বালিত করিয়া সেই অনলে অন্যান্য রাজ্য দগ্ধ করিত না—আপনিও দগ্ধ হইত না। বিসমার্কের পরবর্ত্তী জার্ম্মাণ রাজনীতিকগণ তাঁহার চরিত্রের দোষেরই অনুকরণে সফলকাম হইয়াছেন ; সেই "রক্ত লৌহময়" বীরের গুণের অনুকরণে সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন নাই।

বিসমার্ক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল য়ুরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সেই সময়ের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তখন অনেকেই তাঁহার সমকক্ষতালাভের চেষ্টা করিয়াছেন—কাহারও চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। রাজার আবির্ভাব তিরোভাবে বিসমার্কের কিছুই হয় নাই। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তিনি তাঁহার সমসাময়িক সকল রাজনীতিক অপেক্ষা উচ্চতা দেখাইয়াছেন। যে সাম্রাজ্যকে তিনি উন্নত করিয়াছেন—সে সাম্রাজ্যে তাঁহার মত উন্নত আর কেহই ছিল না। বিসমার্ক ছাড়া জার্ম্মাণী হিমালয়হীন ভারতবর্ষেরই মত বোধ হইত।

বিসমার্কের চরিত্রে দোষ ছিল। গ্লাডষ্টোন বলিতেন, "তিনি খুব বড়, কিন্তু সদসৎ বিচার করেন না।" কিন্তু বিসমার্ক সব বিষয়ে-খাঁটি প্রাসি-য়ান ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে প্রাসিয়ান চরিত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রাসিয়ান চিরকালই উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। ট্যাসিটাস তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। মিরাবো বলিয়া ছিলেন, যুদ্ধই প্রাসিয়ানের জাতীয় ব্যবসায়। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, কামানের গোলা হইতে প্রাসিয়ানের উৎপত্তি। কিন্তু জয়ে প্রাসিয়ান

কখনই করুণা দেখাইতে পারে নাই—এখনও পারে না। তাহার সাহস ও সহ্যগুণ অসাধারণ—কিন্তু উদারতা তাহার চরিত্রে প্রায়ই লক্ষিত হয় না। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে বিসমার্কের চরিত্রের এই নিষ্ঠুরতা আর গোপন করা সম্ভব হয় নাই। যখন জার্ম্মাণী বহু ফরাসী বন্দী লইয়া বিব্রত হইতে লাগিল, তখন বিসমার্ক বলিলেন,তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিলেই ত চুকিয়া যায়। তিনি স্থিরভাবে নিষ্ঠুর প্রস্তাব করিয়া লোককে স্তম্ভিত ও ভীত করিয়াছিলেন। তিনি লোভী ছিলেন—অতিরিক্ত আহার করিতেন। তাঁহার পানদোষও প্রবল ছিল—তিনি অত্যধিক সুরাপান করিতেন। এত অত্যাচারেও যে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি অসাধারণ স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী বলিতেন, ধর্ম্মগ্রন্থে ফরাসীদিগের সম্বন্ধে অভিশাপ আছে—সমগ্র ফরাসী জাতির একটি মাত্র মস্তক হইলে তিনি সুখী হইতেন যে,একই আঘাতে তাহাদিগকে নিহত করা যাইত। এই পত্নীর প্রতি বিসমার্কের প্রেম যেমন প্রগাঢ় তেমনই প্রবল ছিল। অন্য দিকে যে বিসমার্কের হৃদয় পাষাণের মত কঠিন, প্রেমসম্বন্ধে আবার সেই বিসমার্কের হৃদয় কুসুমকোমল ছিল। কিন্তু যখন বিপদ উপস্থিত হইল—যখন তরুণবয়স্ক কৈসরের কার্য্যে তিনি আপনার উচ্চ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন,তখন তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, কৈসর যে নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে। অনভিজ্ঞতার যে সব ত্রুটির বিরুদ্ধে আমি কথা বলিতে পারিব না, অথচ যে সব ত্রুটির জন্য আমি দায়ী হইব—সে সব আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না।—"To tack on as a tail to my career the failures of arbitrary and inexperienced conceit for which I should be responsible, but wrong in saying so

aloud." কৈসরের মাতা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কন্যা। বিসমার্ক কখন তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। বিসমার্কের পদচ্যুতির সময় তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন? তখন বিসমার্ক গম্ভীরভাবে বলিলেন,"আমি আপনার সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছুই চাহি না।" পদত্যাগের পরও তিনি নীরব থাকেন নাই—আহত সিংহ যেমন গর্জ্জনে বনভূমি মুখরিত করে, তিনি তেমনই ক্রোধ-ব্যঞ্জক উক্তিতে জার্ম্মাণী মুখরিত করিতেন। তিনি বলিতেন, "লোক আমাকে ভুলিয়া যাইতেছে—আমার জীবনেই আমার সমাধি হই-তেছে—আমার প্রাণদণ্ড হইলে অনেক লোকই সুখী হইবে!"—তিনি যে তরুণ কৈসরের ব্যবহারে পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। যদি তাঁহার মৃত্যুর পর কৈসর তাঁহার সম্বন্ধে আপনার কোন কথা তাঁহার সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ করেন, সেই জন্য তিনি আপনি আপনার সমাধিস্তম্ভের লিপি লিখিয়া গিয়াছিলেন। লিপিতে আছে—

প্রিন্স বিসমার্ক

এই স্থানে

সমাহিত।

জন্ম—১লা এপ্রিল, ১৮১৫।

মৃত্যু—৩০শে জুলাই, ১৮৯৮।

তিনি সম্রাট প্রথম উইলিয়মের প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

তিনি যে রাজাকে সম্রাট করিয়াছিলেন—যাঁহার সেবায় তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি প্রযুক্ত হইয়াছিল—তিনি কেবল তাঁহাকেই প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ; কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়মকে তিনি প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

বিস্মার্কের এই কয়টি কার্য্য হইতেই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হইবে।

তিনি যেমন প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, প্রভুও তেমনই তাঁহার প্রতি অসাধারণ স্নেহশীল ছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। বিসমার্ক এক দিন রাজদর্শনে বার্লিন-প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটি ঘরে রাজপুত্রেরা নাচিয়া খেলা করিতেছিল। বিস্মার্ককে দেখিয়া শিশুরা ধরিল, তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে নাচিতে হইবে। বিস-মার্ক বলিলেন,"আমি বুড়া হইয়াছি,নাচিতে পারিব না।" তখন তাহারা স্থির করিল, তাঁহাকে অর্গান বাজাইতে হইবে ; তাহারা বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচিবে। বিস্মার্ক বাজাইতে লাগিলেন—ছেলেরা নাচিতে লাগিল। এমন সময় সম্রাট সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি বর্ণিত দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া বিসমার্ককে বলিলেন,"বিসমার্ক,তুমি সময় থাকিতে যুবরাজকে তোমার সুরে নাচিতে শিখাইতেছ, ভাল।" এই ঘটনায় এক দিকে যেমন বিসমার্কের প্রতি সম্রাটের স্নেহের ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনই তাঁহার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। বিসমার্ক রাজনীতি-বিষয়ে যেমন কঠোর ও কৌশলী ছিলেন, অন্য দিকে আবার তেমনই ভাবপ্রবণ ছিলেন। রাজকার্য্যে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টে গিয়াছিলেন। তথায় এক দিন রাত্রি-কালে তিনি চন্দ্রালোকে বেড়াইতে যাইয়া নৌকা হইতে নামিয়া রাই-নের কবোষ্ণ সলিলে সন্তরণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, নিস্তব্ধ

নিশার—উপরে অনন্ত আকাশে চন্দ্রতারকাকুল ও দূরে এক দিকে কাননাচ্ছন্ন পর্ব্বত, অপর দিকে নগরের সৌধচূড়া দেখিতে দেখিতে —আপনার সঞ্চারচঞ্চলিত জলকল্লোলমাত্র শুনিতে শুনিতে প্রবাহে ভাসিয়া যাওয়া কত সুখের! যদি এমনই করিয়া প্রতি রজনীতে সন্তরণ করিতে পারি! সন্তরণ শেষ করিয়া আসিয়া তিনি ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে বিসমার্কের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ দেখিলে য়ুরোপের রাজনীতিকসমাজে আতঙ্কের সঞ্চার হইত, সেই বিসমার্ক স্বভাবের শোভায় মুগ্ধ—মত্ত হইয়া নৈশনিস্তব্ধতার রাজ্যে অগাধজলে সাঁতার দিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। তাই এক জন ইটালিয়ান বলিয়াছিলেন, "বিসমার্ক মানবের মহাদেশ—তাঁহাতে মানবচরিত্রের সকল ভাবই বিদ্যমান—বৈষম্যে সামঞ্জস্যের এমন উদাহরণ বিরল।" যে সকল যুদ্ধের রক্তপাতে তাঁহার হৃদয় কঠোর হইয়াছিল, সে সকল যুদ্ধের ভীষণ দৃশ্যও যে তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা বিনষ্ট করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তিনি রাজনীতিক দূরদৃষ্টিহেতু বহু পূর্ব্বে যে ব্যাপারের সম্ভাবনা বুঝিয়া সুযোগ সন্ধান করিতেন— তাহাতেও নিষ্ঠুরতার সম্ভাবনায় তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। কেবল প্রাসিয়ার উন্নতির জন্য—জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিস্বপ্ন সফল করিবার জন্যই তিনি অনেক সময় অপ্রিয় ও কঠোর কার্য্য করিতেন।

তিনি বিশ্বাস করিতেন, জার্ম্মাণ জাতির উন্নতি বিধাতার অভিপ্রেত, তাই তিনি সেই কার্য্যে সাহায্য ঈশ্বরের প্রীতিকর বলিয়াই করিতেন। তিনি বহুবার বলিয়াছেন,—সে বিশ্বাস না থাকিলে তিনি রাজনীতিক কার্য্য ত্যাগ করিতেন—বিধাতার অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য বিধাতার ইঙ্গিতেই তিনি কায করিতেন। তিনি বলিতেন, স্বভাবতঃ তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী, কিন্তু পরলোকে বিশ্বাসহেতু তিনি রাজসেবা-

রত। বিসমার্কের বিশ্বাসসম্বন্ধে তর্ক করা—সে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা-সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসবশেই কর্ত্তব্যবোধে কার্য্য করিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি এমনই স্বদেশভক্ত ছিলেন যে, দেশের উন্নতিতে ঈশ্বরের প্রীতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এমন স্বদেশভক্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক তিনি যে কার্য্যে সমস্ত জীবন নিযুক্ত ছিলেন, যে কার্য্যে সমগ্র য়ুরোপে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না—সে কার্য্যে তাঁহার আসক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তিনি আপনার পল্লীবাসে কৃষিকার্য্যে মন দিতে ভালবাসিতেন—জীবজন্তু ভালবাসিতেন। তিনি শিকারী ছিলেন—গাছপালা ভালবাসিতেন—সেক্সপীয়রের ও গেটের পুস্তক এবং ফরাসী উপন্যাসের ভক্ত ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না সত্য; কিন্তু সরকারী যে সব বিবরণাদি তিনি লিখিতেন, সে সকলের সরলতা ও বিষয়বিন্যাসনৈপুণ্য পাঠককে মুগ্ধ করিত। বক্তৃতায় তিনি ভাবের প্রাবল্য বা ভাষার ছটা দেখাইতেন না। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় লোক যুক্তির বলে তাঁহার মত গ্রহণ করিত।

আহারে তাঁহার আসুরক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি বলিতেন, অধিক শ্রম করিতে হইলে অধিক আহার করিতে হয়। একবার ইটালীর সচিব ক্রিস্‌পী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি দুই গ্লাস মদ্য আনান—এক গ্লাস অতিথির জন্য। ক্রিস্‌পী মদ্যপান করেন না শুনিয়া, তিনি দুই গ্লাসই শূন্য করেন। তাহার পর ধূমপানের পালা। ক্রিস্‌পী ধূমপানও করেন না শুনিয়া বিসমার্ক বলিয়াছিলেন, "আপনি মদও খান না—চুরুটও টানেন না! আপনি কি রকম লোক?" তিনি স্বয়ং মদ্যব্যবসায়ীও ছিলেন।

তিনি রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া পুস্তক পাঠ

করিতেন; তাহার পর বেলা দশটা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেন। তিনি পার্লামেণ্টদ্বারা দেশশাসন ভালবাসিতেন না—বলিতেন, "বাক্যদ্বারা দেশশাসন হইতে পারে না।" তাঁহার মতে ইংলণ্ড আভিজাত্যগৌরব-পূর্ণ প্রজাতন্ত্র—কেবল তাহার সভাপতি পুরুষানুক্রমে সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু তিনি কার্য্যানুরোধে সব প্রণালীর সদ্ব্যবহার করিতেন, তাই জার্ম্মাণীতে পার্লামেণ্ট-প্রথার প্রবর্ত্তনের প্রতিবাদ করেন নাই। সেও দেশের কল্যাণকামনায়। সংবাদপত্রসম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা ভাল ছিল না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি বলিয়াছিলেন, সংবাদপত্র বিপ্লবপন্থীদিগের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র। অথচ তিনি সংবাদপত্রের সমালোচনায় বড় বিচলিত হইতেন; সংবাদপত্রের মত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

তিনি সহসা ক্রুদ্ধ হইতেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে কোন দ্রব্য চূর্ণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার প্রাসাদে রাজদর্শনে যাইয়া তাঁহাকে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, তিনি অধীর হইয়া একে একে দুইটি দস্তানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; তাহার পর সম্রাটের কাছে যাইয়া—কি জন্য আসিয়াছেন জিজ্ঞাসিত হইলে বলিয়াছিলেন, "আমি ছুটী চাহিতে আসিয়াছিলাম—এখন কাজে ইস্তফা দিবার অনুমতি চাহি।" কিন্তু তাঁহার ক্রোধ যেমন সহজে উদ্দীপ্ত হইত, তেমনই অল্পক্ষণে নির্ব্বাপিত হইত। তিনি অন্য কোন বিষয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না বটে, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কেহ তাঁহার কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিতেন না।

যাহাকে লোক কুসংস্কার বলে, বিসমার্কের তাহাও ছিল। তিনি প্রধান মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—তিনি পর্ব্বতারোহণ করিতেছেন, পথ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে; শেষে তিনি যে

স্থানে উপনীত হইলেন, তথায় - সম্মুখে পর্ব্বতপ্রাচীর, পার্শ্বে বিরাট গহ্বর। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র ফিরিবেন কি না ভাবিয়া হস্তধৃত যষ্টিদ্বারা প্রাচীরে আঘাত করিলেন—প্রাচীর অদৃশ্য হইয়া গেল। তাঁহার জীবনে এই স্বপ্ন সফল হইয়াছিল।

বিসমার্কের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। একবার একজন সহিস জলে পড়িয়া যায়; সে উঠিতে পারিতেছিল না—শ্রান্তিহেতু জলমগ্ন হইতেছিল। তাহা দেখিয়া বিসমার্ক তাহার উদ্ধারসাধনের জন্য স্বয়ং জলে লম্ফ দেন। বিপন্ন—শ্রান্ত—হতবুদ্ধি সহিস তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। বিসমার্ক দেখিলেন, উভয়েই জলমগ্ন হইবেন—কাহারও উদ্ধারের উপায় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সহিসকে লইয়া জলে ডুব দিলেন, সহিস অচেতন হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। তখন তিনি তাহাকে লইয়া সন্তরণ করিয়া কূলে উপনীত হইলেন। তিনি বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য যেমন করিয়াছিলেন, বহুবার বিপন্ন জার্ম্মাণীর উদ্ধারজন্যও সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় নাই—কারণ, তিনি জানিতেন, কখন্ কি চেষ্টা করিলে চেষ্টা ফলবতী হয়।

বিপদে তিনি কখনও অধীর হইতেন না। অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রাসিয়ার যুদ্ধকালে একবার এক জন আততায়ী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে, গুলী বিসমার্কের গাত্রে লাগে নাই। এই ঘটনার পর তিনি নিশ্চিন্তভাবে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার পত্নী সে দিন কয় জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিসমার্ক গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরভাবে সকলের কুশলপ্রশ্ন করিলেন; তাহার পর পাঁচ মিনিট পরে আসিবেন বলিয়া আপনার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরে বসিয়া তিনি রাজার নিকট তাঁহার হত্যাচেষ্টার বিবরণ লিখিয়া ফিরিয়া

আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আজ কি আহার হইবে না?" আহার শেষ করিয়া তিনি তাঁহার পত্নীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "দেখ আমি বেশ আছি।" বিসমার্কপত্নী বিস্মিতনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন বিসমার্ক তাঁহাকে বলিলেন, "এক জন লোক আমাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমার কোন অনিষ্ট হয় নাই। তুমি ভয় পাইও না।"

কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উপাধিদান উপলক্ষে সত্যই বলিয়াছিলেন,—"The great unique man, who never wearies, never loses courage, and fears no one but God." এ কথা যথার্থ। চল্লিশ বৎসর কাল তিনিই জার্ম্মাণীর শক্তিকেন্দ্র ছিলেন. তিনিই নিপুণ কর্ণধার হইয়া জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যতরণীকে তরঙ্গভঙ্গভীষণ সাগর হইতে উন্নতির বন্দরে আনিয়াছিলেন। সে গৌরব বিসমার্কের।

তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ছিলেন। কখন্ কোন্ কার্য্য করিলে সুফল ফলে, তাহা তিনি যেমন বুঝিতেন, আর কেহ তেমন বুঝিত না। কাহাকে কোন্ কথায় ভুলাইতে হয়—কোন্ যুক্তিতে বুঝাইতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। সম্রাট উইলিয়মকে তিনি যাহা ইচ্ছা বুঝাইয়া আপনার মতে কার্য্য করাইতে পারিতেন। প্রাসিয়ানদিগকে তিনি যেমন করিয়া চালাইতে পারিতেন, তেমন আর কেহ পারিত না—পারিবেও না। তিনি প্রাসিয়ানদিগের রণপ্রিয়তা জানিতেন, তাই দেশে অশান্তির বিস্তারসূচনা দেখিলেই যুদ্ধের আয়োজন করিতেন। তিনি যখন ডেনমার্ককে পরাভূত ও ফ্রান্সকে দলিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারই কৌশলে ইংলণ্ড প্রতিবাদও করেন নাই। করিলে আজ এ যুদ্ধ হইত না।

বিসমার্ক যখন জার্ম্মাণীতে শুল্কব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেন, তখন

বিলাতের সংবাদপত্রে এই মত ব্যক্ত হইয়াছিল যে, জার্ম্মাণীর সেনা-বলবৃদ্ধির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্যই জার্ম্মাণীকে এই পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে হইল—ইহাতেই জার্ম্মাণীর সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, আজও সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘ যে জার্ম্মাণ শক্তিকে পদদলিত করিতে এত চেষ্টা করিতেছেন, এই শুল্কব্যবস্থাতেই তাহার পুষ্টি। আবার তিনি যে দেশের সকল পুরুষকে সৈনিক করিয়া নিয়ন্ত্রিতভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশের লোকের যেমন ক্ষতি হইয়াছিল, তেমনই আর এক দিকে লাভও হইয়াছিল; কারণ, তাহাতে দেশের শিল্পীরা নিয়মের অধীন হইয়া সৈনিকোচিত ভাবে কায করিতে শিখিয়াছিল।

সত্য বটে বিসমার্কের প্রবর্ত্তিত নীতিতে দৌর্ব্বল্যের বীজ নিহিত ছিল, কিন্তু তিনি যদি সে নীতি পরিচালিত করিবার অবসর পাইতেন, তবে তিনি তাহা হইতে দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া যাইতে পারিতেন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তাহা হয় নাই। যাঁহারা তাঁহার পরবর্ত্তী, তাঁহাদের ক্ষমতার অভাবে দৌর্ব্বল্যই প্রাবল্যলাভ করিয়াছিল। যুবক দ্বিতীয় উইলিয়ম কৈসর হইয়া যে নীতির প্রবর্ত্তন করেন তাহা বিসমার্কের অনুমোদিত ছিল না, তাই তিনি পদত্যাগ করেন।

কিন্তু তখন বিসমার্কের কায হইয়া গিয়াছে—তিনি জাতীয় কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন—সাম্রাজ্যসংগঠনের স্বপ্ন সফল করিয়াছেন—বিচ্ছিন্ন জার্ম্মাণ রাজ্যগুলিকে লইয়া এক সাম্রাজ্য সংগঠিত করিয়াছেন। তখন তাঁহার নাম জগতের ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত হইয়াছে।

বিসমার্ক যখন প্রথম মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন জার্ম্মাণীর সহিত অষ্ট্রীয়ার মনোমালিন্য আরব্ধ হইয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে

আরম্ভ করিয়া বেডেন, স্যাক্সনী ও অষ্ট্রীয়া এক একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। সকলগুলিতেই প্রাসিয়ার প্রাধান্য ক্ষুন্ন হয়। কাযেই প্রাসিয়া কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইতে পারেন নাই। বিশেষ জুলভেরিনে অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রাসিয়ার মনান্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কারণ এই শুল্কসঙ্ঘে প্রাসিয়া জার্ম্মাণীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বিসমার্কের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, অষ্ট্রীয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে জার্ম্মাণীর জাতীয়তার পথ রুদ্ধ হইবে। জাতিগঠন ও সাম্রাজ্যগঠনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে যাহাতে বিঘ্ন স্থাপিত হয়, তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন না। কিন্তু বিসমার্ক দেখিলেন, তখনও প্রাসিয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভের উপযোগী বলসঞ্চয় করিতে পারে নাই—তখনও ডেনমার্কের আক্রমণাশঙ্কায় প্রাসিয়াকে শঙ্কিত থাকিতে হয়; আবার ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়া ডেনমার্কের স্বার্থরক্ষা করিবেন। তাই তিনি সুযোগ সন্ধান করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি সে সুযোগের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। প্রাসিয়ার রাজা তখন তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার কার্য্যের বিরোধী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিসমার্ক সে বিরোধ দূর করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সুগম করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বলিয়াছিলেন, "জার্ম্মাণীর রাজনীতির অনুসরণ ব্যতীত আমাদের অন্য উদ্দেশ্য নাই। আমরা প্রাসিয়ার নেতৃত্বে জার্ম্মাণীর জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠিত করিব।" তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, নৈতিক হিসাবে সে সকল প্রশংসনীয় নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যের উচ্চতাসম্বন্ধে তাঁহার কোন

সন্দেহ ছিল না। এমন কি তিনি মনে করিতেন, প্রাসিয়ার নেতৃত্বে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য-গঠনে তিনি বিধাতার আদেশ পালন করিতেছেন।

তিনি স্পষ্টই বলিতেন,—"The only sound principle of action for a great State is political egoism." তাঁহার এই-রূপ মতের জন্যই গ্ল্যাডষ্টোনপ্রমুখ রাজনীতিকগণ তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বিসমার্কের বুদ্ধিসম্বন্ধে, তাঁহার বিরাট মনুষ্যত্ব-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না—থাকিতেও পারে নাই। তিনি যদি কোন নিন্দার্হ কায করিয়া থাকেন, তবে সে কেবল জার্ম্মাণীর কল্যাণ-কামনায়—জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে সবল ও আত্ম-রক্ষাক্ষম করিবার জন্য। তিনি জার্ম্মাণীকে বহু দুর্ব্বল খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত দেখিয়াছিলেন—আর অসাধারণ প্রতিভাবলে সেই বহু খণ্ডরাজ্য ভাঙ্গিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিলেন। যে সকল রাজ্য পরস্পরকে ঘৃণা করিত—পরস্পরের ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত ছিল—তিনি সেই সকল রাজ্যকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্ষাত্রশক্তির উন্মেষে—শুল্কসঙ্ঘের স্বার্থে—সম্মানলাভের প্রলোভনে তিনি সে সব রাজ্যকে এমন করিয়া এক করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধেও তাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে পারিতেছে না। সে দিন লর্ড রোজবেরী এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণী ইংরাজের শত্রু নহে—শত্রু প্রাসিয়া; জার্ম্মাণী বৃহৎ হস্তী—প্রাসিয়া তাহার মাহুত; মাহুত যেমন চালাইতেছে, হস্তী তেমনই চলিতেছে। বাস্তবিক বিসমার্ক প্রাসিয়াকে যে প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন, আজ জার্ম্মাণী তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিতেছে না—তাই সমগ্র জার্ম্মাণী প্রাসিয়ার জন্য রণসমুদ্রে সাঁতার দিয়াছে—কোন্ কূলে উঠিবে—কূলে উঠিতে পারিবে কি না, তাহা

ভাবিয়াও দেখে নাই। জার্ম্মাণী যেন প্রাসিয়ার মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া কায করিতেছে।

যখন কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়মের সহিত মতান্তরহেতু বিসমার্ক মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন, তখন সমগ্র রাজনীতিক সমাজ তাঁহার জন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ শিল্পী সার জন টেনিয়েল এই উপলক্ষে 'পাঞ্চ' পত্রে এক চিত্র প্রকাশ করেন। যিনি জার্ম্মাণ রাজনীতির তরণী—তরঙ্গভঙ্গভীষণ আবর্ত্তবিকট শৈলসঙ্কুল সমুদ্রপথে সাবধানে চালাইয়া নিরাপদস্থানে আনিয়াছেন, সেই বৃদ্ধ নাবিক তরী ত্যাগ করিতেছেন, আর যে চালক তরী চালাইবার ভার লইতেছে, সে হাসিতেছে, সে বালক কৈসর। মূল চিত্রখানি লর্ড রোজবেরী বিসমার্ককে উপহার দিয়াছিলেন।

শিক্ষা।

জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য সংগঠিত হইলে যে সকল কার্য্যের ভার সমগ্র সাম্রাজ্যের বলিয়া পরিগণিত হয়—শিক্ষাদান সে সকলের অন্যতম নহে। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য যে সকল খণ্ড রাজ্যের সমষ্টি শিক্ষাবিষয়ে সে সকল রাজ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা—ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের জন্য কোন একটি আদর্শ গঠিত হয় নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সকল রাজ্যের আদর্শে সাদৃশ্যই প্রবল। তাহা হয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের বুদ্ধির ফল, নহে ত ঘটনাচক্রে সেই সাদৃশ্য সংগঠিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার একইরূপ আদর্শ প্রবর্ত্তিত না থাকিলেও বুঝিতে পারা যায়, জার্ম্মাণীতে সর্ব্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা হইয়া থাকে। জার্ম্মাণীতে যাহাদিগকে সাম্রাজ্যের নিয়মে সৈনিক কার্য্যে আসিতে হয়, তাহাদিগের মধ্যে সহস্রে তিন জনও নিরক্ষর নহে। ফ্রান্সে সৈনিকদিগের মধ্যে সহস্রে পঞ্চাশ জন ও অষ্ট্রীয়ায় দুই শত দশ জন নিরক্ষর। রুসিয়ায় শতকরা সত্তর জনের অধিক নিরক্ষর। ইহাতেই জার্ম্মাণীতে প্রাথমিকশিক্ষার বিস্তার পরিমাণ করা যাইতে পারে। আর জার্ম্মাণীতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনের কোন চেষ্টাই লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হয়। তবে জার্ম্মাণ শিক্ষায় যে চরিত্রগঠনচেষ্টা হয়—তাহা স্বায়নিষ্ঠ—সবল স্বাধীনতার

নামান্তর নহে। শিক্ষার্থীকে ধৈর্য্যশীল ও আজ্ঞাবহ করিয়া তাহাকে সমাজ-শৃঙ্খলের অংশে পরিণত করাই জার্ম্মাণীর শিক্ষার উদ্দেশ্য। জার্ম্মাণদিগকে আজ্ঞাবহ করাই জার্ম্মাণ সরকারের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই তথায় শিক্ষকগণ রাজকর্ম্মচারী—স্বাধীন বিদ্যা-ব্যবসায়ী নহেন। প্রাসিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন অধিক নহে—সামাজিক সম্মানও প্রলোভনীয় নহে। কিন্তু জার্ম্মাণ শিক্ষকগণ সাধারণতঃ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও শিক্ষাদানকার্য্যে বিশেষ উৎসাহী। তাঁহাদিগের কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করাও হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া শিক্ষকের কার্য্যের জন্য প্রার্থীকে আরও পাঁচ বা সাত বৎসর শিক্ষক-শিক্ষাগারে অধ্যয়ন করিতে হয়। এরূপ শিক্ষাগার দেশে অনেকগুলি আছে। বিদ্যালয়ের ব্যয় বার্ষিক ২৭ টাকা ৬ আনা মাত্র। তবে শিক্ষার্থীকে আহারের ও বাসের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে একটি পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীকে আর একটি শিক্ষাগারে বিশেষজ্ঞের নিকট শিক্ষকের কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। একত্রিশ বৎসর কার্য্য করিবার পরও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের আয় বার্ষিক তিন হাজার টাকার উপর হয় না। আমাদের দেশ দরিদ্র দেশ—এ দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়রা কোন কালে এরূপ আয়ের কল্পনাও করিতে পারেন না। কিন্তু যুরোপের আদর্শে বিচার করিলে এ আয় সামান্য। বাস্তবিক যাঁহারা দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করিয়া দেশের লোকের শিক্ষাদানের ও চরিত্রগঠনের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের কার্য্যের ও দায়িত্বের গুরুত্ব বিবেচনায় এ আয় অধিক বলা যায় না।

জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে বিতরিত হয়। সরকার

হইতে শিক্ষার ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ প্রদত্ত হয়—অবশিষ্ট ব্যয়ের অনেকাংশ ভূস্বামীদিগকে বহন করিতে হয়। ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে ছাত্রদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয়—সকলেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য। যাহাতে সহরের ও পল্লী-গ্রামের ছেলেদের শিক্ষা একই প্রকারের না হয়, সে জন্য দুই দলের ছাত্রদিগের উপযোগী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাও হইয়াছে। পল্লীগ্রামে ছাত্ররা কৃষি প্রভৃতির বিশেষ শিক্ষালাভ করে। প্রধানতঃ জমীদারদিগের চেষ্টায় এই ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে পল্লীবাসীরা দলে দলে পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরে ভিড় বাড়ায় না—কৃষকেরও শ্রম-জীবীর অভাব হয় না। জার্ম্মাণ শিক্ষাপ্রণালীর এইরূপ বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। ইহা জার্ম্মাণদিগের দূরদৃষ্টির পরি-চায়কও বটে। প্রাসিয়ায় দুর্ব্বল ছাত্রদিগের জন্য বনমধ্যে মুক্ত স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—অন্ধ, বধির প্রভৃতির জন্যও শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে প্রাসিয়ার আদর্শ জার্ম্মাণীর অন্যান্য দেশেও অনুকৃত হইয়াছে এবং তাহাতে সুফল ফলিয়াছে। গড়ে ছাত্র-দিগকে সপ্তাহে কুড়ি ঘণ্টা হইতে ত্রিশ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে থাকিতে হয়। সেই সময়ের মধ্যে সাহিত্য হইতে কারিগরীশিক্ষা পর্য্যন্ত সবই প্রদানের ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ স্থানীয় ধর্ম্মযাজকগণ বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ও নিয়ামক।

জার্ম্মাণ বিদ্যার্থী যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে,তখন হই-তেই প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণীর শিক্ষাকার্য্যে সরকারের কর্ত্তব্য আরব্ধ হয়। শিক্ষার্থীর চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে যে প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি হয়, তাহাকে কোন প্রকারেই সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। সর্ব্বত্র যেমন জার্ম্মাণীতেও তেমনই এই বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ছেলেরা

পিতামাতার যে কাযে অর্থোপার্জ্জন হয়, সেই কাযে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাতে ভবিষ্যতে ছেলেদের কোন ব্যবসা-গ্রহণের সুবিধা ঘটে না; অধিকন্তু তাহারা উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিযোগীদিগের সহিত প্রতি-যোগিতায় পরাভূত হয়। এই সকল দেখিয়া হ্যামবার্গ, স্যাক্সনী প্রভৃতি রাজ্যে প্রাসিয়ার পূর্ব্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর উচ্চতর বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদিগকে পাঠ করাইবার ব্যবস্থা করা হয়। উর্‌টেমবার্গে ছেলে-দের আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রাসিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা উচ্চতর বিদ্যালয়-গুলির ভার শিক্ষাসচিবকে না দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য-সচিবকে প্রদত্ত হয়। তাহারই ফলে ব্যবসাশিক্ষা স্বাতন্ত্র্য পাইয়া অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। জার্ম্মাণ সহরগুলিতে ইহার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

সাধারণতঃ ছেলেরা জার্ম্মাণ, পাটীগণিত, জ্যামিতি ও অঙ্কন শিক্ষা করে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ছেলেরা উচ্চতর বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করিতে বাধ্য। কিন্তু পল্লীগ্রামে এই নিয়ম আমলে আনিবার পক্ষে অনেক অসুবিধা; কারণ, স্থানীয় অবস্থার জন্য অনেক স্থলে এ আইন আমলে আনিলে লোকের অসুবিধার একশেষ হয়। স্যাক্সনীতে ও উর্‌টেমবার্গে প্রথম কৃষি ও ব্যবসা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। এখন সর্ব্বত্রই সে ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে বেভেরিয়াই এ বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। বেডেনে ও প্রাসিয়ায় উটজশিল্পের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হয়, সে জন্য মেয়েদের আবশ্যক শিক্ষা দেওয়া হয়, ছেলেরা কারীগরী শিক্ষা পায়।

মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের শিক্ষার ও উচ্চশিক্ষার মধ্যবর্ত্তী সংযোগসেতু বলিলেও বলা যায়। এই সব বিদ্যালয়ে সর্ব্বসাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণী থাকে, প্রত্যেক

শ্রেণীতে পঞ্চাশের অধিক ছাত্র লইবার রীতি নাই। এই সব বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীকে অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়; আর সম্ভব হইলে এই সব বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা, খনির কায, ব্যবসা, নৌ-ব্যবসা প্রভৃতির শিক্ষাও প্রদত্ত হয়।

হান্‌সা সহরগুলিতে মধ্যবিদ্যালয় সমূহে ফরাসী ও ইংরাজী—এমন কি কোন কোন স্থলে লাটিনও শিখান হয়। শিক্ষকদিগকে বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। তাঁহাদিগের বেতনও কিছু অধিক। এই সকল বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীর বেতনও সামান্য। তাহা যে বিদ্যার্থীর সংখ্যাধিক্যের অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কেবল ইহাই নহে—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে, তাহারা বৃত্তিলাভ করিয়া, বিনাব্যয়ে মধ্যবিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে এবং এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে পারে। আমরা এ দেশে এইরূপ ব্যবস্থার সমর্থন করি। নানা কারণে সকল বিদ্যার্থীর পক্ষে উচ্চশিক্ষালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। দেশের সব লোক উচ্চশিক্ষালাভ করিবে, এ আশা করা যায় না—সে আশা পূর্ণ হইলেও তাহাতে সুফল ফলে কি না সন্দেহ। কিন্তু দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বত্র—সমাজের সকল স্তরে ব্যাপ্ত হইলে সুফল ফলিবে। দেশ কেবল উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, গ্রন্থকার লইয়া চলে না—কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় এ সব নহিলে চলে না। অথচ ইহাদের পক্ষে উচ্চশিক্ষালাভচেষ্টায় যে অর্থ ও সময় ব্যয়িত হয়, তাহা অপব্যয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে সকল বালক অসাধারণ মেধার পরিচয় দেয়, তাহাদের পক্ষে দারিদ্র্যহেতু উচ্চশিক্ষালাভে বঞ্চিত হওয়াও সমাজের পক্ষে ক্ষতি। তাই আমরা বলি, যদি প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচারের সুব্যবস্থা করিয়া মেধাবী ছাত্রদিগের

জন্ম বৃত্তির সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই শ্রেণীর ছাত্রগণ অনায়াসে প্রতিভাসম্বল লইয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে। জার্ম্মাণীতে এইরূপ ব্যবস্থাই আছে। তাহাতে সুফলও ফলিয়াছে।

জার্ম্মাণীর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা জটিল। কিন্তু যে সকল কারণে জার্ম্মাণীতে ছাত্রগণ শিক্ষালাভে বিশেষ যত্ন করে সে সকলের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ—নিম্ন বিদ্যালয়ের ছাড় না পাইলে কোন ছাত্রই উচ্চ বিদ্যালয়ে বা কারিগরী শিক্ষাগারে প্রবেশাধিকার পায় না। দ্বিতীয়তঃ—বিদ্যালয়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়া প্রশংসাপত্র না পাইলে কাহাকেও সৈনিকবিভাগে পূর্ণকাল কায করিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। অর্থাৎ সে পত্র পাইলে বিদ্যার্থী এক বৎসর সৈনিক থাকিয়াই অব্যাহতি পায়—নহিলে তাহাকে তিন বৎসর সৈনিকের কায করিতে হয়। ইংলণ্ডে ও জার্ম্মাণীতে বিদ্যার্থীর বৃত্তিলাভবাসনার কারণে প্রভেদ এই যে, বিলাতে বৃত্তিলাভ করিতে না পারিলে অনেক ছাত্র উচ্চশিক্ষা পায় না—এই পর্য্যন্ত; আর জার্ম্মাণীতে বিদ্যার্থী বৃত্তিলাভ করিতে না পারিলে যে কায করিতে বাধ্য হয়, তাহাতে তাহার পক্ষে সমস্ত জীবন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এ অবস্থায় জার্ম্মাণীতে যে বিদ্যার্থীরা বৃত্তিলাভ করিতে অর্থাৎ সাফল্য লাভ করিতে অধিক চেষ্টা করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং তাহারই ফলে দেশে শিক্ষাবিস্তার হয়। কারণ, জ্ঞানতৃষ্ণা মানবহৃদয়ে একবার প্রবল হইলে, মানুষ তাহার তৃপ্তির জন্ম চেষ্টা না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারে না।

কিন্তু জার্ম্মাণ শিক্ষাপ্রণালীর দোষ এই যে,—তাহাতে বিদ্যার্থীর চরিত্রগঠনের—তাহাকে মানুষ করিবার কোন চেষ্টাই হয় না; আর তাহার প্রকৃতির সকল বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিয়া সকলকে একই ছাঁচে

গঠিত করা হয়। জার্ম্মাণীতে মানুষের স্বাতন্ত্র্যসংরক্ষার চেষ্টা হয় না—মানুষকে কেবল বিরাট শাসনযন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট অংশ করিয়া গঠিত করা হয়। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র বাদ পড়ে না তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা বাদ পড়ে তাহারাও জার্ম্মাণীর বিদ্যালয়ের সাফল্য-লাভগৌরবোজ্জ্বল ছাত্রদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ চিরত্র-গঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্য—যন্ত্রের অংশগঠন নহে। যেমন বর্ণবৈচিত্র্যেই প্রকৃতির শোভা—তেমনই প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যেই সমাজের শোভা—আর উভয় শোভার মূলেই উন্নতির কারণ নিহিত। জার্ম্মাণ পণ্ডিতরা যে সে কথা বুঝেন না এমন মনে করা যায় না—তবে তাঁহারা যে শাসনযন্ত্রের অংশ সেই শাসনযন্ত্রের পেষণেই তাঁহারা শিক্ষার স্বরূপ বিস্মৃত হয়েন।

জার্ম্মাণীর যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী যে সরকারের শাসনাধীন সে কথা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শিক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে পরিবর্দ্ধিত না হইলে তাহাতে সুফল ফলে না। ভারত-বর্ষে আমরা তাহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। বিলাতে ও মার্কিণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাতন্ত্র্য কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ণ নহে। জার্ম্মাণীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সরকারের নির্দ্দেশে সৃষ্ট; এমন কি বিদ্যালয়ের আয়ব্যয় ব্যাপারও সরকারী শাসনমুক্ত নহে।

জার্ম্মাণীতে ব্যবসানির্ব্বাচনসম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা আছে। তাহাতে জার্ম্মাণ বালকদিগকে ইচ্ছা করিয়া শিক্ষক হইতে বারণ করা হইয়াছে। বাস্তবিক জার্ম্মাণীতে শিক্ষকগণ প্রায়ই ইচ্ছা করিয়া—শিক্ষ-কের কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিচার করিয়া শিক্ষকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। বহুদিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া—বিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হইয়া—শিক্ষাশেষে অন্য কোন কার্য্যের অভাবে তাঁহারা শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। শিক্ষকের কার্য্য যে সম্মানের সে বিশ্বাস জার্ম্মাণদিগের

মধ্যে—বিশেষ জার্ম্মাণ শিক্ষকদিগের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না।

আবার জার্ম্মাণীতে উচ্চশিক্ষার ব্যয় অতি অল্প—বৎসরে কেবল ১১২টাকা ৮ আনা। ইহাতে অনেক ছাত্রই উচ্চশিক্ষালাভে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ছাত্রদিগকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল ফলে না। বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে শতকরা ৭০জন ক্ষীণদৃষ্টি হয়—শতকরা ৪০জন সৈনিককার্য্যের অযোগ্য বলিয়া বর্জ্জিত হয়। বোধ হয় এই জন্যই জার্ম্মাণীতে চশমাধারী যুবককে সৈনিক করা হয়। ইংলণ্ডেও এত দিন পরে তাহারা সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। আর এই অতিরিক্ত শ্রমের জন্যই জার্ম্মাণীতে ছাত্রদলে আত্মহত্যা এত অধিক। বার্লিনের সংবাদপত্র পাঠ করিলে প্রায়ই দেখা যায়, বিদ্যালয়ের মন্তব্য ভাল না হওয়ায় বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া বিদ্যার্থী আত্মহত্যা করিয়াছে! এ বিষয়ে জার্ম্মাণ অভিভাবকদিগেরও যে দোষ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির দোষের তুলনায় তাঁহাদের দোষ মার্জ্জনীয় প্রতীয়মান হইতে পারে।

জার্ম্মাণীতে বালিকাদিগের শিক্ষাপদ্ধতি বালকদিগের শিক্ষাপদ্ধতিরই অনুরূপ হইলেও সে দিকে সরকারের বা মিউনিসিপ্যালিটীগুলির তেমন দৃষ্টি নাই। বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যয়ও অতি অল্প। জার্ম্মাণীতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিলাতের বা মার্কিণের মত চেষ্টা লক্ষিত হয় না। জার্ম্মাণ বিদ্যালয়সমূহে ৩০ হইতে ৪০ হাজার মহিলা-শিক্ষক আছেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তবে যাহাতে বালিকারা প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াই কারখানায় ও দোকানে কায করিতে না যায় সে জন্য কিছু চেষ্টা হইতেছে। গৃহকর্ম্মের ও সন্তানপালনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করায় এ চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছে।

জার্ম্মাণ শিক্ষাপদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান দোষ, তাহা কোন হিসাবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করে না। বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে পদ্ধতি বিশেষভাবে কল্পিত। সেই জন্যই জার্ম্মাণীতে বিশেষজ্ঞের বাহুল্য। জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন সাহিত্যাদির শিক্ষার জন্য ব্যয়কুণ্ঠা ও কারিগরী শিক্ষার জন্য অকাতরে ব্যয় দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এখন আর তাহার কারণ বুঝিতে কাহারও বিলম্বের সম্ভাবনা নাই। জার্ম্মাণী ইচ্ছা করিয়া এইরূপ শিক্ষাবিস্তারেই ব্যাপৃত হইয়াছিল। সরকারের সুবিধার জন্য আর সকলের সুবিধাই জার্ম্মাণী অবহেলা করিয়াছে। তাই ক্রমে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনে সরস সামাজিক ভাবের অভাব হইয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারী যন্ত্রের—কলের অংশগঠন করিয়াই আসিয়াছে। এই জন্য শিল্পবাণিজ্যে জার্ম্মাণীর উন্নতির গতি দ্রুত হইয়াছে- ব্যবসায়ে যখন যেরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, তখনই সেইরূপ লোক অনায়াসে মিলিয়াছে। কারিগরী বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এইরূপ লোক পাইবার উপায় হইয়াছে। পরীক্ষায়—যাচাইয়ে বিশেষ শিক্ষা সর্ব্বত্রই সময়সাপেক্ষ হইয়াছে। যে বিদ্যার্থী শিক্ষকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে সেও বয়স হিসাবে ৩০বৎসর না হইলে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না। পরীক্ষার পর আবার সৈনিককার্য্যে সময় যায়। যাহাদিগের ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হয়—তাহারা শিক্ষা শেষ করিয়া আর অর্থার্জ্জনের জন্য বিলম্ব করিতে পারে না। তাই তাহারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া আসিতেই প্রয়াস পায়। ফলে দেশে সুশিক্ষিত শিল্পীর বা শ্রমজীবীর বাহুল্য হয় এবং তাহাদের কার্য্যে দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি হয়। ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতিতে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়। জার্ম্মাণী বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জন্য ধনসঞ্চয়ের আশায় শিক্ষাপদ্ধতির এইরূপ পরিবর্ত্তন

সংসাধিত করিয়াছিল। অর্থাৎ জার্ম্মাণী এই যুদ্ধের আয়োজনেই সর্ব্বস্বপণ করিয়াছিল; সকল দিকেই যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল।

জার্ম্মাণীতে গড়ে প্রতিবৎসর ১১হাজার বিদ্যার্থী আইন অধ্যয়ন করে। আইনের অধ্যয়ন ব্যতীত ব্যবহারাজীবের, বিচারকের ব্যবসাও পাওয়া যায়ই না, অধিকন্তু সিভিল সার্ভিসের প্রবেশদ্বারও মুক্ত হয় না।

বৎসরে গড়ে ১৪হাজার বিদ্যার্থী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৬ শত মাত্র। জার্ম্মাণীতে ভারতেরই মত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় সময় ও অর্থ উভয়ই অধিক ব্যয়িত হয়। শিক্ষার্থীকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হয়। ভারতেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। অথচ এ সকলের সহিত চিকিৎসকের শেষে আর কোন সম্বন্ধই থাকে না—এমন কি বিদ্যার্থী প্রথম বৎসর যে সব বিষয়ের আলোচনা করে শেষে আর তাহাকে সে সকলের আলোচনা করিতে হয় না। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার্থী অধ্যাপকদিগের কাছে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে এবং ৫ বৎসর পরে সরকারী পরীক্ষা দেয়। এ পরীক্ষা কঠোর—ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় মাসে পরীক্ষা শেষ হয় বটে, কিন্তু বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ৬ হইতে ৯ মাস পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। তাহার পর "ডাক্তারের" পরীক্ষা—সে পরীক্ষাও ২ মাস ধরিয়া চলে। তাহার পর চিকিৎসককে বিনা বেতনে এক বৎসর কোন হাঁসপাতালে কায করিতে হয়। সৈনিকবিভাগে ডাক্তারকে ৬ মাস কায করিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ৭ বা ৮বৎসরে বিদ্যার্থী চিকিৎসক হইতে পারে। যদি বিদ্যার্থী পরীক্ষায় বিশেষ বিদ্যার পরিচয় দিতে পারে বা যদি তাহার

অর্থ থাকে তবে সে ৩ বা ৪ বৎসরে অর্থার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়—নহিলে তাহাকে হয় ত কোন হাঁসপাতালে দীর্ঘ ১০বৎসর সহকারীর কায করিয়া কাল কাটাইতে হয়। এই সকল হইতে বুঝা যায়, জার্ম্মাণীর শিক্ষাপদ্ধতিতে সরকারেরই উপকার হয়, লোকের কোনরূপ উপকার হয় কি না সন্দেহ।

বৎসরে গড়ে প্রায় ১৩ হাজার ছাত্র রসায়ন, কৃষি প্রভৃতি অধ্যয়ন করে।

জার্ম্মাণ শিক্ষাপদ্ধতির দোষের কথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু সে পদ্ধতিতে গুণেরও অভাব নাই। জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকগণ কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় সুপণ্ডিত নহে, যিনি যে বিষয়ের অধ্যাপনা করেন, তিনি সে বিষয়ের আলোচনাই করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। সরকারের ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ব্যতীত আর কেহই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিবার অধিকারী নহেন। ইহাতে যে শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। যিনি কোন নূতন জিনিষের আবিষ্কার করেন, তিনিই বিদ্যার্থীদিগকে সে আবিষ্কার-কথা বুঝাইয়া দেন। ইহাতে যে বিদ্যার্থীদিগের বিষয় বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সাধারণতঃ জার্ম্মাণীতে অধ্যাপকদিগের বেতন অধিক নহে। অনেকেরই বেতন মাসিক সাত শত পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে।

এখন অধিকাংশ জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়েই মহিলাদিগের প্রবেশাধিকারলাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু কোন কোন অধ্যাপক মহিলা বিদ্যার্থীদিগের অধ্যাপনা করিতে চাহেন না।

কারিগরী শিক্ষায় জার্ম্মাণীর প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমগ্র য়ুরোপে জার্ম্মাণীই সর্ব্বপ্রথম কারিগরী শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত

হয়েন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই শিক্ষার আরম্ভ এবং ইহারই ফলে জার্ম্মাণী ব্যবসাক্ষেত্রে য়ুরোপের আর সকল দেশকে পরাভূত করিয়াছে। অন্যান্য দেশে কারিগরী শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার তুল্য সমাদর লাভ করে না—জার্ম্মাণীতে সে শিক্ষাও সাধারণ শিক্ষারই তুল্য সমাদরের অধিকারী। কারিগরী বিদ্যালয়ে স্থপতিবিদ্যা, কলকজার কায, রসায়ন, খনির কায প্রভৃতি শিখান হয়—আবার কৃষি ও পশু চিকিৎসা প্রভৃতির মত শিল্পশিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে।

অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে ব্যবসাশিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। যাহারা উত্তর কালে বড় বড় কারবার নিয়ন্ত্রিত করিবে বা সওদাগরী সভাসমিতির চালক হইবে, তাহাদিগের পক্ষে সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করা সঙ্গত বিবেচনা করিয়া কারিগরীশিক্ষার পর ব্যবসাশিক্ষাদানের আয়োজন হয়।

এইরূপে জার্ম্মাণ শিক্ষাপদ্ধতি দেশে নানারূপ শিক্ষার বিস্তারব্যবস্থা করিয়াছে।

কৃষি।

জার্ম্মাণী ব্যবসাপ্রধান দেশ হইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু আজও জার্ম্মাণীকে খাদ্যশস্যের জন্য বিদেশের উপর বড় নির্ভর করিতে হয় না। ইংলণ্ডকেও পূর্ব্বে খাদ্যদ্রব্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত না। সে নির্ভরশীলতা বাণিজ্যের ফল। বাণিজ্যের ফলে—আমদানী-রপ্তানীর সুবিধায়—ইংলণ্ড ক্রমে কৃষিবর্জ্জন করিয়া পণ্য-উৎপাদনেই মন দিয়াছে। ফলে কৃষির অবনতি হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে তাহা হয় নাই। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে জনগণের শতকরা ৪২ জন ব্যবসাব্যাপারে লিপ্ত হইলেও কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত লোকের সংখ্যাও কম নহে। কিন্তু কৃষকের সংখ্যা কিরূপ কমিয়াছে তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে জার্ম্মাণীতে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকার্য্যেই লিপ্ত থাকিত; এখন তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৩০ জনও নহে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেও শতকরা ৪২ জন কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিত—দশ বৎসরে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যায়; তখন শতকরা ৩৬ জন কৃষিকার্য্য করিত; বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত লোকের সংখ্যা ১ কোটী ৭০ লক্ষ। ইহাদিগের মধ্যে ২০ লক্ষ ভূস্বামী, ১ লক্ষ ৫০ হাজার ইজারা জমী চাষ করে, ৩০ লক্ষ শ্রমজীবী; আর ১০ লক্ষ সময় সময় ক্ষেত্রে কায করে বা কৃষকপরিবারভুক্ত।

জার্ম্মাণীতে কৃষকের সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমে নাই। ইহার কারণ, জার্ম্মাণ সরকার খাদ্যশস্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে চাহেন না এবং তদনুসারে যে পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে কৃষিকার্য্যের অবনতি নিবারিত হয়। বাস্তবিক বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণীর রহস্যরাজ্যে যে আলোকপাত হইয়াছে,তাহাতে জার্ম্মাণীর শাসনপদ্ধতির স্বরূপ দেখা যাইতেছে। যে সব ব্যবস্থার কারণ পূর্ব্বে বুঝা যাইত না, সে সব ব্যবস্থার কারণ বুঝিতে আর বিলম্ব হইতেছে না। এখন দেখা যাইতেছে, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনাবধি জার্ম্মাণী এই যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইতেছিল—আপনার সুবিধার ব্যবস্থাই করিতেছিল। নহিলে সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সমবেত চেষ্টায় জার্ম্মাণী সংগ্রামের আরম্ভেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। যে মলকে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য—নবীন জার্ম্মাণী গঠনে অন্যতম সহায় ছিলেন, তিনি বলিতেন, জার্ম্মাণীর কৃষি যদি নষ্ট হয়, তবে বিনা অস্ত্রাঘাতেই জার্ম্মাণীর সর্ব্বনাশ হইবে। মলকের এই কথাই কৃষিসম্বন্ধে জার্ম্মাণ সরকারের মূলমন্ত্র। সত্য বটে, জার্ম্মাণীর জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশমাত্র কৃষিকার্য্যে লিপ্ত, কিন্তু জার্ম্মাণ শাসনপদ্ধতি এই ভাবে গঠিত যে, কৃষিই যেন জার্ম্মাণীর প্রধান সম্পদ, কৃষির উন্নতিতে জার্ম্মাণীর উন্নতি—কৃষির অবনতিতে জার্ম্মাণীর সর্ব্বনাশ। এমন কি বড় বড় সহরে শ্রমজীবীরা বলে, প্রাসিয়া জার্ম্মাণী শাসন করে, আর কৃষকগণ প্রাসিয়া শাসন করে। কথাটা একেবারে অমূলক নহে। কৃষক সম্প্রদায়ই যে রাজ্যের প্রধান শক্তি ও রাজ্যের ভিত্তি, সেই প্রাচীন মত অন্যান্য দেশে পরিত্যক্ত হইলেও জার্ম্মাণীতে পরিবর্জ্জিত হয় নাই। জার্ম্মাণীতে এখনও লোক মনে করে, যাহার জমী নাই, দেশে তাহার বন্ধন নাই। জার্ম্মাণ সম্রাট বা কৈসর জার্ম্মাণ একতার নিদর্শন—তাঁহার শক্তি যে

প্রাচীন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কৃষক-সম্প্রদায়ের উৎস হইতে উৎসারিত।

জার্ম্মাণী সকল বিষয়েই আপনার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছে—তাহাকে কোন বিষয়ে অপরের উপর নির্ভর করিতে না হয়। জার্ম্মাণীর শুল্কব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যেই কল্পিত। জার্ম্মাণী বিদেশের বাজার আত্মসাৎ করিয়াছে কেবল দেশের ব্যবসায় বলসঞ্চয় করিয়া। বিদেশের ব্যবসা যাহাতে দেশের ব্যবসা দুর্ব্বল করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণী শুল্কের নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহার পর সেই ব্যবস্থায় সবল হইয়া জার্ম্মাণ ব্যবসা বিদেশী ব্যবসাকে পরাভূত করিয়াছে। জার্ম্মাণীর সৈনিকব্যবস্থাও এই উদ্দেশ্যেই কল্পিত। যাহাতে শত্রু কোনরূপে জার্ম্মাণীকে পরাভূত করিতে না পারে, জার্ম্মাণী তেমনই করিয়া সেনাবল সংগঠিত করিয়াছিল। সেই সেনাবল এখন জার্ম্মাণ সম্রাটের প্রমত্ত উত্তেজনায় সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। এই বিবাদের ফল অবশ্য সহজেই অনুমেয়। কিন্তু জার্ম্মাণীর সেনাবলের কারণ ব্যবসাবলের কারণেরই অনুরূপ। কৃষিকার্য্যেও জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য, জার্ম্মাণীর লোকের খাদ্য জার্ম্মাণীতেই উৎপন্ন করিতে হইবে—সে জন্য জার্ম্মাণী পরমুখাপেক্ষী হইবে না। আর সেই জন্যই জার্ম্মাণী অতিরিক্ত লোকের—যাহাদের আহার দেশের কৃষিকার্য্যে যোগান যায় না, তাহাদের বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। জার্ম্মাণীর উপনিবেশ-সংস্থাপনচেষ্টার কারণ এইরূপ। জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যবিস্তার-দুরাকাঙ্ক্ষার কারণও আর কিছুই নহে।

যাহাতে প্রয়োজন হইলে জার্ম্মাণীতে উৎপন্ন খাদ্যে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সমগ্র অধিবাসীর জীবনধারণের উপায় হয়, সেই জন্য জার্ম্মাণীতে সরকার কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ভূস্বামীরা

এই জন্যই শক্তিশালী। তাঁহারা বলেন, এইরূপ স্বাধীনতা ব্যতীত জাতীয় জীবন বিপন্ন হইতে পারে। জার্ম্মাণ সম্রাট যখন নৌবল বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করেন, তখন ভূস্বামীরা এই বলিয়া সে চেষ্টার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, নৌবল-বৃদ্ধিতে জার্ম্মাণী পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ নৌবল বর্দ্ধিত হইলে বিদেশ হইতে অন্যান্য দ্রব্যের মত খাদ্যদ্রব্যেরও আমদানীর সুবিধা হইবে; ফলে বিদেশী খাদ্যদ্রব্য জার্ম্মাণীতে সস্তা দরে বিকাইলে জার্ম্মাণ-কৃষির অবনতি ঘটিবে। যখন সম্রাটের সমর্থকগণ ভূস্বামীদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, নৌবলবৃদ্ধিতে জার্ম্মাণীর স্বাবলম্বন কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হইবে না—তখন তাঁহারা প্রতিবাদ করিতে নিরস্ত হয়েন। কেন জার্ম্মাণী নৌবল বর্দ্ধিত করিয়াছিল, এত দিনে তাহা বুঝা গিয়াছে। আবার যখন জার্ম্মাণীতে খালকাটা আরম্ভ হয়, তখন পূর্ব্বাংশের কৃষক-গণ তাহাতে আপত্তি করে। জার্ম্মাণীর পূর্ব্বাংশ কৃষিপ্রধান—পশ্চিম-ভাগে শিল্পের প্রাবল্য। তাই পূর্ব্বভাগের কৃষকগণ মনে করিয়াছিল, খালকাটা হইলে বিদেশের আমদানী খাদ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতায় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণীর শাসননীতির স্বরূপ দেশের লোকেও পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিগণ জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়াছিলেন। সেই জন্যই জার্ম্মাণীর ভূস্বামিসম্প্রদায় কোনরূপ পরিবর্ত্তনে খাদ্যসম্বন্ধে জার্ম্মাণীর স্বাবলম্বন ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভা-বনা কল্পনা করিলেই সে পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা না শুনিয়া সরকার পারেন না। কারণ ভূস্বামীদিগের পুত্রদিগকে সরকার সাগ্রহে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন—সরকারী কাযে ও দেশের লোকের কাছে তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতাপ অসাধারণ। তাঁহারাই রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র—লোকমতের উৎস। কিন্তু কৃষিকার্য্যের

অবনতি সরকারের অভিপ্রেত হওয়া ত পরের কথা, সরকার সর্ব্বপ্রযত্নে কৃষির উন্নতিসাধনই করিয়া থাকেন।

জার্ম্মাণীর শুল্কব্যবস্থায় দেশে বিদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানীর পথ রুদ্ধ হয়। শুল্কসংস্থাপনের উদ্দেশ্য রাজস্ববৃদ্ধি নহে—পরন্তু বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর পথরোধ! পশুখাদ্য প্রভৃতির উপর চড়া শুল্ক থাকায় লোকের উপকার না হইয়া অপকার হয়। দর চড়া থাকায় কৃষকরা পশুখাদ্য মজুদ রাখিতে পারে না; তাই একবার অজন্মা হইলেই তাহারা শীতের সময় খাওয়াইবার ব্যয় বাঁচাইবার জন্য শরৎকালেই গবাদি পশু বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। ইহাতে দিনকতক দেশে মাংস সস্তা হয়, কিন্তু অল্পকালপরেই গবাদির দর চড়িয়া যায়, তখন মাংসও চডা দরে বিকায়—লোকের অসুবিধা হয়।

তথাপি জার্ম্মাণীতে বিদেশ হইতে মাংস বা শস্যাদি আনিতে হইলে কড়া শুল্ক দিতে হয়। ফলে দেশে বিদেশী দ্রব্য সস্তায় বিক্রয় করা অসম্ভব হয় এবং দেশী দ্রব্যও অপেক্ষাকৃত চড়া দরে বিক্রয় করা যায়—অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে কৃষককে লাভ দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

কেবল তাহাই নহে করসংস্থাপনকালেও কৃষককে যথাসম্ভব অব্যাহতি দিবার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা হয়। কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামীরাও করভার হইতে অনেকটা মুক্ত। উত্তরাধিকার শুল্কবিধি প্রবর্ত্তনব্যাপারে বরাবরই কৃষকসম্প্রদায়ের জয় হইয়াছে—তাহাদের সুবিধাজনক ব্যবস্থাই হইয়াছে। যে মূলধন কৃষিকার্য্যে দেওয়া হয়, তাহা ও তাহার আয় করের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। এ বিষয়ে জার্ম্মাণ সরকার ইচ্ছা করিয়াই কড়ায় কড়া—কাহনে কাণা। এমন কি কৃষিক্ষেত্রের শ্রমজীবীদিগের অপরাধসম্বন্ধে পুলিসও তেমন সতর্ক নহে। অর্থাৎ জার্ম্মাণীতে—বিশেষ উত্তর জার্ম্মাণীতে কৃষিকার্য্যে সাত খুন

মাপ—agriculture occupies a privileged position. কারণ জার্ম্মাণ সরকারের দৃঢ়বিশ্বাস, কৃষিই সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড, কৃষি-কার্য্যের অবনতি ঘটিলে সমগ্র সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইবে। এ বিশ্বাস জার্ম্মাণ সরকার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই অবলম্বন করিয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়ম ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বার্লিন সহরে বার্ষিক কৃষিসম্মিলনে বলিয়াছিলেন—জার্ম্মাণীর কৃষিজাত দ্রব্যে সমগ্র জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগের আহার যোগাইতে হইবে—জার্ম্মাণীতে উৎপন্ন দ্রব্যই তাহাদিগের জন্য পর্য্যাপ্ত।

জার্ম্মাণীতে কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য ব্যতীত, নানাবিধ মূল ও দ্রাক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূলের মধ্যে বীটই প্রধান, এই বীট হইতে রাসায়নিক উপায়ে চিনি প্রস্তুত হয়। বিদেশে চিনি সস্তা দরে বিক্রয়ের সুবিধা করিবার জন্য—যে বীটে রপ্তানীর জন্য চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার চাষের সুবিধা সরকার করিয়া দেন। বাস্তবিক এই জন্যই জার্ম্মাণ চিনির সহিত অসম প্রতিযোগিতায় ভারতের চিনির ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইত। খর্জ্জুরের ও ইক্ষুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিয়া সেই গুড় হইতে দলুয়া, দোবরা প্রভৃতি নানা প্রকার শর্করা প্রস্তুত হইত। মোগলদিগের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানির প্রমাণ আছে। এককালে এই চিনির ব্যবসায়ে এত লাভ ছিল যে, সেই লাভের আশায় য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই "জল জঙ্গল আঁধার রাতের" দেশে পল্লীগ্রামে যাইয়া কারখানা সংস্থাপিত করিতেন। তখনও দেশে রেলপথের এমন বিস্তার হয় নাই—ফেরীফাণ্ড, জেলাবোর্ড, লোকালবোর্ড প্রভৃতির চেষ্টায় এত রাস্তাও গঠিত হয় নাই। দেশ তখন দুর্গম। তথাপি লাভের আশায় য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা পল্লীগ্রামে যাইয়া কারখানা সংস্থাপিত করিয়াছেন। অর্দ্ধ

শতাব্দীর মধ্যেই যে সে ব্যবসার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, জার্ম্মাণীর চিনির অসম প্রতিযোগিতা তাহার অন্যতম কারণ। সরকারী সাহায্যপুষ্ট পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় এ দেশের পণ্য পারিয়া উঠে নাই। পারিবার কথাও নহে। সেই জন্যই এ দেশে সরকার সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদেশী চিনির উপর শুল্ক সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয়,তাহাতে দেশে অধিক মূল্যে চিনি কিনিতে হইবে বলিয়া বিলাতের অবাধবাণিজ্যনীতির অন্ধ ভক্ত বাঙ্গালীরাও সে ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধীত বিদ্যা তাঁহাদের পক্ষে ভার মাত্র—তাহাতে তাঁহাদের কোন উপকার হয় নাই। উত্তর জার্ম্মাণীতে বহু স্থানে চিনির জন্য বীট উৎপন্ন করা হয়—সে সব ক্ষেত্রের অধিকারী-দিগকে চলিত কথায় "Sugar-baron" বলা হইয়া থাকে।

জার্ম্মাণীর উত্তর ও পূর্ব্বভাগে বড় বড় ক্ষেত্রস্বামীর সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা আপনাদের সুবিধার জন্য যে সব ব্যবস্থা করিয়া লয়েন, সে সকলে তাঁহাদের খুব সুবিধা হয় বটে, কিন্তু দরিদ্র কৃষকদিগের বিশেষ সুবিধা হয় না। তবে তাঁহারাই প্রধান এবং কৃষিকার্য্যও প্রধানতঃ তাঁহাদের হস্তগত। সুতরাং তাঁহাদের সুবিধাতে কৃষির বিশেষ সুবিধা হয়।

কৃষকদিগের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, কৃষিকার্য্যে শ্রমজীবী-দিগের অবস্থা অল্প দিন পূর্ব্বেও বড় ভাল ছিল না। তাহাদের বেতন-সম্বন্ধেও বিশেষ অনাচার লক্ষিত হইত। তবে দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে। কারণ, এখন লোক কারখানায় খাটিয়া অর্থার্জ্জনের আশায় সহরে যায়, কাযেই এখন কৃষিকার্য্যে শ্রমজীবীর অভাব হয়। সেই জন্য এখন কৃষিকার্য্যের মালিকগণ শ্রমজীবীদিগের সম্বন্ধে কতকটা

সুব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাহাতে শ্রমজীবীরা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে না যায়, তাহারই জন্ম এই সব ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু সরকারের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াও কৃষকসম্প্রদায় সম্মিলিতশক্তি সুপ্রযুক্ত করিয়া আপনাদের অবস্থার উন্নতি সাধিত করিতে পারিতেছে না। তাহার কারণ যে সম্প্রদায় তহাদের উন্নতির জন্ম চেষ্টা করে, ভূস্বামিগণ ক্ষমতা ক্ষুন্ন হইবে এই আশঙ্কায় তাহাদের প্রতি সদয় নহেন এবং সেই জন্মই পুলিসও তাহাদের প্রতি বিরূপ। এমন কি অনেক হোটেলে তাহাদের সম্মিলনের স্থানও মিলে না! যাহা হউক, ক্রমে এ অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতেছে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মাণীতে কৃষিমজুরদিগের দৈনিক "রোজের" হার ছিল পাঁচসিকা—এখন তাহা দেড় টাকায় উঠিয়াছে। অবশ্য স্থানভেদে এই পারিশ্রমিকের হারের তারতম্য হয়। বর্ত্তমান সময় স্বামি-স্ত্রী কৃষিকার্য্যে শ্রমজীবীর কাযে নিযুক্ত থাকিলে উভয়ে বার্ষিক ৫ শত হইতে ৬ শত ৭৫ টাকা আয় করিতে পারে। যে পরিবারে ৩ জন লোক এইরূপ কার্য্য করে সে পরিবারের বার্ষিক আয় ১ হাজার ১ শত ২৫ টাকা হইতে পারে। ইহা ছাড়া তাহারা ক্ষেত্রস্বামীর কাছ হইতে তরিতরকারী, হাঁস, মুরগী প্রভৃতিও পাইয়া থাকে। আমাদের দেশের শ্রমজীবীর এ আয় কল্পনারও অতীত।

যে সব বড় বড় ক্ষেত্রে কেবল বীজের চাষ হয়, সে সব ক্ষেত্রে বৎসরের সকল সময় শ্রমজীবীর প্রয়োজন হয় না; কেবল চাষের সময়ই তাহাদের প্রয়োজন হয়। এক সময় ক্ষেত্রে শ্রমজীবীর অভাব হয়; আবার অন্য সময় গ্রামের সব লোকের কায মিলে না। ফলে যখন কায পড়ে, তখন বিদেশ হইতে বহু লোক জার্ম্মাণীতে আইসে। বৎসরে জার্ম্মাণীতে সাত লক্ষ বিদেশী শ্রমজীবী আসিয়া থাকে—ইহাদের মধ্যে

শতকরা ৬০ জন ক্ষেত্রে কায করে। স্থানভেদে ইহাদের পুরুষের বেতন দৈনিক ১ টাকা ১০ আনা হইতে ২ টাকা ১০ আনা এবং স্ত্রীলোকের বেতন দৈনিক ১৪ আনা হইতে ১ টাকা ৬ আনা। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন,বিদেশ হইতে বৎসর বৎসর এইরূপ নিম্নশ্রেণীর—নিরক্ষর শ্রমজীবীর আমদানী জার্ম্মাণ কৃষিকার্য্যের অমঙ্গলজনক লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; জার্ম্মাণী যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন আদর্শ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ক্ষতিস্বীকার করিতেও প্রস্তুত ইহাতে যে সেই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বনই ক্ষুণ্ন হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

কিন্তু জার্ম্মাণীর কৃষিকার্য্যে আর এক বিপদ দেখা দিয়াছে। বিভাগের বাহুল্যে লাভের মাত্রা কমিয়া যাইতেছে। এই বিপদের নিবারণোপায় অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষে এই বিভাগবাহুল্যে এক এক জন কৃষকের অংশে যে জমী পড়ে,তাহাতে তাহার গরু রাখিয়া চাষ পোষায় না—ভিন্ন ভিন্ন মাঠে এক এক জনের জমী পড়ে, তাহাতেও নানারূপ অসুবিধা ঘটে। জাপানেও অবস্থা এইরূপ। অর্থাৎ যে সব দেশে জমী পতিত নাই সে সব দেশে উত্তরাধিকারবিধিতে জমী সকল পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইলে এইরূপ ঘটিবেই। তাই ভারতে ও জাপানে ছোট ছোট ক্ষেত্রে চাষ করিয়া কৃষক অধিক লাভবান হইতে পারে না। আবার মার্কিণ প্রভৃতি যে সব দেশে পতিত জমী অনেক, সে সব দেশে বড় বড় কৃষিক্ষেত্রে কলে চাষ হয়—তাহাতে যে পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তাহা যোগান সাধারণ কৃষকের সাধ্যাতীত। তাই কৃষকগণ ভূমিশূন্য শ্রমজীবীতে পরিণত হয়—"ধনী"র সঙ্গে শ্রমজীবীর যে বিবাদে য়ুরোপের শিল্প ব্যবসা বিপন্ন সেই বিবাদের সৃষ্টি হয়। এই স্থলে আমরা একটি বিষয়ে অনেকের ভ্রান্তবিশ্বাসের উল্লেখ করিব। এ দেশে অনে-

কের বিশ্বাস, কলের প্রচলন যত বাড়ে,শ্রমজীবীর প্রয়োজন তত কমে। বিলাতেও এই বিশ্বাসবশে শ্রমজীবীরা কলের আবিষ্কারে শঙ্কিত হইয়া কলের আবিষ্কারককে বিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার কলকারখানায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, কলে শ্রমজীবীর প্রয়োজন কমে না—বাড়ে। কিন্তু কল প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রমজীবীর প্রয়োজন বাড়িলেও তাহাতে একটা অসুবিধা হয়। তাহাতে শিল্পীর স্থানে মজুরের প্রাদুর্ভাব হয়—মানুষও কলেই পরিণত হয় ; শিল্পী তাহার আপনার কাযের নিয়ন্তা,— শ্রমজীবী সর্ব্বতোভাবে মনিবের অধীন,—তাহার নিয়মে চলিতে বাধ্য। সে নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত আর কিছুই পায় না—লাভ সবই "ধনীর"। এই জন্যই য়ুরোপে মধ্যে মধ্যে শ্রমজীবীদের সহিত "ধনীদিগের" বিবাদ বাধে, ধর্ম্মঘট হয়, রক্তারক্তি হইয়া যায়।

উত্তরাধিকারে পিতার সম্পত্তি সন্তানদিগের মধ্যে সমভাগে বিভাগের ব্যবস্থাই যে ফরাসীদিগের দারিদ্র্যবৃদ্ধির শঙ্কাহেতু বিবাহে আপত্তির কারণ, এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। কোন কোন জার্ম্মাণ লেখক বলিয়াছেন—ফ্রান্সের জনসংখ্যা-হ্রাসের তাহাই অন্যতম কারণ। লর্ড কাসলরিয়ে না কি একবার বলিয়াছিলেন, উত্তরাধিকার-ব্যবস্থাতেই ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ হইবে, সে জন্য আর কাহারও কোন্ চেষ্টা করিতে হইবে না।

জার্ম্মাণ কৃষিসম্বন্ধে কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়মের কথা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভন রুমকার বলিয়াছেন, জার্ম্মাণীতে যদি জার্ম্মাণদিগের খাদ্য উৎপন্ন না হয়—যদি খাদ্যদ্রব্যের জন্য জার্ম্মাণীতে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়, তবে জলে ও স্থলে তাহার সেনাবলবৃদ্ধি—আর তাহার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সবই জলবিম্বের মত সহসা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

পাঠক দেখিবেন, মলকের কথা ও ভন রুমকারের কথা একই প্রকার। উভয়েই বলেন, খাদ্যসম্বন্ধে জার্ম্মাণীতে সর্ব্বপ্রকারে স্বাবলম্বী করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। তাই চেষ্টার ফলে জার্ম্মাণীতে শস্যের ফলন শতকরা ১৫ ভাগ ও মাংসের উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ বাড়িয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে রিষ্টাগে কাউণ্ট সরিন-লোইজ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, এখন জার্ম্মাণীকে বৎসরে বিদেশ হইতে যে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয়, সে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য অনায়াসে দেশে উৎপন্ন করা যাইবে। বাস্তবিক চেষ্টায় জার্ম্মাণীর ক্ষেত্রে ফলন বাড়িয়াছে।

কৃষিপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া, উন্নতি করিয়া, জার্ম্মাণীতে খাদ্যশস্যের পরিমাণবৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু ডাক্তার ক্রষ্টপ্রমুখ কতিপয় বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান ফলে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যতই কেন চেষ্টা হউক না জার্ম্মাণীতে বিদেশ হইতে গম আমদানী বন্ধ করিবার মত গম উৎপন্ন করা যাইবে না। প্রকৃতির প্রতিকূলতা প্রহত করা অসম্ভব। জার্ম্মাণীতে জমীর ও জলবায়ুর অবস্থাবিবেচনা করিয়া তাঁহারা এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে মাংসের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা ব্যর্থও হয় নাই। ১৯০৪ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে মাংসের সরবরাহ যে হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ তাহাতে এ বিষয়ে জার্ম্মাণীকে আর পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে না বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আবার দেশে মাংসের অভাব হইয়াছিল এবং জার্ম্মাণ সরকার আমদানীর সুবিধা করিয়া দিয়া ও রেলভাড়া কমাইয়া দেশে মাংসসরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে সরকারের কথায় একটু সন্দেহও যে না হয় এমন নহে। বিশেষ

বর্ত্তমান যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, অন্যান্য দেশকে ভুলাইবার জন্য জার্ম্মাণ সরকার অপ্রকৃত বিবরণ প্রচার করিতেও ক্রটি করেন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত প্রচার করা সম্ভব নহে।

জার্ম্মাণ সরকার সর্ব্বপ্রযত্নে জার্ম্মাণীকে খাদ্যদ্রব্যসম্বন্ধে জগতের বাজারের "উঠতি পড়তি" হইতে অব্যাহতি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফলে জার্ম্মাণীতে খাদ্যদ্রব্যের দাম চড়িয়াছে—পড়ে নাই। বিশেষ যে সব স্থান শিল্পপ্রধান এবং কৃষিক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত সে সব স্থানে খাদ্যদ্রব্যের দাম অত্যন্ত বাড়িয়াছে। কাযেই জার্ম্মাণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খাদ্যশস্য ভিন্ন ভিন্ন দরে বিকায়। এই অবস্থার প্রতীকার-কল্পে জার্ম্মাণ সরকার দেশে মাল পাঠাইবার সুবিধা করিবার জন্য খাল কাটাইয়াছেন—লাইট রেলওয়ে স্থাপিত করিয়াছেন। যাহাতে সর্ব্বত্র শস্য প্রায় একই দরে বিকায় তাহাই সরকারের অভিপ্রেত। আবার দর কমাইবার জন্য সরকার ক্রেতা ও কৃষক উভয়ের মধ্যবর্ত্তী "বেপারীর" লাভের ভাগ কমাইবার চেষ্টাও করিয়াছেন; যাহাতে গৃহস্থ সরাসরি কৃষকের কাছ হইতে শস্যাদি ক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল মূল্যের হ্রাসেই সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সে জন্য ফলন বাড়াইয়া দাম কমাইতে হইবে—সঙ্গে সঙ্গে জমীর উর্ব্বরতাহানির প্রতীকার করিতে হইবে। কৃষিকার্য্যে কলের যন্ত্রের, বিশেষ বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্রের, প্রবর্ত্তনে এই উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইতেছে। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, দশ বৎসরে জার্ম্মাণীতে মাড়াই কলের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার হইতে ৫ লক্ষ হইয়াছে—অর্থাৎ দ্বিগুণে দাঁড়াইয়াছে; আর কলের লাঙ্গলের সংখ্যা ১ হাজার ৭ শত হইতে ৩ হাজার ১ শত হইয়াছে। একদিকে কলের ব্যবহার যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে

—অপর দিকে সারের ব্যবহারও তেমনই বাড়িয়াছে। জার্মাণীতে কৃত্রিম উপায়ে সার প্রস্তুত করা হয়। বৎসর বৎসর শস্য উৎপাদনের ফলে জমীর উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস হয়, সেই ক্ষতিপূরণের জন্য সার ব্যবহার করিতে হয়। এ কথা সকল দেশের কৃষকরাই বুঝে। তাই যে সব স্থানে জমী পতিত থাকে সে সব স্থানে দুই তিন বৎসর চাষের পর জমী এক বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়। আমাদের দেশে ইহাকে জমী "পচান দেওয়া" বলে। নদীমাতৃক বাঙ্গালায় পূর্ব্বে যখন নদী বহতা ছিল, তখন বর্ষার জলে পরিপুষ্ট প্রবাহ তীর অতিক্রম করিয়া ক্ষেত্রে পলি ফেলিয়া যাইত—প্রকৃতি সার সরবরাহ করিয়া জমীতে সোণা ফলাইতেন। এখন সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—নদী মজিয়া যাইতেছে—বন্যা আর আইসে না। এখন জমীতে আর সার না দিলে ফলন কমিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ কথা বুঝিয়াও এ দেশের কৃষক অর্থের অভাবে জমীতে সার দিতে পারে না। তাহার সম্বলের মধ্যে শীর্ণ গরুর সামান্য গোময়; তাহাও অনেক সময় তাহাকে ইন্ধনরূপে ব্যয় করিয়া ফেলিতে হয়। ফলে জমীতে ফসল কম হয়, দারিদ্র্যের জন্য দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হয়।

কেবল ভারতে নহে-ইংলণ্ডেও দারিদ্র্যহেতু কৃষকের নানারূপ অসুবিধা হয়। তবে ইংলণ্ডে এত দিন কৃষির উন্নতিচেষ্টা তেমন হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় সে অবস্থার প্রতীকারের বিশেষ চেষ্টাও হ নাই। জার্ম্মাণী কৃষককে আবশ্যক অর্থ যোগাইবার জন্য দেশে বহু সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রায় ২৫ হাজার সমিতি ছিল; সে সকলের সদস্যসংখ্যা—৪০ লক্ষ। তাহার মধ্যে ৩ হাজার ১ শত ৯৩টি গোশালা-সেগুলির সদস্যসংখ্যা ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬ শত ৯৯। কিছু দিন হইতে এ দেশেও কৃষকদিগের সাহায্যের

জন্ম সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এ দেশের কৃষকের দারিদ্র্য যে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে তাহার সর্ব্বনাশ আসন্ন দেখিয়া সরকার প্রজারক্ষার্থ প্রজাকে মহাজনের ঋণ হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টায় এই সব সমিতির প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেখাইতেছেন। ইহাতে দেশের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা। জার্ম্মাণীতে এই সব সমিতির সাহায্যে কৃষকগণ কৃষিকার্য্যে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিয়াছে। ইহাতে তাহারা পদ্ধতিবদ্ধভাবে কার্য্য করিয়া লাভবানও হইয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতে যত চেষ্টাই কেন করা হউক না, শিল্প-প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব অনিবার্য্য; এখনও বহুদিন ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানই থাকিবে। সুতরাং এ দেশে কৃষির উন্নতিসাধন ব্যতীত দারিদ্র্য দূর হইবে না।

জার্ম্মাণীতে কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধাদির ও চিনির মূল্যের মোটা-মুটী একটা হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—দুগ্ধাদি বার্ষিক ২১৩ কোটী টাকার; চিনি বার্ষিক ৪৬ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা গিয়াছিল, জার্ম্মাণীতে বৎসরে সর্ব্ববিধ কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য ৫৬১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্বে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, সে সব দ্রব্যের মোট মূল্য ৯০০ কোটী টাকা। দশ বৎসরে এরূপ বৃদ্ধি বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। সত্য বটে, এই দশ বৎসরে জার্ম্মাণীতে কৃষির সকল বিভাগে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে,—জার্ম্মাণ সরকার জগৎব্যাপী প্রভুত্বপ্রতিষ্ঠার দুরাশা-চালিত হইয়া সমরঘোষণার জন্ম জার্ম্মাণীতেই জার্ম্মাণদিগের খাদ্যোৎ-পাদনের জন্ম অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও দশ বৎসরে এইরূপ পরিবর্ত্তনে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, অতিরঞ্জনের ফেনপুঞ্জতলে সন্ধান

করিলে সত্যের সে সলিলধারা পাওয়া যাইবে, তাহাও শীর্ণ নহে। জার্ম্মাণী বিজ্ঞানবলে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে স্বীয় অবস্থাপরিবর্ত্তন করিয়া কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে, মানুষের আন্তরিক চেষ্টায় এ বিষয়ে কিরূপ উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে, তাহা দেখাইয়াছে। এ বিষয়ে জার্ম্মাণীর কাছে কৃষিপ্রধান ভারতের অনেক শিখিবার আছে।

শিল্প ও বাণিজ্য।

জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য যতই কেন আপত্তিজনক হউক না, জার্ম্মাণী যে কেবল সেনাবিভাগে ও নৌবিভাগে নহে, পরন্তু সর্ব্ব কার্য্যে অসাধারণ পদ্ধতিবদ্ধ শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই শৃঙ্খলা জার্ম্মাণীর সর্ব্বব্যাপী সৈনিক শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল কি জার্ম্মাণদিগের প্রকৃতিগত তাহা বলা সম্ভব নহে। তবে জার্ম্মাণীর শিক্ষাপ্রণালী যে তাহার পরিপুষ্টির পরিপোষক হইয়াছে,তাহা অস্বীকার করা যায় না। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই জার্ম্মাণ যুবক আপনার ভবিষ্যৎ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়—তাহাই অনিবার্য্য বোধে তাহার জন্য প্রস্তুত হয় এবং তাহার আয় হিসাব করিয়া থাকে। এক জন মার্কিণ লেখক জার্ম্মাণীর অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছেন, অধিকাংশ জার্ম্মাণ উপার্জ্জনের আরম্ভ হইতে পেনসনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের আয় পূর্ব্বেই হিসাব করিতে পারে। ইহাতে মানুষের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিনাশ হয়; কিন্তু অসন্তোষের বিকাশ নিবারিত হয়। জার্ম্মাণ সরকারের ইহাই অভিপ্রেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত অসন্তোষ অধিকাংশ স্থলে মানুষের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে; সে হিসাবে তাহার বিকাশই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু জার্ম্মাণ সরকার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আত্মসাৎ করিয়া বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত

হইয়াছেন; আর সেই জন্ম ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিনাশ সংসাধিত করিয়া দেশে অসন্তোষব্যাপ্তির সম্ভাবনা দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন ব্যক্তির ক্ষতি জার্ম্মাণ সরকার অনেক প্রকারেই করিয়াছেন। জার্ম্মাণ সরকারের কাছে ব্যক্তিরা বিরাট যন্ত্রের অংশ মাত্র—তাহাদের স্বাধীনতা যত ক্ষুণ্ণ করা যায়, ততই মঙ্গল—তাহাদের আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দিয়া নিশ্চিন্তভাবে নির্দ্দিষ্ট কায করাইয়া লইতে হইবে। এই জন্যই জার্ম্মাণীতে প্রথম বীমা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহা প্রজার প্রতি দয়াহেতু নহে—কৃত্রিম উপায়ে দেশে সন্তোষসংরক্ষণচেষ্টায়। এ বিষয়ে ভালই হউক আর মন্দই হউক জার্ম্মাণ সরকারের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে—জার্ম্মাণ সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। রাজনীতিক সভাসমিতিতে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাতেও যে সব সভাসমিতিতে অনেক সময় রক্তপাত হয়, জার্ম্মাণীতে সে সব সভাসমিতিতে কোনরূপ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় না। নায়কদিগের ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া রাজনীতিক সভায় বক্তৃতা শুনে—সরকারের ব্যবস্থার সমর্থক বা প্রতিবাদপ্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণ করে—গৃহে ফিরিয়া যায়। বিশৃঙ্খলা নাই—চীৎকার নাই—শান্তিভঙ্গ নাই; যেন শিক্ষিত সেনাদল কুচকাওয়াজ করিতেছে। হয় ত এই জন্যই জার্ম্মাণ সরকার কোন ব্যবস্থায় লোকের প্রতিবাদ সহজে গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু ইহাতে জাতির শিক্ষাজাত ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। বোধ হয় এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে জার্ম্মাণ সরকার এই যুদ্ধের সময় লোক গণিয়া টিকিট দিয়া লোককে কোনরূপে প্রাণধারণোপযোগী আহার্য্য দিবার ব্যবস্থা করিতে সাহস করিতেন না—সেরূপ ব্যবস্থায় ক্ষিপ্ত জনগণ সরোষে সরকারের শাসন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা করিত। আর কোন জাতি

দুরাশাদুঃস্বপ্নচালিত সরকারের এমন অনাচার সহ্য করিত কি না সন্দেহ।

শিল্পবাণিজ্যব্যাপারে এই শৃঙ্খলাশিক্ষার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোন বিষয়েই পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণীর শিল্পবাণিজ্য-বিস্তারব্যাপার বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আমরা এক্ষণে ইহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই বিস্তারের পরিমাণ ১৮৯০খৃষ্টাব্দ হইতে বর্দ্ধিত হয় এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিস্তার দ্রুত হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে খণ্ডরাজ্য ভাঙ্গিয়া জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যসংগঠন হইতেই দেশে প্রতিযোগিতাহেতু জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগকে পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উন্নতি সাধনও করিতে হয়। ইতিহাসাংশে আমরা জুলভেরিণের কথা বলিয়াছি। সেই শুল্কসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পরই—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে জার্ম্মাণ শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হইবার কথা। কারণ, সেই সময় হইতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংযোগপথ প্রস্তুত হয়; রেলপথের বিস্তার হয়। কিন্তু জার্ম্মাণসাম্রাজ্য সংগঠিত হইয়া সমগ্র-দেশে সামরিক একতা স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা ঘটে নাই। আর সেই একতাস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মাণীর উন্নতির আর দুইটি কারণ ঘটে। প্রথম—কল ও যান চালাইতে এবং আলোকার্থ বিদ্যুতের ব্যবহার; দ্বিতীয়—রাসায়নিক উপায়ে বস্তুর উৎপাদন। বাস্তবিক জার্ম্মাণীতে বিজ্ঞানচর্চ্চাহেতুই ব্যবসার উন্নতি অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

মিষ্টার ই, বি, হাউয়ার্ড জার্ম্মাণীর ব্যবসাবিস্তারের কারণ ও পরিমাণবিষয়ে যে পুস্তক-রচনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখাইয়াছেন, জার্ম্মাণীর ব্যবসাবিস্তার প্রথমতঃ দেশে মাল সরবরাহের উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল,

বিদেশে মাল রপ্তানীর জন্য নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বপ্রযত্নে স্বদেশেই স্বদেশের প্রয়োজনানুরূপ মাল উৎপন্ন করা জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ; স্বদেশে মাল যোগাইয়া অতিরিক্ত মাল বিদেশে পাঠান হয়।

জার্ম্মাণ জিনিষ সস্তা—জগতে অধিকাংশ লোক সস্তা জিনিষেরই সন্ধান করে। তাহাই বুঝিয়া—অধিকাংশ লোক যেরূপ মাল চাহে, জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা সেইরূপ মাল সরবরাহেই সচেষ্ট হইয়াছে। তাহাতে জিনিষ খারাপ হওয়া অনিবার্য্য হইলে তাহারা খারাপ জিনিষই যোগাইয়াছে। উৎকৃষ্ট বিলাতী জিনিষের অনুকরণে খারাপ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া—তাহাই দিয়া জার্ম্মাণী প্রথমে স্বদেশের বাজার একচেটিয়া করিয়াছে, তাহার পর বিদেশে মাল যোগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ কথা জার্ম্মাণ লেখকগণও স্বীকার করিয়াছেন।

সস্তায় জিনিষ যোগান দিবার সঙ্গে সঙ্গে রেলপথবিস্তারহেতু মাল পাঠাইবার সুবিধা হওয়ায় জার্ম্মাণী স্বদেশের বাজার হইতে বিদেশী পণ্য তাড়াইতে পারিয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের রেলপথের পরিমাণ সর্ব্বদাই জার্ম্মাণীর রেলপথের পরিমাণের দ্বিগুণ ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দেও জার্ম্মাণী অপেক্ষা ইংলণ্ডে ৪ হাজার মাইল অধিক রেলপথ ছিল, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ১৭ বৎসরে বিলাতে কেবল ৪ হাজার মাইল রেলপথ পাতা হয়, আর জার্ম্মাণীতে ২৩ হাজার মাইলেরও অধিক রেলপথ প্রস্তুত হয়। ইহার ১০ বৎসর পরে জার্ম্মাণীর রেলপথের পরিমাণ বিলাতের রেলপথের পরিমাণের দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য সংগঠনের পর হইতেই জার্ম্মাণী রেলপথবিস্তারে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সেই রেলবিস্তারই জার্ম্মাণীর ব্যবসাবৃদ্ধির

অন্যতম কারণ। আবার রেলপথবিস্তার অন্য কারণেও জার্ম্মাণীর পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছিল। সামরিক একতানিবন্ধন সমগ্র সাম্রাজ্যে সেনা-পরিচালনের সুবিধার জন্য রেলপথবিস্তার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য আর্থিক লাভের আশায় রেলপথবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। জার্ম্মাণীর অধিকাংশ রেলপথই সরকারী—সরকার ঋণ করিয়া ইহার জন্য মূলধন যোগাইয়াছেন। বিসমার্ক প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রেলপথ পরিচালনভার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বিভক্ত না হইয়া সাম্রাজ্যের বলিয়া গণিত হউক। কিন্তু আর্থিক ক্ষতির আশ-ঙ্কায় দক্ষিণ জার্ম্মাণ রাজ্যসমূহ সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেন নাই; তাই সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

রেলপথ সরকারের অধীন থাকার অনেক সুবিধা। সেই সব সুবিধা বুঝিয়াই বিসমার্ক পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সে প্রস্তাব গৃহীত না হইলেও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই প্রাসিয়া স্বাধিকারস্থ রেলপথ সরকারী করিয়া লয়। ইহাতে সরকারের একটা নূতন আয়ের পথ প্রস্তুত হইয়াছে এবং সরকার দরকার হইলেই ব্যবসায় সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। যখন দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য নৌকাগঠনের প্রয়োজন হয়, তখন নৌকানির্ম্মাণের উপকরণ সরবরাহের সুবিধার জন্য সে সব জিনিষের ভাড়ার হার কমাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেইরূপ যখনই কৃষির কোন বিভাগের সাহায্য করা প্রয়োজন হয়, তখনই ভাড়ার হার কমাইয়া সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষিকার্য্যের সাহায্যদান প্রাসিয়ার রেলপথের বিশেষ উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিতও হয়। ভারতবর্ষেও রেল-পথে সরকারের অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব আছে। কিন্তু এত দিন ব্যবসা-ব্যাপারে সে ভাড়ার হার কমাইয়া দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার দিকে সরকার

তেমন মন দেন নাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, ইংলণ্ড অবাধবাণিজ্য-নীতির সমর্থক বলিয়া সেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। কিন্তু য়ুরোপীয় মহাসমরে পূর্ব্বাবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। এই যুদ্ধের ফলে অনেক পুরাতন মত পরিত্যক্ত হইবে, অনেক পরিত্যক্ত মতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে। যুদ্ধের আরম্ভেই দেখা গিয়াছিল, জগতে বর্ণের ব্যবসা জার্ম্মাণী একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল বলিয়া রং না পাওয়াতে অনেক ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সেই জন্য বিলাতে সরকারী সাহায্য দিয়া বর্ণের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবও হইয়াছিল। মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ সত্যই বলিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে সমাজের ও ব্যবসার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে—এই ঘূর্ণীবায়ুতে সমাজের বহু অলঙ্কারতরু উন্মূলিত হইবে—এই ভূমিকম্পে য়ুরোপীয় জীবনের মহীধরও বিচলিত হইবে। "If you will carefully watch what is going on in the belligerent lands you will find that this war is bringing unheard-of changes in the social and industrial fabric. It is a cyclone which is tearing up by the roots the ornamental plants of modern society and wrecking some of the flimsy trestle-bridges of modern civilisation. It is an earthquake which is upheaving the very rocks of European life." এবার ব্যবসা-সম্বন্ধে ইংলণ্ডের মত পরিবর্ত্তিত হইবেই। সেই জন্যই ভারতসরকার এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছেন। সেই জন্যই যে সব বিদেশী জিনিষের আমদানী এ দেশে অধিক, এ দেশে সে সব জিনিষ কেমন হয় ও হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য সরকার সহরে সহরে প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর সেই জন্যই ভারত-সরকার এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠাকল্পে উপাদানের ও পণ্যের ভাড়া কমাই-

বার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য হইলে যে আমাদের বিশেষ উপকার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জার্ম্মাণীতে রেলপথ সরকারের হস্তগত হওয়ায় ব্যবসাবিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে খালখননেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যসাধনার্থই জার্ম্মাণীতে খাল খনিত হইয়াছে। পাঠকগণকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না, ভারতবর্ষে রেলপথ অপেক্ষা খালে সরকারের লাভ অধিক। খালের দ্বারা ভারতের নানা স্থানে—বিশেষতঃ পঞ্চনদে উষরভূমি উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে—দেশে অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়াছে—নির্জ্জন প্রদেশ জনাকীর্ণ হইয়াছে। রেলপথ ও খাল উভয়েরই অসুবিধা আছে। লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়াছেন, গোলাপ যেমন কণ্টকশূন্য হয় না—খালও তেমনই অমঙ্গলশূন্য নহে। রেলে ও খালে দেশে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হয়—শুষ্কভূমি আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়—স্বাস্থ্যকর স্থান অস্বাস্থ্যকর হয়। এ সবও সত্য। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সব কথা আমাদের আলোচ্য নহে।

জার্ম্মাণীর উত্তর-পূর্ব্বভাগে সমতল প্রান্তরের অভাব নাই। তাহাতে খালখননের বিশেষ সুবিধাও হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া বা অন্য উপায়ে জলপথ-বিস্তারের যে সব প্রস্তাব হইয়াছে সে সব ব্যয়বাহুল্যহেতু কখনও সংসাধিত হইবে কি না সন্দেহ। খালখনন লইয়া কৃষকদিগের সহিত প্রাসিয়ান সরকারের বিবাদও বাধিয়াছিল। কৃষকরা মনে করিয়াছিল, বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের সহিত কৃষিকেন্দ্রসমূহের সংযোগে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে না; —পরন্তু বিদেশের সস্তা মালের আমদানীতে তাহাদের কেবল অপকারই হইবে। তখনও তাহারা জার্ম্মাণ সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই—বুঝিতে পারে নাই, বিদেশ হইতে

শস্য আনাইয়া লোককে যোগান জার্ম্মাণ সরকারের অভিপ্রেত নহে।

বিজ্ঞানচর্চ্চার সহিত ব্যবসাবুদ্ধির সংযোগে জার্ম্মাণীর রাসায়নিক পণ্যের ব্যবসা অসাধারণ উন্নতি ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। জার্ম্মাণী যে দেশের লোককে বৈজ্ঞানিক ও কারীগরী শিক্ষা দিয়াছে তাহারই ফলে এ দিকে জার্ম্মাণীর সাফল্য। যে নীলের ব্যবসা এককালে ভারতের একচেটিয়া ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই নীলের ব্যবসায় ইহার প্রমাণ পওয়া যাইবে। আজ যেমন আমরা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, পাটের জন্য সমগ্র জগৎবাসীকে বাঙ্গালীর দ্বারস্থ হইতে হয়—শত বর্ষপূর্ব্বে তেমনই আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারিতাম, নীলের রং লইবার জন্য সকল জাতিকে আমাদের শরণ লইতে হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণী আমাদের সে ব্যবসার এমনই সর্ব্বনাশ করিয়াছে যে, নীলবিদ্রোহের কথা আজ বাঙ্গালীর কাছে ইতিহাসবদ্ধ সুদূর অতীতের ঘটনা বলিয়াই প্রতীত হয়। বাঙ্গালার নানা স্থানে—নানা পল্লীতে আজও নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ স্বচ্ছন্দজাত লতাগুল্মের মধ্যে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। আর দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' নীলের কথা বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়া আছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মুনিক সহরে ডাক্তার বেয়ার নামক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক কৃত্রিম উপায়ে নীল রং প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করেন। তাহার কয় বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণী বৎসর বৎসর ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার নীল ক্রয় করিত। আর তাহার কয় বৎসর পরেই জার্ম্মাণী এক বৎসরে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার কৃত্রিম নীল রপ্তানী করিয়াছিল। পূর্ব্বে গ্যাস ও কোক কয়লা প্রস্তুত করিবার সময় যে সব উপাদান অব্যবহার্য্য বলিয়া ফেলিয়া দিতে হইত এখন জার্ম্মাণীতে সেই সব উপাদান হইতেই

বৎসরে ৯ কোটী টাকার রং প্রস্তুত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রাসায়নিক উপায়ে জিনিষ উৎপন্ন করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে ১ শত ৫০টি লিমিটেড কোম্পানী ছিল। সেই সব কোম্পানীর মূলধন—৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ঐ বৎসর কোম্পানীর আনুমানিক লাভও শত করা ২০ টাকা হিসাবে হইয়াছিল। এই সব হিসাব হইতে জার্ম্মাণীতে এ ব্যবসার বিস্তার বুঝা যাইবে।

এই রাসায়নিক উপায়ে জিনিষ প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় প্রায় লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। বার্লিনে এইরূপ একটি রং প্রস্তুত করিবার কারখানায় ৫৫জন রসায়নবিদ্ বৈজ্ঞানিক ও ২১ জন বিশেষজ্ঞ কায করিয়া থাকেন। আর একটি কারখানায় বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা ১ শত ৪৮ জন। এই সকল হইতে এই সব কারখানার কাযের পরিমাণ অনুমান করা যাইতে পারে। জার্ম্মাণীতে সারের জন্য প্রচুর পটাশ (Potash salts) প্রস্তুত করা হয়। এ ব্যবসায় জার্ম্মাণীর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেই হয়। জার্ম্মাণী হইতে বৎসরে ৯ কোটী টাকার সার রপ্তানী হয়—সে সার অন্যান্য দেশে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সব ব্যবসাতেই জার্ম্মাণী প্রথমে স্বদেশের প্রয়োজনানুরূপ মাল যোগাইয়া পরে বিদেশে মাল পাঠাইয়া অর্থলাভ করে।

বিলাতের মত জার্ম্মাণীরও লৌহের ও ইস্পাতের ব্যবসাই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিলাতে যেমন লৌহের ও কয়লার খনি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় লৌহ গলাইয়া মাল প্রস্তুত করিবার বিশেষ সুবিধা আছে, জার্ম্মাণীতে তেমন নাই। তবুও যে জার্ম্মাণী লৌহের ও ইস্পাতের ব্যবসায় লাভ করিতে পারে, তাহার কারণ—জার্ম্মাণীর রেলপথ সরকারের অধীন, সরকার ইচ্ছা করিয়া এই ব্যবসার উন্নতি সাধনোদ্দেশে খনিজ লৌহ ও কয়লা এবং লৌহের ও ইস্পাতের জিনিষ কম ভাড়ায়

পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আবার জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সময়েই তথায় টমাস-গিলক্রাইষ্ট প্রণালী নামে পরিচিত প্রণালীর আবিষ্কার হয়। সে প্রণালীতে কায করিয়া এ ব্যবসায়ের অনেক উন্নতিসাধন সম্ভব হইয়াছে। লোরেনে ও সিলেসিয়ায় লৌহের ও কয়লার খনি আছে—তাই সে সব স্থানে ব্যবসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জার্ম্মাণীতে রৌপ্য, স্বর্ণ, সীস, তাম্র ও দস্তা পাওয়া যায়। তথায় "সৈন্ধবলবণ"ও পাওয়া যায়। তবে সে সকলের পরিমাণ সামান্য। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যে রৌপ্য, সীস ও দস্তা খনি হইতে তুলা হইয়াছিল তাহার মোট মূল্য ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির ব্যবসায়ও জার্ম্মাণীর উন্নতি অসাধারণ বলিতে হইবে। এই ব্যবসাতে জার্ম্মাণীর লৌহের ব্যবসায়ও বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে এ ব্যবসার অস্তিত্বই ছিল না, আর এখন ৬০ হাজার লোক এই ব্যবসায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। বৎসর বৎসর ১২ কোটী টাকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি বিদেশে রপ্তানী হয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৎসরে বিলাতেই ১ কোটী ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বৈদ্যুতিক বাতির কাচের আবরণ (গ্লোব) বিক্রীত হইত। অষ্ট্রীয়ায়, রুশিয়ায়, ইটালীতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নানা যন্ত্রাদি রপ্তানি হইত। সকল বড় সহরেই বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী চলিত হওয়ায় যন্ত্রাদির ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। এক বার্লিন ব্যতীত আর সব জার্ম্মাণ সহরেই ট্রামগাড়ী মিউনিসিপ্যালিটীর। কৃষিকার্য্যে বিদ্যুতের বহুল ব্যবহার হইতেছে। বড় বড় কল হইতে দূরে কৃষককে আলোর ও কলের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। জার্ম্মাণীতে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যালয়সমূহে প্রদত্ত শিক্ষার সুফলে এই সব ব্যবসার উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে।

এ দেশে বিদ্যুতের দ্বারা উটজশিল্পপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কেহ কেহ দেখিয়াছেন। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হয় নাই। ভারতে কোন কোন স্থানে পার্ব্বতীয়া স্রোতস্বতীর প্রবাহে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া সহরে আলোক জ্বালাইবার ও কল চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এ দেশের আর শত শত নদীর প্রবাহ হইতে সেরূপ কার্য্য করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। এ দেশের জলবায়ু যেরূপ তাহাতে এ দেশে শ্রমজীবীদিগকে বড় বড় কারখানায় এক সঙ্গে বদ্ধ রাখিলে তাহাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা—এ দেশে পল্লীর আধিক্যই লোকের অবস্থার উপযোগী। কিন্তু উচ্চ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত পল্লীর সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হইতে পারে না। আর বিদ্যুতের ব্যবহার না হইলে সেরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠার উপায় নাই। জার্ম্মাণীতে যাহা হইয়াছে এ দেশে যদি ব্যবসায়ীদিগের সম্মিলিত চেষ্টায় তাহা হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে আবার পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি হইবে। নহিলে পল্লীর অবনতি অনিবার্য্য।

ইস্পাতের জিনিষ ও কলকব্জা প্রস্তুত করিতে জার্ম্মাণী অনুকরণে যেরূপ পটুত্ব দেখাইয়াছে, মৌলিকতায় সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। এ ব্যবসায় জার্ম্মাণীর সাফল্যের কারণ, অন্য দেশে কোনরূপ উন্নতির উপায় আবিষ্কৃত হইতে না হইতেই জার্ম্মাণী তাহা আত্মসাৎ করিয়াছে এবং এমন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে যে, নকল জিনিষ আসলের অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিতে পারিয়াছে। এই ব্যবসায় ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে।

কাপড়ের কল জার্ম্মাণীতে অধিক দিন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অল্পদিন পূর্ব্বেও জার্ম্মাণীতে হাতের তাঁতে কায হইত। গত শতাব্দীর শেষভাগেও এইরূপ তন্তুবায়ের সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল। তবে তাহারা রেশমী কাপড় প্রভৃতিই অধিক বুনিত। এখন জার্ম্মাণীর কাপড়ের

কলের কাযে ১০ লক্ষ লোক খাটিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে ৫ লক্ষ স্ত্রীলোক। যাঁহারা ভারতের কাপড়ের বাজারের সংবাদ রাখেন তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না, ভারতের বাজারে বিলাতী ধুতির ও উড়ানীরই বাহুল্য। এখনও তুলার কাপড়ে এ বাজারে বিলাতেরই প্রাধান্য। কিন্তু সস্তা শীতবস্ত্র জার্ম্মাণী হইতেই অধিক আসিয়া থাকে। শীতকালের উপযোগী সস্তা শীতবস্ত্র প্রায় সবই জার্ম্মাণ। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে কাবুলীরা যে সব "গা'র কাপড়" ধারে বেচিয়া লাঠি দেখাইয়া শেষে দাম আদায় করে সে সবই জার্ম্মাণ। এ ব্যবসায় জার্ম্মাণী আর সব দেশকে অবাধে পরাভূত করিতে পারিয়াছে।

কেবল ইহাই নহে, জার্ম্মাণীর সস্তা পশমের আমদানীতে পঞ্জাবের পশমের ব্যবসার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সস্তা শাল হয় জার্ম্মাণীর আমদানী—এ দেশে নক্সা বুনা, নহে ত জার্ম্মাণ পশমে এ দেশের তাঁতে বুনা। এমন কি শালের সস্তা পাড়ও জার্ম্মাণী হইতে আমদানী হইয়া এ দেশে শালে লাগান হয়। অথচ পশমী কাপড়ের ব্যবসা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও পঞ্জাবের একটা প্রধান ব্যবসা ছিল।

ধাতুর ব্যবসায় জার্ম্মাণীতে ১০ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হয়। যে ভারতে পিত্তল কাঁসার তৈজসপত্র প্রসিদ্ধ,ইদানী সেই ভারতেও জার্ম্মাণী হইতে সস্তা থাল, গেলাস আমদানী হইতেছিল। আর এ দেশের কাঁসারীরা জার্ম্মাণ পিত্তলের পাত কাটিয়া বাসন গড়িতেছিল। খাগড়ার বাজারেও জার্ম্মাণ পিত্তলের পাতের জিনিষের আমদানী হইয়াছে।

এক তামাকের জিনিষ প্রস্তুত করিতেই জার্ম্মাণীতে ১০ হাজার লোক লাগে।

আমেরিকায় ব্যবসায়ীসঙ্ঘ (Syndicate ও Trust) ছোট ছোট ব্যবসা গ্রাস করিয়া বিরাট ব্যবসার সৃষ্টি করিয়াছে। সে সব

ব্যবসার মূলধন অত্যন্ত অধিক—সুতরাং ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত দর চড়াইতে নামাইতে পারে—প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে হইলে লোকসান দিয়া কায চালাইতে পারে। জার্ম্মাণীতে অনেক স্থলে প্রয়োজনাতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন বন্ধ করিবার জন্যও এরূপ সঙ্ঘ সংস্থাপিত করিতে হইয়াছে। আর জার্ম্মাণীতে সঙ্ঘসমূহ উপাদান ও পণ্য উভয়ই একচেটিয়া করিয়া উপাদানবিক্রেতা ও পণ্যক্রেতা উভয়কেই সম্পূর্ণভাবে আপনাদের অধীন করিতে প্রয়াস পায় না। তথায় ছোট ছোট কোম্পানীগুলি স্বার্থরক্ষাকল্পে কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারে সঙ্ঘের অধীনতা স্বীকার করিয়া কার্য্য করে। জার্ম্মাণীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ও সামরিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যে লোকের পক্ষে বাধ্যতা যেন স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাসিয়ার শাসনপ্রাণালী ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিয়া দেয়। কাযেই জার্ম্মাণীতে ব্যবসাব্যাপারে ব্যবসায়ীরা সঙ্ঘের নির্দ্দেশ অবাধে পালন করিয়া থাকে। যে দেশে দিন দিন কলের উন্নতি হইতেছে সে দেশে শ্রমজীবীরাও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া কলেরই দশা প্রাপ্ত হয়। তাহারা কলের অংশেরই মত চালিত হয়। জার্ম্মাণীতে তাহাই হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সঙ্ঘের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ—তাহাদের চেষ্টায় জার্ম্মাণ জিনিষ দেশ অপেক্ষা বিদেশে সস্তায় বিক্রীত হয়,অর্থাৎ তাহারা দেশে পণ্যের মূল্য চড়া রাখিয়া লাভ করিয়া বিদেশে সস্তায় মাল বিক্রয় করে;—বিদেশের ব্যবসা নষ্ট করিয়া প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ করে। এ অভিযোগ ভিত্তিহীন নহে। তবে ইহার মূলে সরকারী সাহায্যও সপ্রকাশ। আর সঙ্ঘের পক্ষপাতীরা বলেন, সঙ্ঘ সংগঠিত না করিলে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের ফলে দেশেই প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়—আত্মকলহে আপনারাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হয়। এমন

কথাও বলা হইয়া থাকে যে, কোম্পানী বড় না হইলে শ্রমজীবিগণকে সুবিধাদান অসম্ভব হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ক্রুপের কারখানার উল্লেখ করা হয়। তাহাতে শ্রমজীবিগণের পেন্সন, আবাস, আরাম—এ সকলের যেরূপ ব্যবস্থা আছে সেরূপ ব্যবস্থা তাহারা আইনতঃ পাইবার আশাও করিতে পারে না। এই কথায় আবার প্রতিপক্ষ বলেন, বড় বড় কারখানায় তাহাদিগকে যে সব সুবিধা দেওয়া হয়—সব কারখানাতেই সেই সব সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রয়োজন হইলে সরকারকে অর্থসাহায্য করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ মতভেদ ও তর্ক কেবল জার্ম্মাণীতে নহে পরন্তু সমগ্র য়ুরোপে ও আমেরিকায় লক্ষিত হইতেছে। শ্রমজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই তাহারা ধনীর লাভের অংশ চাহিতেছে। তাহা লইয়া সভাসমিতি গঠিত হয়, বিবাদও বাধে। ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্মে এইরূপ বিবাদের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু প্রতীচীতে এখনও এই সব প্রশ্নে সমাজে বিপ্লব বাধিতেছে। প্রশ্নের মীমাংসা কবে ও কিরূপে হইবে কে বলিতে পারে?

জার্ম্মাণীতে যেমন জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর ও সঙ্ঘের সংখ্যাধিক্য হইতেছে, তেমনই—সঙ্গে সঙ্গে—আবার শ্রমজীবীদিগের সঙ্ঘও গঠিত হইতেছে। জার্ম্মাণীর শিক্ষাও আর তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ধনীদিগের অধীন রাখিতে পারিতেছে না। বিলাতের মত জার্ম্মাণীতেও তাহারা অধিকার লাভের জন্য ধর্ম্মঘট করিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে শ্রমজীবীদিগের ২ হাজার ৫ শত ৬৭টি ধর্ম্মঘট হইয়াছিল—১০ হাজার কারখানার ৬ লক্ষ শ্রমজীবী সে সব ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছিল। তবে জার্ম্মাণীতে এ সব ব্যাপার নূতন; সেই জন্য য়ুরোপের অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশের মত তথায় শ্রমজীবীদিগের সম্মিলিত চেষ্টার বিরুদ্ধে আবার ধনীদিগের প্রবল সঙ্ঘ সংস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু সমগ্র

প্রতীচ্য জগতের অর্থনীতিক সমস্যা যখন একই রূপ ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে—শ্রমজীবীদিগের সহিত ধনীদিগের বিরোধ যখন বাধিবেই, তখন জার্ম্মাণীতেও ক্রমে উভয় দলের প্রবল সঙ্ঘ সংস্থাপিত হইবে—আর দুই দলের বিবাদে মধ্যে মধ্যে সমাজে বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে য়ুরোপের ও মার্কিণের চক্ষু ফুটিবে কি না জানি না। কিন্তু এই যুদ্ধে কেবল সমাজে শান্তিরক্ষার জন্য নহে, পরন্তু দেশের ধনরক্ষার জন্য উটজশিল্পের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক একটা গোলায় বা বোমায় এক একটা কারখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়—কোটী কোটী টাকা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। কিন্তু এক একটা প্রদেশ জনশূন্য না করিতে পারিলে কোন দেশের উটজশিল্প নষ্ট হইতে পারে না। আর বড় বড় কলকারখানা সংস্থাপিত করিতে যেরূপ মূলধনের প্রয়োজন, এই মহাসমরের অবসানে কতগুলি দেশে সেরূপ অর্থের স্বচ্ছলতা থাকিবে ?

জার্ম্মাণীর শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এইটুকু বলিয়া আমরা আর একটু অগ্রসর হইব। কিছু দিন পূর্ব্বে মিষ্টার উইলিয়ামস 'নিউ রিভিউ'পত্রে জার্ম্মাণীর ব্যবসাবিস্তারে বিলাতের ক্ষতি দেখাইয়া কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সেই সকল প্রবন্ধ পরিবর্দ্ধিত হইয়া Made in Germany নামক পুস্তকের আকারে প্রচারিত হয়। পুস্তকখানির আরম্ভেই লেখক বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ব্যবসায় ইংলণ্ডের প্রাধান্য যেন স্বতঃসিদ্ধ ছিল—এখন তাহা মিথ্যা হইয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডের সে প্রাধান্যগৌরব বিলুপ্ত হইতেছে ; কিন্তু ইংলণ্ড তাহা বুঝিতেও পারিতেছে না। এই কথা বলিয়া তিনি ব্যবসায় বিবিধ বিভাগে ইংলণ্ডের অবনতি ও জার্ম্মাণীর উন্নতি দেখাইয়া

—সে উন্নতির কারণ সন্ধান করিয়াছিলেন। পুস্তকখানিতে যে ত্রুটি বা অতিরঞ্জন ছিল না, এমন নহে। কিন্তু সে সকল ব্যবসার সকল বিভাগে সম্পূর্ণ হিসাব না পাওয়াতেই ঘটিয়াছিল। সে যাহা হউক, লেখকের আসল কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় তৎকালে ইংলণ্ডে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। লর্ড রোজবেরী প্রমুখ রাজনীতিকগণ সেই রচনার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; আর বিখ্যাত সম্পাদক মিষ্টার ষ্টেড সমগ্র পুস্তকের সারসংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকে সুপ্ত ইংলণ্ডে বিপদের তূর্য্য ধ্বনিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি মূল্যবান। আমাদের পক্ষে সে পুস্তকে জার্ম্মাণীর শিল্পের ও বাণিজ্যের ব্যবস্থা বুঝিবার যত সুবিধা হয়, তত আর কোন পুস্তকে হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। কারণ, ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদের যে কিছু পরিচয় সে বিলাতের সঙ্গে —বিলাতের ব্যবসার জন্য আমাদের দেশে ব্যবসার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় —বিলাতের বাণিজ্যনীতি অনুসারে আমাদের দেশে বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তিত বা পরিবর্ত্তিত হয়। সে পুস্তকে সেই ইংলণ্ডের ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করিয়া জার্ম্মাণীর ব্যবসাব্যাপার বুঝান হইয়াছে বলিয়াই আমরা তাহা ভাল বুঝিতে পারি। সেই পুস্তক অবলম্বন করিয়া আমরা এক্ষণে জার্ম্মাণীর শিল্পের ও ব্যবসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা বলিয়াছি, আলোচ্য পুস্তকে যে অতিরঞ্জন ত্রুটি ছিল না, এমন নহে। গ্রন্থকার দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই—মূল্যহ্রাস ও ব্যবসার অবনতি। সস্তায় উপকরণ ও পণ্য লইবার ব্যবস্থা হওয়ায় এবং শ্রমহ্রাসকর যন্ত্রের আবিষ্কারে ও ব্যবহারে পণ্যের মূল্য কমিয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বে যে পরিমাণ পণ্য বেচিয়া যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইত, এখন আর তাহা হয় না। কাযেই বর্ত্তমান সময়ের

আয় দেখিয়া ব্যবসার পরিমাণ-তুলনা করা সঙ্গত নহে। এই এক কথা, আর এক কথা—যে সময় এই পুস্তক প্রকাশিত হয় সে সময় সমগ্র সভ্য জগতে ব্যবসার অবনতি লক্ষিত হইয়াছিল। সে অবনতির কারণনির্ণয় করিবার স্থান এ নহে। কিন্তু এই যে দুইটি ব্যাপার ইহা যখন পৃথিবীব্যাপী তখন তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের—ইংলণ্ডের ও জার্ম্মাণীর ব্যাবসার তুলনায় কোন রূপ অসুবিধা ঘটিবে কেন? তাই গ্রন্থকার যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা উপেক্ষিত হইতে পারে না।

তিনি তিনটি মোট কথা বলিয়াছিলেন—

(১) ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৩ বৎসরে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষের উপর বাড়িয়াছে। কিন্তু বিলাত হইতে যে পণ্য রপ্তানী হইয়াছে তাহার মূল্য বাড়া ত দূরের কথা, এই কয় বৎসরে ৪৫ কোটী টাকা কমিয়াছে। সুতরাং লোক-প্রতি রপ্তানী পণ্যের মূল্য ১ শত ২০ টাকার স্থলে প্রায় ৭৫ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে।

(২) ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে বিলাত হইতে রপ্তানী পণ্যের মূল্য কম হইয়াছে, আর যে পণ্য জার্ম্মাণী হইতে বিলাতে আমদানী হইয়াছে তাহার মূল্য ৭ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে—জার্ম্মাণী হইতে আমদানী মালের মূল্য শতকরা ৩০ টাকা বাড়িয়াছে।

(৩) পূর্ব্বোক্ত ১০ বৎসরে বিলাতে মোট ৩৩ লক্ষ টাকার মাল কম আমদানী হইয়াছে; অথচ বিদেশ হইতে তৈয়ারী দ্রব্যের আমদানী লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সে সকলের মূল্য ১৯ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

মিষ্টার ষ্টেড এই কথায় বলিয়াছিলেন, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বুঝিয়াছিল, ফ্রান্স সমুদ্রে ইংলণ্ডের প্রাধান্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া

উঠিতেছে, এবার তাহাকে বুঝিতে হইবে ব্যবসার বাজারে জার্ম্মাণী তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে।

যে বৎসর আমাদের আলোচ্য পুস্তকখানি প্রচারিত হয়, সেই বৎসর ২৪শে জুলাই তারিখে লর্ড রোজবেরী একটি বক্তৃতায় তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, কিছু দিন হইতে বিদেশে ইংরাজ দূতগণ বলিতেছেন, ব্যবসার বাজারে ইংলণ্ডের দীর্ঘকালের প্রাধান্য বিপন্ন ও ক্ষুণ্ণ হইতেছে। জার্ম্মাণী এ বাজারে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। মিষ্টার উইলিয়ামস্ তাঁহার পুস্তকে সে কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। জার্ম্মাণীর অসাধারণ সাফল্যের কারণ কি? কিছুকাল হইতে জার্ম্মাণী ব্যবসার বাজারে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছে, এক সুইটজারলণ্ড ব্যতীত আর কোন দেশে সেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি নাই। জার্ম্মাণী ধীরে ধীরে ধৈর্য্যসহকারে—অসাধারণ শ্রম-স্বীকার করিয়া উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মাণী বিলাতে লোক পাঠাইয়া বিদেশের ব্যবসার উন্নতির উপায় জানিয়া গিয়াছে —তাহার পর জার্ম্মাণরা সেই সব উপায়ের আবার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছে। এরূপ চেষ্টা ফলবতী হইয়া থাকে। বিলাতের উপনিবেশসমূহে, ভারতে, মিসরে জার্ম্মাণীর ব্যবসাবিস্তারে ইংলণ্ডের ব্যবসা বিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজের পক্ষে আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা সঙ্গত নহে।

সিডানের যুদ্ধে জার্ম্মাণী ফ্রান্সের সামরিক প্রাধান্য চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাহার ১০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সেই উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণী উদ্যোগ আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল। তেমনই ব্যবসার ক্ষেত্রে জার্ম্মাণী ইংলণ্ডকেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

কারিগরী শিক্ষা-সম্বন্ধে যে রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত করা হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহার বিবরণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছিল যে, জার্ম্মাণী তাহার শিল্পের উন্নতির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছে সে সকলই ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা প্রহত করিবার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত। ইহাতে বিদ্বেষের কারণ ছিল না। জার্ম্মাণী দেখিল, সমরে ফ্রান্স ও ব্যবসায়ে ইংলণ্ড প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহারা প্রথমে সমরে ফ্রান্সকে পরাভূত করিবার জন্য আবশ্যক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার ফলে তাহারা জগৎকে স্তম্ভিত করিল। তাহার পর সমরে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য পরাভূত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমরধূলিমুক্ত হইতে না হইতে তাহারা ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার জন্য আবশ্যক শিক্ষালাভে মন দিল। তাহার ফলে তাহারা ব্যবসার বাজারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছে।

হয় ত সত্য সত্যই জার্ম্মাণীর এই শিক্ষাপ্রবর্ত্তনে বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসাই রাজনীতিক পরিবর্ত্তন নিয়ন্ত্রিত করে। তাই ব্যবসাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণীর মনে বিপুল প্রাধান্য-বিস্তারের দুঃস্বপ্ন উদিত হওয়া অসম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু সে দুঃস্বপ্ন যখনই প্রথম প্রকাশিত হউক না কেন, তাহার ফলে আজ প্রতীচ্য সভ্যতার ললাটে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হইয়াছে!

বিলাতে জার্ম্মাণ দ্রব্যের ব্যবহারবাহুল্য বুঝাইবার জন্য মিষ্টার উইলিয়ামস্ বলিয়াছিলেন, "যে দিকে চাহিয়া দেখ, কেবলই জার্ম্মাণ জিনিষ। ইংরাজ পুরুষের পোষাকের কতকটা হয়ত জার্ম্মাণ; তাঁহার পত্নীর পোষাকের অনেকটাই জার্ম্মাণ; দাসীরা যে জমকাল পোষাক পরিয়া বেড়ায় সে পোষাক জার্ম্মাণীর আমদানী। বাড়ীর ছেলেরা যে সব খেলনা লইয়া খেলা করে, যে সব ছবির ও গল্পের বহি পাঠ করে,

সে সবই জার্ম্মাণী হইতে আসিয়া থাকে। যে কাগজে সংবাদপত্র ছাপা হয়, সে কাগজ বা কাগজের উপকরণ জার্ম্মাণী হইতে আসিয়া থাকে। বাড়ীর সর্ব্বত্রই সেই দেশের জিনিষ—বৈঠকখানার পিয়নো বাদ্যযন্ত্র হইতে রন্ধনশালার জলপাত্রটি পর্য্যন্ত সবই সেই বিদেশ হইতে আমদানী। জিনিষ মোড়াই করিবার কাগজ হইতে গৃহসজ্জা পর্য্যন্ত সবই তাহাই। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, জার্ম্মাণী হইতে সে বৎসর এই সব জিনিষ আমদানী হইয়াছে—

ইস্পাতের ও লৌহের জিনিষ ... ১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকার;
পশমের পণ্য...১কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার ৪ শত ১০ টাকার;
কাগজাদি ... ... ৮৮ লক্ষ ২ হাজার ৪ শত ২৫ টাকার;
বাদ্যযন্ত্র ... ... ৮৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ২ শত ৭০ টাকার;
সূতি কাপড় প্রভৃতি... ... ৮০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৫ টাকার;
খেলানা ... ... ৬৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ১ শত ৬০ টাকার;
চীনামাটির বাসনাদি ৩২ লক্ষ ৩৫ হাজার ১ শত ৪০ টাকার;
ছবি প্রভৃতি ... ১৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩ শত ৭৫ টাকার।

এতদ্ভিন্ন তার জার্ম্মাণী হইতে বিলাতে যত আমদানী হইয়াছে বিলাত হইতে তত রপ্তানী হয় নাই।

মিষ্টার উইলিয়ামস্ ১০ বৎসরের হিসাব খতাইয়া দেখাইয়াছিলেন, বিদেশের বাজারে ইংলণ্ডের মালের রপ্তানী কমিয়াছে, জার্ম্মাণ মালের রপ্তানী বাড়িয়াছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় মোট ৪৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার জার্ম্মাণ পণ্য গিয়াছিল, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সে পণ্যের মূল্য ১ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আমেরিকা, ব্রেজিল, ট্রান্সভাল, মিসর, জাপান, বুলগেরিয়া সকল দেশেই জার্ম্মাণ পণ্যের রপ্তানী বাড়িয়াছে।

লৌহের ও ইস্পাতের ব্যবসায় ইংলণ্ডের প্রাধান্য জার্ম্মাণী ক্ষুণ্ণ করিতেছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে জার্ম্মাণীতে যে টেলিগ্রাফের তার ও যন্ত্রাদি রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মোট দাম—২৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা; আর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যে তার ও যন্ত্রাদি রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মূল্য—১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার অধিক নহে। সুতরাং চারি বৎসরে জার্ম্মাণী এ বিভাগে আপনার পরমুখাপেক্ষিতার পরিমাণ অর্দ্ধেক করিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে জার্ম্মাণীতে ৪৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার এঞ্জিন রপ্তানী হইয়াছিল, আর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সে রপ্তানীর মূল্য ২১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। আবার জার্ম্মাণীতে বিলাতী জিনিষের রপ্তানী কমিতেছিল —আর সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে জার্ম্মাণ জিনিষের রপ্তানী বাড়িতেছিল। যে দেশে যে জিনিষ সস্তায় উৎপন্ন করা যায়, সেই দেশ অন্য সব দেশকে সে জিনিষ যোগাইবে—ইহাই জগতের পক্ষে কল্যাণকর, এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইয়া ইংলণ্ড আপনার বাণিজ্যনীতি গঠিত করিয়াছিলেন। তাই যখন আলোচ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়,তখনও যেমন যখন জোসেফ চেম্বারলেন ইংলণ্ডের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিপদের কথা বলেন তখনও তেমনই ইংলণ্ডের লোক অবাধ-বাণিজ্য-নীতির বিরোধী মত গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। শ্রমবিমুখ বিলাসী ধনী যেমন পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থ কমিয়া যাইতেছে দেখিয়াও দেখে না—বিলাতের লোক তেমনই দেখিয়াও দেখিত না যে, ব্যবসার বাজারে ইংলণ্ডের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইতেছিল আর নবীন জার্ম্মাণী ধীরে ধীরে সে বাজারে পশার জমাইয়া লাভবান হইতেছিল। ভারতের ব্যবসাও এইরূপ কমিতেছিল। ১৮৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে লৌহের আমদানী হয় তাহার শতকরা ৯৮ ভাগ

ও যে ইস্পাতের আমদানী হয় তাহার শতকরা ৯৫ ভাগ বিলাত হইতে আসিয়াছিল। আর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লৌহের শতকরা ৬১ ভাগ ও ইস্পাতের শতকরা ৪১ ভাগ মাত্র বিলাত হইতে আসিয়াছিল। এই ব্যাপার ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। শেষে এমন হইয়াছিল যে, সারাঘাটে সেতুর প্রায় সব লৌহের জিনিষই জার্ম্মাণী হইতে আসিয়াছিল। যুদ্ধের আরম্ভকালে সে সেতুর কায কতকটা অবশিষ্ট ছিল বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেতু সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের আলোচ্য পুস্তকে নানা দেশে বিলাতের ও জার্ম্মাণীর পণ্য রপ্তানীর হিসাব দেখাইয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল যে, দিন দিন বিলাতের ব্যবসা জার্ম্মাণীর হস্তগত হইতেছে। দেখান হইয়াছিল, রুসিয়াতে,ইটালীতে, জাপানে বিলাতী মালের রপ্তানী কমিতেছিল,আর জার্ম্মাণ মালের রপ্তানী বাড়িতেছিল। পূর্ব্বে যে টিউনিসে কেবল বিলাতী লোহার জিনিষই বিক্রীত হইত, সেই টিউনিসে বিলাতী লোহার জিনিষের রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বলকানে বিলাতের ব্যবসায় অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়ায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার ২ শত টাকার বিলাতী আর ১৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার জার্ম্মাণ অস্ত্রশস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল। জাপানে পেরেকের ব্যাবসাও এইরূপে ইংলণ্ডের হস্ত হইতে জার্ম্মাণীর হস্তগত হইতেছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সার্ভিয়ায় মোট ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার কল-কব্জা রপ্তানী হইয়াছিল; তাহার মধ্যে বিলাতী মাল কেবল ২২ হাজার ৪ শত ৪০ টাকার। অর্থাৎ যে সব দেশে পূর্ব্বে বিলাতী মালেরই আদর ছিল, সে সব দেশেই ক্রমে ক্রমে জার্ম্মাণ মালের কাটতী হইতেছিল। অন্যান্য দেশ ত পরের কথা—বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা স্থানে,

এমন কি খাস ইংলণ্ডেও বিদেশী—জার্ম্মাণ মালের আমদানী বাড়িতেছিল।

এ কথা ইংরাজরা বুঝিয়াও বুঝেন নাই। একটা ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হইলে নানা দিকে মানুষকে ভ্রান্ত করিতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র অবাধ-বাণিজ্য-নীতিই মানবের কল্যাণকর এই বিশ্বাসে অন্ধ হইয়াই ইংলণ্ড অবাধে জার্ম্মাণীকে ব্যবসার বাজারে সস্তা মাল বেচিয়া লাভবান হইবার অবসর দিয়াছিলেন—আপনার প্রাধান্যরক্ষার জন্য আবশ্যক চেষ্টা করেন নাই।

কার্পাসসূত্রজ পণ্যেও জার্ম্মাণীর রপ্তানীর পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে ৫৫ কোটী ৭৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৭ শত ৫৫ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল, আর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যে মাল রপ্তানী হইয়াছিল তাহার মূল্য ৪১ কোটী ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৪ শত ২৫ টাকা। কেবল মোজার হিসাব ধরিলে দেখা যায়, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যে স্থলে ইংলণ্ড হইতে ৯১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬ শত ৯৫ টাকার মোজা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সে স্থলে কেবল ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার ৭ শত ১৫ টাকার মোজা রপ্তানী হইয়াছিল। কার্পাসসূত্রজ পণ্যেও যেমন পশমী কাপড়েও তেমনই বিলাতের ব্যবসার ক্ষতিই হইতেছিল। পশমী কাপড়েও যে দশা—রেশমী কাপড়েও সেই দশা।

ঔষধাদি রাসায়নিক দ্রব্যের বাজার জার্ম্মাণী যেন একচেটিয়া করিয়া লইতেছিল। জার্ম্মাণীর রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানায় শতকরা ২৮ টাকা লাভ হইতেছিল। বাঙ্গালীর পাঠকের কাছে নিত্যব্যবহার্য্য কুইনাইনের হিসাবটাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজবোধ্য হইবে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার কুইনাইন রপ্তানী

হইয়াছিল; ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রপ্তানী কুইনাইনের মূল্য কেবল ৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। এই সময় জগতের কুইনাইনের বার আনারও উপর জার্ম্মাণীতেই প্রস্তুত হইত। সিনকোনার ব্যবসারও এইরূপ অবস্থা। যে সোডার দৌরাত্ম্যে কাপড় আর টিকে না সেই সোডাও অধিকাংশই জার্ম্মাণী হইতে আসিত। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বর্ণের ব্যবসার কথা বলাই বাহুল্য—সে ব্যবসায় জার্ম্মাণীর একাধিপত্য এবার সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। জার্ম্মাণী বিলাত হইতে আলকাতরা কিনিয়া রং প্রস্তুত করিয়া জগতের সব দেশের বাজারে সরবরাহ করিয়া আসিতেছিল। তাই যুদ্ধের আরম্ভেই সর্ব্বত্র বর্ণের অভাবে নানা ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। জার্ম্মাণীর ব্যবসার প্রতিযোগিতায় ভারতের বর্ণের ব্যবসা বিনষ্ট হইয়াছে; যে দেশ হইতে নানা দেশে নানা প্রকার রং রপ্তানী হইত সে দেশে জার্ম্মাণ রং ব্যবহৃত হইতেছে।

জার্ম্মাণী কোথাও পঙ্গপালের মত পড়িয়া ব্যবসা নষ্ট করিয়া দিতেছে, কোথাও বা ক্ষুদ্র কীটের মত ধীরে ধীরে ব্যবসার সর্ব্বনাশ করিতেছে। কোন ব্যবসাই সে পরিত্যাগ করিতেছে না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার খেলানা আমদানী হইয়াছিল—এক পয়সার খেলানা রপ্তানী হয় নাই। জার্ম্মাণী হইতে বৎসর বৎসর প্রায় দেড় কোটী টাকার খেলানা রপ্তানীর হিসাব মিষ্টার উইলিয়ামস্ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দেই দিয়াছিলেন। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমাদের দেশে খেলানার বাজারও জার্ম্মাণ মালে পূর্ণ হইয়াছিল। টিনের লাটিম ও বাঁশী হইতে খেলার মোটরকার পর্য্যন্ত সবই জার্ম্মাণ। কলুটোলা হইতে যে সব খেলানা বাক্সে বাক্সে পল্লীগ্রামের মেলায় মনোহারীর দোকানে রপ্তানী হয়, যে সব খেলানা গৃহিণীরা কালীঘাট হইতে কিনিয়া আনেন, যে সব খেলানা পল্লীগ্রামে

বধূরা ঘাটের পথে মাদুর পাতিয়া মাল বিছাইয়া উপবিষ্ট ফিরীওয়ালার কাছে ক্রয় করেন সে সকলের সাড়ে পনের আনাই জার্ম্মাণ।

আমাদের বাড়ীতেও ছেলেরাও জার্ম্মাণ খেলানা লইয়া মারামারি করে, চাকররা জার্ম্মাণ পিত্তলের গেলাসে জল খায়, জার্ম্মাণ অ্যালুমিনিয়ম পাত্রে আমাদের ছেলেদের দুধ গরম হয়, আমরা জার্ম্মাণ পশমে এ দেশে প্রস্তুত শাল গায় দিয়া বাহির হই—চাকরদের জার্ম্মাণ গাত্র-বস্ত্র দিয়া থাকি, সকালে উঠিয়া আমরা যে সংবাদপত্র পাঠ করি, সে সংবাদপত্রও জার্ম্মাণ কাগজে—জার্ম্মাণ ছাপার প্রেসে ছাপা। রাধাবাজারে যে ফটোগ্রাফার—"ছবি! বাবু, আপনার ছবি!" বলিয়া ডাকিয়া চারি আনায় ফটো তুলিয়া দেয় তাহার মাল মসলাও জার্ম্মাণ—কলিকাতার বোর্ণ এণ্ড সেফার্ডের ও বোম্বাইয়ের বিদোয়ারের ফটোগ্রাফের মালমসলাও জার্ম্মাণ। আমাদের ঘরের মেজের যে সিমেণ্ট দেওয়া হয় তাহাও প্রায় জার্ম্মাণ। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে ১ কোটী ৯২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার সিমেণ্ট রপ্তানী হইয়াছিল, আর পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মোট ৯৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার সিমেণ্ট রপ্তানী হয়। আর আমাদের ঘরের লোহার কড়ি বরগা প্রায়ই জার্ম্মাণ। ঘরের ছবিগুলিও সেই দেশের। পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতেই অধিক কাগজ রপ্তানী হইত, সে রপ্তানীর পরিমাণ দিন দিন কমিয়াছে। এখন বিলাতেও জার্ম্মাণ কাগজে পুস্তক ছাপা হয়—জার্ম্মাণ চিত্রে পুস্তক শোভিত হয়—জার্ম্মাণ উপকরণে বান্ধাই হয়।

মিষ্টার উইলিয়ামসের পুস্তক প্রচারিত হইলে লর্ড রোজবেরী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসানৈপুণ্যে বিলাতী ব্যবসায়ীরাই বিদেশে জার্ম্মাণ মাল পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। 'টাইমস' বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণরা যে দেশে মাল পাঠায় সে

দেশের দরকার বুঝিয়া মাল সরবরাহ করিতে পারে, তাই তাহাদের মালের কাটতি অধিক হয়। আর 'লিসার আওয়ার' পত্রে জার্ম্মাণীর বিজ্ঞাপন-বিস্তার-কৌশলের একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। জার্ম্মাণী হইতে 'জাপানিস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাডভারটাইজার' নামক একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে জাপানে প্রচারিত হয়। হোটেলে, সভায়, কুটীরে সর্ব্বত্র সে পত্র প্রদত্ত হইত। পত্রের লিখা জাপানী ভাষায়—ছাপা জাপানী অক্ষরে। পত্রখানি ছাপা হইত—বার্লিনে। বলা বাহুল্য, জাপানী ভাষার রচনায় নানারূপ ত্রুটি থাকিত। কিন্তু আমরা এ দেশে যেমন "মাতা সিগলের আরোগ্য-রসের" বিজ্ঞাপন পড়িয়া হাসি, কিন্তু অনেকটা হাসিবার জন্যও পড়ি—জাপানীরা তেমনই এই বিজ্ঞাপন-পত্র পড়িত—পড়িয়া হাসিত, হাসিতে হাসিতে পড়িত। সে পত্রে জার্ম্মাণ কারখানার বিস্তৃত বিবরণ থাকিত। সে বিবরণে বুঝায়, দুনিয়ার সব জিনিষই জার্ম্মাণীতে উৎপন্ন হয়। তাহাতে জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের তালিকাও থাকিত। সে পত্রের সঙ্গে সঙ্গে নানা পুস্তিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিও বিলি হইত। জাপানীর পর চীনাভাষায় এইরূপ পত্র প্রচারের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

ডাক্তার ডিলন 'কর্টনাইটলী রিভিউ' পত্রে লিখেন, জার্ম্মাণীতে জ্ঞানবিস্তারের ফলে ব্যবসার উন্নতি হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে কারিগরী-বিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসাবিদ্যালয় অনেক। জার্ম্মাণরা সব কায শৃঙ্খলাসহকারে সুসম্পন্ন করে। সেই জন্য ব্যবসার বাজারে তাহারা জয়লাভ করিতে পারিয়াছে।

সার উইলিয়ম হার্টডাইক স্পষ্টই বলেন, জার্ম্মাণী বুঝিয়াছিল, ব্যবসার বাজারে প্রতিযোগিতায় দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিবে। বুঝিয়া, জার্ম্মাণী দেশে শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া, সে জন্য

প্রস্তুত হইয়াছিল। শিক্ষার ফলে তাহারা ব্যবসায় বিস্তার সংসাধিত করিতে পারিয়াছে।

তখন জার্ম্মাণীর প্রাধান্যলাভের কারণ-সন্ধান হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে নানারূপ মত ব্যক্ত করা হইয়াছিল—প্রতীকারের নানা পন্থাও প্রদর্শিত হইয়াছিল। তখন কেহ কেহ বিলাতে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধিসাধন-জন্য রক্ষাশুল্কসংস্থাপনের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। মিষ্টার উইলিয়ামসও প্রকারান্তরে সেই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতের বিখ্যাত রাজনীতিকগণ তখনও করডেনের মতেই পরিচালিত। তাই মিষ্টার অ্যাসকুইথ ও মিষ্টার কোর্টনী সে সব প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছিলেন, আর ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া বিলাতের লোক বর্ত্তমান সুবিধার জন্যই অবাধ বাণিজ্যনীতিরই সমর্থন করিতেছিল।

বিলাতের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাতে বিলাতের পরমুখা-পেক্ষিতায় আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা অনিবার্য্য। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা জার্ম্মাণীর ব্যবসাবিস্তারের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বে এ দেশে বিলাত হইতেই কাচের জিনিষ আসিত। ক্রমে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। সরকার ডাকঘরে যে কুইনাইনের চাকৃতি বেচিতেন, তাহা সুদৃশ্য কাচের আধারে বিক্রীত হইত। যখন সে কাচের আমদানী বন্ধ হইল, তখন বিলাত হইতে সে দরে তাহা যোগান সম্ভব হইল না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলা হইয়াছিল, সে জন্য কলিকাতার মুকা শিশিওয়ালাদেরও শরণ লওয়া হইয়াছিল; কিছুতেই কিছু হয় নাই। শেষে টিনের বাক্সে কুইনাইন বেচিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মেটে বা রেড়ীর তেলে মাটীর প্রদীপ জালান উঠিয়া গিয়াছে —এখন ঘরে ঘরে কাচের লণ্ঠনে কেরসিন তৈলের আলো। সরকারী বিবরণেই প্রকাশ, যে সব ভাল চিমনী আমরা বিলাতী বলিয়া জানি-

তাম, সে সকলেরও "আদিস্থান" বিলাতে নহে, তাই সে সকলের আমদানী বন্ধ হইয়াছে।

মিষ্টার উইলিয়াম্‌স বিলাতের ব্যবসা কমিবার ও জার্ম্মাণীর ব্যবসা বাড়িবার অনেক কারণ দেখাইয়াছেন। পড়িয়া ঈশপের গল্পের খরগোস ও কচ্ছপের গল্প মনে পড়ে। দুইজনে বাজী রাখিয়া পাল্লা দিয়া পথাতিক্রম করিতেছিল। খরগোস আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাসহেতু অর্দ্ধ পথে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রাগত হয়। তাহার বিশ্বাস ছিল, কচ্ছপ কিছুতেই তাহার সঙ্গে পারিবে না। কচ্ছপ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া অগ্রসর হইয়া বাজী জিনিয়াছিল। এও তেমনই। বহুকাল ব্যবসার বাজারে অনাহত প্রাধান্য সম্ভোগ করিয়া বিলাতের লোক নিশ্চিন্ত ও ও অলস হইয়াছিল। জার্ম্মাণী-কচ্ছপ আলস্য পরিহার করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই; পরন্তু ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কলের গাড়ীতে চড়িয়া চলিয়াছিল। তাই তাহার এত উন্নতি। যে কারণে জার্ম্মাণী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফরাসীদিগকে পরাভূত করিয়াছিল,সেই কারণে সে ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরাজদিগকে পরাভূত করিতেছিল। তাহারা সব দিক ভাল করিয়া দেখিয়া, কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিয়া, সাফল্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ফরাসীসেনা যেমন নেপোলিয়নের সাফল্যগর্ব্বেই নিশ্চিন্ত ছিল, ইংরাজ ব্যবসায়ীরা তেমনই পূর্ব্বলব্ধ সাফল্যগর্ব্বেই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বিলাতের এক দল লোক সব দোষ বিলাতের শ্রমজীবীদিগের স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জার্ম্মাণীতে মজুরীর হার কম; জার্ম্মাণ শ্রমজীবীরা কম মজুরী পায়, কিন্তু অধিক সময় কারখানায় কায করে। আর বিলাতের শ্রমজীবীরা অধিক মজুরী পায়, কিন্তু অল্প সময় কায করে; তাহার উপর আবার যখন তখন মজুরী বাড়াইতে বা খাটুনীর সময় কমাইতে দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট করে।

এ অবস্থায় বিলাতের ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় পারিবে কিরূপে? বিলাতের লৌহব্যবসায় সমিতির প্রতিনিধিরা কিন্তু জার্ম্মাণীর লৌহ-ব্যবসায় অবস্থাপরীক্ষা করিয়া এ মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই। জার্ম্মাণীর লোহার কারখানায় লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে এক জন ইংরাজই বলিয়াছিলেন, বিলাত অপেক্ষা জার্ম্মাণীতে মজুররা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে। সাধারণতঃ জার্ম্মাণ কারখানায় মজুরীর হার অধিক। বিলাতে দুই চারি জন (সুশিক্ষিত?) শ্রমজীবীর মজুরী অধিক হইলেও মোটের উপর জার্ম্মাণ মজুর অধিক মজুরী লইয়া থাকে। যে সব ইংরাজ স্বাধীনভাবে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহারাও বলেন, কেবল লোহের ব্যবসায়ে নহে, পরন্তু সব ব্যবসায়েই জার্ম্মাণীতে মজুরের মজুরী বিলাতের মজুরের মজুরীর অপেক্ষা বড় কম নহে। কোন কোন ব্যবসায় বরং জার্ম্মাণ মজুরের মজুরীর হারই অধিক। আবার পূর্ব্বে যাহাই কেন থাকুক না, জার্ম্মাণীতে সকল ব্যবসায়েই, মজুরীর হার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

আরও এক কথা—মজুরের মজুরী অধিক হইলেই যে পণ্যের দাম চড়ে, এমনও নহে; মজুরকে চড়া মজুরী দিয়াও সস্তা দরে মাল যোগান যায়। তাহার প্রমাণ—বেলজিয়মের লোহার কাযের মজুরদিগের মজুরী জার্ম্মাণীর লোহার কাযের মজুরদিগের মজুরীর অপেক্ষা কম; অথচ বেলজিয়মের লোহার ব্যবসা জার্ম্মাণীর লোহার ব্যবসার প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আরও একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে—মার্কিণে নিউইয়র্কে ছাপাখানার কারিগরদিগের মজুরী যত অধিক, বিলাতে লণ্ডনে তত অধিক নহে। অথচ নিউইয়র্কে যত সস্তায় ছাপার কায হয়, বিলাতে তত সস্তায় হয় না; ইহা হইতেই বুঝা যায়, মজুরীর হার অধিক হইলেই যে কাযের পড়তা অধিক পড়ে, এমন

নহে। নানা কারণে পড়তার হার নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা ক্রমে জার্ম্মাণীর ব্যবসার কথা হইতেই তাহা দেখাইব। জার্ম্মাণী যে সস্তা মাল যোগায়, তাহার কারণ অন্তরূপ।

মিষ্টার উইলিয়ামস এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর ব্যবসাবিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ—রক্ষাশুল্ক। রক্ষাশুল্কের জন্য স্বদেশে চড়া না হউক, কড়া দরে জিনিষ বেচিতে পারে বলিয়াই, জার্ম্মাণ কারখানাওয়ালারা বিদেশে সস্তায় মাল বেচিয়া বিদেশের ব্যবসায় বাজার একচেটিয়া করিবার চেষ্টা করিতে পারে। আমরা এ কথা মানিলেও বিলাতের লোক এত দিন মানে নাই; সেই জন্যই ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠাকল্পে রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তনের জন্য আমাদের রোদন এত দিন অরণ্যে রোদন হইয়াছে। এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক মিষ্টার ষ্টেড মিষ্টার উইলিয়ামসের পুস্তকের আলোচনাকালে এ কথার বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, গ্রন্থকার এ তর্ক না তুলিলেই ভাল হইত। কারণ, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, বিলাতের লোক অবাধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছে। কি উদারনৈতিক,—কি রক্ষণশীল রাজনৈতিক মতনির্ব্বিশেষে সকল ইংরাজ-নেতাই যখন অবাধ বাণিজ্যনীতির পক্ষাবলম্বী তখন এবিষয়ে আর তর্ক তুলা নিষ্প্রয়োজন। যখন মিষ্টার ষ্টেডের মত লোকও এ বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন না, তখন অন্য লোকের কথা বলাই বাহুল্য। দুর্ভিক্ষের সময় দেশ হইতে খাদ্যশস্যের রপ্তানী লইয়া বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের সহিত মতান্তর হইলে, বাঙ্গালার ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন, অবাধ বাণিজ্যনীতির পক্ষাবলম্বীরা এমনই "গোঁড়া" যে মনে করেন, সে, নীতিসম্বন্ধে প্রতিবাদ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে প্রতিবাদেরই তুল্য!

তাহার পর রেলভাড়ার কথা। সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জার্ম্মাণীতে মালের ভাড়া বিলাতে মালের ভাড়ার প্রায় অর্দ্ধেক। ইহার কারণ, জার্ম্মাণীতে রেলপথ প্রায় সবই সরকারী ; আর বিলাতে রেল-পথ ব্যবসায়ী কোম্পানীর—তাহারা ভাড়ার হার চড়াইয়াও লাভের হার বাড়াইতে চেষ্টা করে। জাহাজ কোম্পানীতেও সরকারের সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং সে সব কোম্পানীর জাহাজে কম ভাড়ায় মাল পাঠান হইতে পারে—পাঠাইবার ব্যবস্থাও আছে। জার্ম্মাণীর সব স্থান হইতে সুবিধাজনক ভাড়ায় মাল পাঠান যায়। এমন কি বিলাতের বন্দর হইতে যে ভাড়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানাস্থানে মাল পাঠান যায়, জার্ম্মাণীর যে কোন বন্দর হইতে তদপেক্ষা কম ভাড়ায় সেই সব স্থানে মাল পাঠান যাইতে পারে। ইহা সরকারী সাহায্যেই সম্ভব হয়।

মিষ্টার উইলিয়ামস বলেন, বাণিজ্যব্যাপারে জার্ম্মাণীর কাছে অন্যান্য জাতির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাহারা কাযে অধিক যত্ন করে, ভাল জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারে, যাহাতে উপকরণের কোন অংশ নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা করে ; খরিদদারের রুচি বুঝিয়া আবশ্যক পণ্য যোগাইবার বন্দোবস্ত করে। আসল কথা, জার্ম্মাণরা কেমন করিয়া ব্যবসা করিতে হয়, সেইটি—ব্যবসার সাফল্যের মূল কি, তাহা—বুঝিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও জার্ম্মাণী কৃষিপ্রধান নহে—কৃষিপ্রাণ দেশ ছিল। তখন জার্ম্মাণীর পণ্য নগণ্য ছিল। ব্যবসা ছিল না বলিলেই হয়। তখন তথায় ব্যবসার মূলধন মিলিত না ; জার্ম্মাণীর মাল রপ্তানী হিসাব রাখিবার মতই ছিল না ; জার্ম্মাণী বিদেশ হইতে ব্যবহারজন্য মাল আমদানী করিত। অর্থাৎ জিনিষসম্বন্ধে জার্ম্মাণী সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী ছিল। এখন সে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ যুবকগণ দলে দলে শিক্ষার্থী হইয়া বিলাতে আসিয়াছে, বিলাতের ব্যবসায় গুপ্ততত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লব্ধশিক্ষার সদ্ব্যবহার করিয়া দেশে ব্যবসার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি করিয়াছে। জার্ম্মাণী যেরূপে দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ ব্যবসাতেই তাহারা বিলাতের লোকের অপেক্ষাও পটুত্ব লাভ করিয়াছে—শিষ্যবিদ্যা গুরুর বিদ্যাকে পরাভূত করিয়াছে। আবার জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা বিলাসবর্জ্জিত জীবনযাপন করায় তাহারা হাতে হাতে লাভের জন্য ব্যস্ত হয় নাই—যে লাভ পাইয়াছে, তাহা বিলাসব্যসনে ব্যয়িত না করিয়া মূলধনে যোগ করিতে পারিয়াছে। তাহারা আপনারা ব্যবসার খাতাপত্র রাখিয়াছে, ছেলেদের দিয়া সেই কায করাইয়াছে; ব্যবসার সব বিভাগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কায চালাইয়াছে, নানা প্রকারে—বিশেষ ভাড়ার ব্যাপারে সরকারী সাহায্য লাভ করিয়াছে। আর তাহারা জগতের সর্ব্বদেশে যাইয়া সেই সব দেশের ভাষা শিখিয়া—লোকের রুচিপরিচয় পাইয়া আবশ্যক উপাদান যোগাইয়াছে। যাহারা এমন করিয়া সাধনা করিতে পারে, তাহারা সিদ্ধিলাভ করে। তাই জার্ম্মাণী ব্যবসা ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রতিযোগীর কাছে শিক্ষালাভ অসঙ্গত নহে; বরং প্রতিযোগীর কাছেই মানুষ আবশ্যক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। জার্ম্মাণী ব্যবসার বাজারে ইংলণ্ডের প্রতিযোগী হইবে স্থির করিয়া ইংলণ্ডকেই শিক্ষাগুরুর পদে বৃত করিয়াছিল। মিষ্টার উইলিয়ামসের পুস্তক প্রচারের পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের লৌহ ও ইস্পাত 'ইনষ্টিটিউটের' সদস্যগণ যখন বার্লিনে গিয়াছিলেন, তখন ডাক্তার হরম্যান ওয়েডিং স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের কাছেই ব্যবসা শিক্ষা করিয়াছে, তাহার পর

লব্ধ শিক্ষার উন্নতি সংসাধিত করিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, লোহের কারবারে অধিকাংশ উন্নতির উপায়ই যে বিলাতে আবিষ্কৃত, সে কথা অস্বীকার করা যায় না—অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু ইংরাজদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, জার্ম্মাণরা বিলাত হইতে যাহা শিখিয়া আসিয়াছে তাহা স্বদেশের অবস্থার উপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিয়াছে। তাহাদের লব্ধ শিক্ষা ভার হইয়া থাকে নাই—শক্তিরূপে নানাদিকে ব্যবহৃত হইয়াছে—জার্ম্মাণীর ব্যবসার উন্নতি করিয়াছে।

লোহার কারবারসম্বন্ধে ডাক্তার ওয়েডিং যে কথা বলিয়াছেন, সব ব্যবসাসম্বন্ধেই সেই কথা বলা যায়। ব্যাভেরিয়ার একটি বিরাট কারখানার ইংরাজ কার্য্যাধ্যক্ষ ইংরাজ সমস্তদিগকে বলিয়াছিলেন, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সহিত তুলনায় জার্ম্মাণী নগণ্যই ছিল—আর এই ৩০ বৎসরে দুই দেশের ব্যবসার তুলনা করিলে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। এই ৩০ বৎসর জার্ম্মাণী পদে পদে ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়াছে, বিলাতী কলকব্জা যন্ত্র ও অস্ত্র আনিয়া ব্যবহার করিয়াছে, বিলাতের দোকান হইতে কার্য্যপটু লোক আনিয়া ব্যবসার "হদিস" জানিয়া লইয়াছে। এখনও জার্ম্মাণ যুবকগণ দলে দলে ব্যবসা শিখিতে বিলাতে আসিয়া থাকে। আর যে স্থলেই প্রয়োজন হয়, জার্ম্মাণরা সুশিক্ষিত ইংরাজ মিস্ত্রী ও কার্য্যাধ্যক্ষ লইয়া যাইয়া ব্যবসা গুছাইয়া লয়। এক দিকে এই হয়—আর এক দিকে শিক্ষার গুণে জার্ম্মাণদিগের জড়তা দূর হওয়ায় তাহারা মৌলিক আবিষ্কারে সফলপ্রযত্ন হইতেছে। পাঠকগণ অবশ্যই অবগত আছেন, এ বিষয়ে জাপান জার্ম্মাণীরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছে। বৎসর বৎসর জাপানী সরকারের সাহায্যে দলে দলে জাপানী যুবক য়ুরোপে ও আমেরিকায়

যাইয়া ব্যবসা শিক্ষা করিয়াছে—দেশে ফিরিয়া ব্যবসাপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এমন না হইলে হয় না। বিলাতে ফ্লাণ্ডার্স হইতে শিল্পী আনাইয়া পশমী কাপড়ের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। আমাদের দেশ হইতে আজকাল সরকারী সাহায্যে না হউক—সভা-সমিতির চেষ্টায় সংগৃহীত দেশের লোকের অর্থে ও নিজব্যয়ে বহু যুবক বিদেশে নানাস্থানে যাইয়া ব্যবসাশিক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহাতে দেশে শিল্পের উন্নতি হইতেছে না। ইহার কারণ কি? তাহারা দেশে ফিরিয়া শিক্ষিত-বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগই পায় না। জাপানে তাহারা ফিরিয়া আসিলেই কারখানায় সাদরে গৃহীত হয়। এ দেশে কারখানা কোথায়? প্রথমে রক্ষাশুল্কের সাহায্য না পাইলে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এ দেশে রক্ষাশুল্কের অভাবেই লোক সাহস করিয়া ব্যবসায়ে টাকা ফেলিতে পারে না। দেশে কারখানা নাই—ক্ষেত্রের অভাব। কেবল কি শিল্পসম্বন্ধে এই কথা? সরকার বৃত্তি দিয়া যে সব ছাত্রকে বিলাতে সিসটার কলেজে কৃষিবিদ্যা শিখাইয়া আনেন, তাহারাও ফিরিয়া সরকারের কৃপায় ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঘটীচুরীর ও কয়েদখালাসীর মামলার বিচার করে, চৌকিদারের বেতন বাটোয়ারা করে। বিদেশে সরকারের অর্থে তাহারা যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া আইসে, সে বিদ্যা ব্যর্থ হইয়া যায়। যখন সরকারী বৃত্তিও এইরূপে ব্যর্থ হয়, তখন অন্য লোকের অর্থের কথা আর কি বলিব? বরং আমরা দেখিতে পাই, উৎসাহের উত্তেজনায় বিদেশে যাইয়া এই সব যুবক "না-এ-দিক-না-ও-দিক" হইয়া শেষে বিষম বিপদে পতিত হয়। তাহারা যে ব্যবসা শিখিয়া আইসে, সে ব্যবসা করিবার পথ পায় না—অন্য ব্যবসার শিক্ষাও তাহাদের নাই। শেষে তাহারা অর্থার্জ্জনে অক্ষম—সংসারের ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে। জার্ম্মাণী বিলাত হইতে

মিস্ত্রী ও কার্য্যাধ্যক্ষ আনাইয়া ব্যবসা-প্রতিষ্ঠার যে উপায় করিয়াছে, এ দেশে অধিকাংশ স্থলে তাহাও হয় না। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার কতিপয় ধনী এ দেশে কাচের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসে আবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি কারখানা স্থাপিত করিয়াছিলেন। যে টাকার অভাবে এ দেশের অনেক যৌথ কারবার নষ্ট হয়, তাঁহাদের সে টাকার অভাব ছিল না। কারখানাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনা হইয়াছিল; কিন্তু য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞ এ দেশের কারিগরদিগকে ব্যবসার গুপ্ততত্ত্ব শিখাইতে অসম্মত হইয়া কার্য্য ত্যাগ করেন। সে কল আর চলিল না। তাহার পর আর সে কল চালাইবার উপায় হয় নাই। কিন্তু কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস জাপানে লোক পাঠাইয়া, কায শিখাইয়া আনিয়াও কাযে সুবিধা হইল না দেখিয়া, জাপানী কারিগর আনাইয়া, এ দেশের কারিগরদিগকে শিখাইয়া লইয়াছেন। এখন কায চলিতেছে। এই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা। কিন্তু এ কার্য্যেও সরকারের সাহায্য ব্যতীত সাফল্যলাভের সম্ভাবনা নাই। সুখের বিষয়, এবার সরকার এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতেছেন—বিদেশ হইতে মিস্ত্রী আনাইয়া এ দেশের লোককে শিখাইবার সুব্যবস্থা করিতেছেন।

জার্ম্মাণরা পণ্যের ব্যয় কমাইতে শিখিয়াছে—কমাইবার উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছে। বিলাতের লৌহব্যবসায়ের প্রতিনিধিরা সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা লোহার চাদরের একটা কারখানা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, বিলাতের কারখানায় চাদর প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ উপকরণ নষ্ট হয়—এই কারখানায় তদপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ কম উপকরণ নষ্ট হয়। এক জন প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণ কারখানায় উপকরণ নষ্ট হয় না বলিলেই হয়। তিনি এমন

কথাও বলিয়াছিলেন যে, বিলাতের কারখানায় যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে জার্ম্মাণীর কারখানার জিনিষের মত সুন্দর জিনিষ তেমন পরিমাণে প্রস্তুত করাই অসম্ভব। এমন ব্যাপার তিনি তখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই—না দেখিলে বিশ্বাসও করিতে পারিতেন না। যে ইংলণ্ডে পূর্ব্বে জগতের সব দেশের ব্যবহারের অধিকাংশ লৌহপণ্য প্রস্তুত হইত—যে ইংলণ্ডের কারখানায় আসিয়া জার্ম্মাণরা কায শিখিয়া গিয়াছিল, সেই ইংলণ্ডের লৌহব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধির এই সরল উক্তির সমালোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু এমন হইল কেন, তাহাই বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

জার্ম্মাণী বিজ্ঞানবলে ব্যবসার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছে। বিলাতের ব্যবসায়ীরা বিদ্রূপ করিয়া বলেন, জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা কারিগরের বদলে পণ্ডিত রাখেন। এককালে জার্ম্মাণীর সেনানিবাসে চশমা-ধারী অধ্যাপকদিগকে দেখিয়া ফরাসীরা হাসিত—গোরাবারিকে অধ্যাপকগণ কি করেন? কিন্তু তাহার পর, যুদ্ধের পর যুদ্ধে যখন জার্ম্মাণগণ ফরাসীদিগকে পরাজিত করিতে লাগিল, তখন ফরাসীরা বুঝিল, চশমা-ধারী অধ্যাপকরা তাহাদের অপেক্ষা যুদ্ধের কায ভাল বুঝেন। বিলাতেও তেমনই হইয়াছে। ব্যবসাবুদ্ধিবলে ব্যবসার বাজারে প্রাধান্য সম্ভোগ করিয়া ইংরাজ ব্যবসায়ীরা মনে করিয়াছিলেন, ব্যবসাবুদ্ধির বলেই তাঁহারা প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন—সে জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যগ্রহণ অনাবশ্যক। কিন্তু জগতের ব্যবসার ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছিল, তাঁহারা সে সকলের সন্ধান রাখেন নাই। ম্যাক্সিম কামান যেমন সেকালের গাদা বন্দুকের ব্যবহার হাস্যোদ্দীপক করিয়াছে, কলের তাঁত যেমন সেকালের তাঁত অব্যবহার্য্য করিয়াছে, ব্যবসার বাজারে তেমনই বৈজ্ঞানিকের নব নব আবিষ্কার পূর্ব্বপ্রচলিত

প্রণালীর পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে। কাযেই এখন বিজ্ঞানের সাহায্যগ্রহণ ব্যতীত ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজ কারখানাওয়ালারা কারখানার ব্যয় কমাইতেই ব্যস্ত, কিন্তু আপনাদের বিলাসের জন্ম অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে তাঁহারা নিতান্তই কড়ায় কড়া, কাহনে কাণা; জার্ম্মাণীতে বিপরীত ব্যাপারই লক্ষিত হয়। তথায় এল্‌বারফেল্ডে একটি কারখানায় ৬০ জন সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক বার মাস বেতন লইয়া কায করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের কাযের জন্ত সুসজ্জিত বিজ্ঞানশালা আছে। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা বলেন, তাঁহাদের বেতন অপব্যয়ী, তাহাতে কোন ফল ফলে না—জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস, তাঁহারা পরীক্ষা করেন, আর সেই পরীক্ষার ফলেই ব্যবসার উন্নতি হয়। এই মতভেদেই দুই দেশে ব্যবসার অবস্থাভেদ। এই সকল বৈজ্ঞানিককে কারখানার প্রাত্যহিক কোন কায করিতে হয় না। তাঁহারা দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া পরীক্ষায়—বিশ্লেষণে সংমিশ্রণে ব্যাপৃত থাকেন। পরীক্ষা করিতে করিতে এক দিন এক জন জিনিষ প্রস্তুত করিবার একটা নূতন উপায় উদ্ভাবিত করেন—উপকরণের যে অংশ পূর্ব্বে কোন কাযে লাগিত না, তাহাই কাযে লাগাইতে পারেন; তখন ব্যবসায় যুগান্তর উপস্থিত হয়। পণ্যের মূল্য কমিয়া যায়—প্রতিযোগিতায় আর সকলের পরাভব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ব্যবসায়ীর এতদিনের ব্যয় দশগুণে বা শতগুণে ওয়াশীল হইয়া আইসে। বৈজ্ঞানিকও সে লাভের অংশ পাইয়া নবীন উৎসাহে নূতন নূতন পন্থা-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এল্‌বারফেল্ডের কারখানায় যে ব্যবস্থা, জার্ম্মাণীর সব কারখানাতেই সেই ব্যবস্থা। আর একটি কারখানায় ৭৮ জন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকার কথাও

জানা গিয়াছে। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা বলেন—এ অপব্যয় কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু এই কারখানা অংশী-দিগকে বৎসরে শতকরা ২৫ টাকা লাভ দিয়াছে! সুতরাং এই অপব্যয়ে লাভ ব্যতীত লোকসান হয় না। কাযেই এইরূপ অপব্যয় করাই সঙ্গত। কিন্তু বিলাতের ব্যবসায়ীরা মনে করেন, সুদূর ভবিষ্যতে লাভের নূতন পথ আবিষ্কারের আশায় বর্ত্তমানে এইরূপ ব্যয় করা সুবুদ্ধির কায নহে। যে অর্থে বৈজ্ঞানিকদিগের ব্যয়নির্ব্বাহ হয়, সে অর্থে বাগান বাড়ী কিনিয়া বা শিকারের জন্য বন রাখিয়া আরাম করাই ভাল। এ বিষয়ে জার্ম্মাণ-ব্যবসায়ীরা দার্শনিকোচিত বিচারবুদ্ধি সহকারে বর্ত্তমানে কষ্ট করিয়া, ভবিষ্যতে সুখের সম্বল সঞ্চিত করেন; আর ইংরাজ ব্যবসায়ীরা কবি ওমরখৈয়মের মত মনে করেন,—

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সুখের আশায়
কে ত্যজিবে বর্ত্তমান এ মর ধরায়?
আজ আমি আছি, আছে বিচিত্র এ ধরা;
কে জানে নিয়তি কাল লইবে কোথায়?

মিষ্টার উইলিয়ামসের কথার পুনরুক্তি করিয়া মিষ্টার হ্বৈড বলিয়া-ছিলেন, নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, সব দিকেই জার্ম্মাণরা ইংরাজদিগের অপেক্ষা ভাল জিনিষ উৎপন্ন করিতেছে। বিলাতের প্রসিদ্ধ সচিত্র পত্র 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের' কার্য্যাধ্যক্ষ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া জার্ম্মাণী হইতে মুদ্রাযন্ত্র আনিয়া ব্যবহার করিতে হইতেছে—বিদেশী যন্ত্রে যত ভাল কায হয়, বিলাতী যন্ত্রে তত ভাল কায হয় না। জার্ম্মাণীর লিথোগ্রাফ ও ক্রমো—চিত্রমুদ্রণের উৎকর্ষ সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের দেশে কালীঘাটের পটের পরিবর্ত্তে যে সব বিপরীত বর্ণ-বৈচিত্র্য-বহুল সুশ্রী ও কুশ্রী, সুন্দর

ও অশ্লীল চিত্রপট পানের দোকান হইতে গৃহস্থের বৈঠকখানা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখা যায়, সে সব "জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত।" আজ কাল এ দেশের অনেক চিত্রকরও জার্ম্মাণী হইতে আপনাদের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি আনাইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন। 'কুঞ্জবিহার—যুগলরূপ' প্রভৃতি নানা পৌরাণিক চিত্র জার্ম্মাণীর আমদানী। এ বিষয়ে মিষ্টার উইলিয়ামস কোন বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, লিথোগ্রাফ, ছবির কায, ভাল পুস্তকবান্ধাই বিলাতে হয় না! তিনি বহুবার বিলাতে কায করাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কায সুন্দর হয় না, যথাকালে জিনিষ পাওয়া যায় না—খরচ অধিক পড়ে। এ অবস্থায় লোক ইচ্ছা থাকিলেও বিলাতে কায করাইতে পারে না। কারণ, প্রতিযোগিতার ভয় ত আছে।

বার্মিংহাম ডিস্‌পেনসারীর কর্ত্তারা বলিয়াছিলেন, ভাল শিশি বোতল পাইতে হইলে জার্ম্মাণীর জিনিষ লইতে হয়। তাঁহারা বিলাতের কারখানায় জিনিষ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু জিনিষ একেবারেই ভাল হয় নাই। বিলাতের এক জন ঔষধবিক্রেতা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, বিলাতের কোন শিশিবোতলওয়ালা কায জানে না—বা কাযে যত্ন করে না। অর্থাৎ বিলাতের ব্যবসায়ীরা কাযে মন দেন না, আর জার্ম্মাণীর ব্যবসায়ীরা সর্ব্বপ্রযত্নে ব্যবসার উন্নতিসংসাধনের চেষ্টা করেন। ফলে, এই হয় যে, ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসা ক্রমে ক্রমে জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগের হস্তগত হইয়া জার্ম্মাণীরই সম্পদবৃদ্ধি করে।

চীনামাটীর বাসন প্রভৃতি পণ্যে জার্ম্মাণী যে শিল্পনৈপুণ্য দেখায়, বিলাতে তাহার একান্ত অভাব। জার্ম্মাণ জিনিষ দেখিতে সুন্দর—সহজেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে—লোকের হৃদয়ে কিনিবার ইচ্ছার উদ্রেক করে। জার্ম্মাণীর খেলানাগুলি দেখিতে সুন্দর—স্বাভাবিক

জিনিষের মত। তাই জার্ম্মাণ খেলানার পার্শ্বে বিলাতী খেলানা অক্ষম অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়। জার্ম্মাণরা খেলানার জন্তুর গাত্রে স্বাভাবিকের অনুকরণে লোম পর্য্যন্ত দেখাইতে চেষ্টা করে।

ছাপাখানার কাযের কথায় মিষ্টার উইলিয়ামস এক জন ইংরাজ বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিলাতে ছাপাখানা হইতে মেয়েরা যখন কায করিয়া বাহির হয়, তখন তাহারা অপরিষ্কার —যেন কত দিন বেশপরিবর্ত্তন বা প্রসাধন করে নাই; আর জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশের মেয়েরা যখন ছাপাখানা হইতে কায করিয়া বাহির হয়, তখন তাহারা পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন—ঝক্‌ঝকে। মেয়েদের বেশে ও ব্যবহারে যে প্রভেদ, ছাপাখানার কাজেও সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। বিলাতের ছাপাখানার ভিতরটা অপরিষ্কার—অপরিচ্ছন্ন, কাযও তেমনই। জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের ছাপার কায পরিষ্কার—তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। এ সব কাযে খুঁটিনাটীতে মন না দিলে কায সুন্দর হয় না। জার্ম্মাণ, ডাচ, ফ্লেমিশ ছাপাখানাওয়ালারা খুঁটিনাটীতে খুব মন দেয়; তাহাদের কাযও পরিষ্কার হয়। বিলাতে ব্যবসায়ীরা এ দিকে দৃষ্টি দেয় না। এ জন্য বিলাতে স্বতন্ত্র প্রকারের শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার মনোমত মাল যোগাইতে বিশেষ চেষ্টা করে। বিলাতের ব্যবসায়ী ইংরাজের দ্বৈপায়ন-সংকীর্ণতাহেতু মনে করে, তাহার মতে যাহা ভাল, জগতের পক্ষে তাহাই ভাল। সে খরিদ্দারের রুচি বুঝিয়া মাল যোগাইতে চাহে না; বলে,—"আমার এই মাল; লইতে হয় লও; না লইতে চাহ, আমি থোড়াই গ্রাহ্য করি।" জার্ম্মাণ ব্যবসায়ী কিন্তু বলে,—"আমি এই মাল আনিয়াছি। যদি তোমার পছন্দ না হয়, তোমার পছন্দমত মাল আনিয়া দিব।" কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাত হইতে রুসিয়ায় লাল

শালুর রুমাল রপ্তানী হইত। সেটা বড় ব্যবসাই ছিল। রুসিয়ায় মেয়েরা সেই রুমালে মস্তক আবৃত করিত। বিলাতী রুমাল লম্বা ধরণের—বিষমবাহু চতুর্ভুজাকৃতি হইত। রুসিয়ার মেয়েরা সমবাহু চতুর্ভুজাকৃতি রুমাল চাহিত। সে কথা বিলাতের ব্যবসাদারদিগকে জানানও হইয়াছিল। কিন্তু বিলাতের ব্যবসায়ীরা মনে করিল, সে একটা বাজে কথা; বিশেষ রুমালের আকার পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে কল বদলাইতে হয়। কিন্তু রুসিয়ার মেয়েরা বিরক্ত হইতে লাগিল। এ দিকে জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা রুসিয়ার রঙ্গিণীদিগের রুচির সন্ধান রাখিয়া তদনুসারে রুমাল যোগাইল। বিলাতের ব্যবসা বন্ধ হইল—জার্ম্মাণী একটা নূতন ব্যবসার পত্তন করিল। যে দোষে বিলাতের ব্যবসায়ীরা রুসিয়ায় রুমালের ব্যবসা হারাইয়াছে, সেই দোষেই সার্ভিয়ায় লোহার ব্যবসায় ক্ষতিস্বীকার করিয়াছে। সে দেশের খরিদ্দারেরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। পিতৃপিতামহের সময় হইতে তাহারা যেমন আকারের জিনিষটি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, ঠিক তেমনই আকারের জিনিষ না হইলে যেন তাহাদের "মন উঠে" না। জিনিষ একটু মন্দ হইলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু আকারটি ঠিক পূর্ব্ববৎ হওয়া চাহি। তাহারা রন্ধনশালায় যে ছুরিকার ব্যবহার করে, তাহার বাটের কাছে ফলাটা বড় হওয়া চাহি। বিলাতী ব্যবসায়ী এমন অদ্ভুত ছুরি প্রস্তুত করিতে নারাজ; কিন্তু জার্ম্মাণরা খরিদ্দারের মনোমত মাল দিয়া সে ব্যবসা আত্মসাৎ করিয়াছে। তবে এ ক্ষেত্রে তাহারা মাল যে মন্দ যোগাইয়াছে, এমন নহে।

এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের লোক যেরূপ বাসন ব্যবহার করে, তাহার সন্ধান লইয়া, জার্ম্মাণী সেইরূপ বাসনই রপ্তানী করিয়াছে—কিরূপ গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করে, তাহার

সন্ধান লইয়া ঠিক সেইরূপ গাত্রবস্ত্রই পাঠাইয়াছে। ফলে ভারতের পল্লীগ্রামেও লোকের গাত্রে জার্ম্মাণ বস্ত্র—রন্ধনশালায় জার্ম্মাণ তৈজস-পাত্র। জার্ম্মাণীর অনেক মাল কেবল ভারতের বাজারে বিক্রয়ার্থই প্রস্তুত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘুন্‌সীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। সহরে যাহাই হউক, পল্লীতে এখনও ঘুন্‌সীর ব্যবহার আছে—বিশেষ সমাজের যে স্তরকে আমরা নিম্নস্তর বলি, সেই স্তরে। অসভ্যজাতির মধ্যে তাহার প্রেতাত্মার প্রভাব অতিক্রম করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ঘুন্‌সীর ব্যবহার আছে। ভারতে এই সামান্য জিনিষের ব্যবসা একটা বড় ব্যবসা। জার্ম্মাণী সব সন্ধান লইয়া সেই ব্যবসাটি হস্তগত করিয়াছিল। জার্ম্মাণ যুদ্ধে যে ভারতবাসী দোকানদারের ঘরে মাল মুড়িয়া দিবার কাগজের অভাব হইয়াছে—"পতি পরমগুরু" লিখা চিরুণীর অভাব হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, জার্ম্মাণী আমাদের অভাব বুঝিয়া কেমন করিয়া মাল দিয়া আসিয়াছে, আর আমরা কেমন করিয়া তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি।

বিলাতের ব্যবসায়ী বনিয়াদী বাঙ্গালীর মত অল্প জিনিষে মন দেয় না, বড় বড় কায না পাইলে করে না ; বলে, করিলে পোষায় না। কিন্তু জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা অল্প টাকার কায পাইলেও সাগ্রহে ও সযত্নে সে কায সুসম্পন্ন করে ; বলে—ভাল কায দিলে ক্রমে বেশী কায পাওয়া যাইবে। কোন বিলাতী কারবারের দালাল দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ৭৫ টাকার একটা কায লইয়াছিলেন বলিয়া কারবারের কর্ত্তা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "এ সব ছোট কায কোন বড় কারবারী করে না।" দালাল জার্ম্মাণদিগের কথা বলিলে বড়কর্ত্তা বলিয়াছিলেন,—"তাহারা জাহান্নমে যাউক।" পাঁচ বৎসর পরে দালাল আবার দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ফিরিলে কারবারের বড়কর্ত্তা বলিলেন, ব্যবসার বড়

ক্ষতি হইয়াছে। তখন দালাল বুঝাইয়া দিলেন, জার্ম্মাণরা সে বাজারে পশার জমাইয়া লইয়াছে; তাহারা ৭৫ টাকার কাযটি ভাল করিয়া করায় ক্রমে ৭ হাজার ৫ শত টাকার কায পাইয়াছে। তখন কর্ত্তার চক্ষু ফুটিল; তিনি ছোট কায করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তত দিনে জার্ম্মাণী সে বাজারে জাঁকিয়া বসিয়াছে। দালাল তখন বলিলেন, "আমি ছোট কায লওয়ায় আপনি আমাকে তিরস্কার করিয়া জার্ম্মাণদিগকে জাহান্নমে পাঠাইয়াছিলেন; এখন দেখিতেছি, তাহাদের ব্যবসা খুব চলিতেছে, আর আমাদের ব্যবসাই জাহান্নমে চলিল!"

বলিয়াছি, জার্ম্মাণরা খুঁটিনাটি উপেক্ষা করে না। জিনিষটি প্রস্তুত করিতে যেমন, পাঠাইতেও তাহারা তেমনই যত্ন লয়। তাহারা যেমন করিয়া জিনিষ সাজাইয়া পাঠায়, তাহাতে পথে জিনিষ কম ভাঙ্গে—যখন বাক্স হইতে বাহির করা হয়, তখন জিনিষটি সুন্দর দেখায়। এ সব ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের কৌশল। এ সবও সর্ব্বতোভাবে শিক্ষাসাপেক্ষ।

ইংরাজ ব্যবসায়ীরা খরিদ্দারদিগের মাতৃভাষা শিক্ষা করে না—দ্বিভাষী রাখিয়া কায চালায়—বিলাতী মাপে মাল সরবরাহ করে—ইংরাজীতে লিখিত বিবরণ পাঠায়। বিলাতের দূত মস্কৌ হইতে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণরা খরিদ্দারের মাতৃভাষা শিখে—তাহার মাপ মত তাহার আবশ্যক জিনিষ যোগায়—তাহার মাতৃভাষায় জিনিষের বিবরণ ছাপাইয়া তাহার কাছে পাঠাইয়া মালের প্রচার বাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

বিলাতী ব্যবসায় উন্নতির জন্য লর্ড রোজবেরী যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বিদেশে ইংরাজ দূতদিগকে সেই সব দেশে বিলাতের ব্যবসার অবস্থা ইংরাজ সরকারকে জানাইতে

আদেশ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে সরকারী বিবরণ হইতেই বিলাতের ব্যবসায়ীরা অবস্থা বুঝিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে সব বিবরণে বিলাতের ব্যবসায়ীদের যে উপকার হইয়াছে, জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগের তদপেক্ষা অধিক উপকার হইয়াছে। তাহারা সেই সকল বিবরণ হইতে দেশের ও ব্যবসার অবস্থা বুঝিয়া আপনাদের ব্যবসাবিস্তারের উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছে। জার্ম্মাণী ব্যবসাবিস্তারকে সাধনাতেই পরিণত করিয়াছিল।

জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগের সাহায্য করাই জার্ম্মাণ দূতগণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। কাযেই জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীর পণ্য লইয়া যে দালাল বিদেশে যায়, সে স্বদেশের রাজদূতের নিকট হইতেই আবশ্যক সাহায্য লাভ করিয়া ব্যবসাবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া আসিতে পারে। জার্ম্মাণ ব্যবসার বিস্তার করিতে পারিলে জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীর পদোন্নতি হয়। তাই সকল দেশেই জার্ম্মাণ রাজদূতগণ জার্ম্মাণীর ব্যবসাবিস্তারের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিলাতী সরকার এ দিকে দৃষ্টি দেন নাই। মিষ্টার মণ্ডাল্লা একবার সেফিল্ড সওদাগরীসভায় এ কথার আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণী ব্যবসাকেন্দ্র বাছিয়া তথায় দূত নিযুক্ত করে। মিলান ইটালীর একটা ব্যবসাকেন্দ্র। তথায় জার্ম্মাণীর একজন দূত থাকেন—তাঁহার জন্য জার্ম্মাণ সরকার বার্ষিক ১২ হাজার টাকা খরচ করেন। তথায় ইংরাজদূতের এক জন সহকারী মাত্র থাকেন। তিনি কাগজ কলম প্রভৃতি সরঞ্জামী খরচ সমেত বৎসরে ৭ শত ৫০ টাকা পাইয়া থাকেন। প্রধান ইংরাজদূত ফ্লোরেন্সে থাকেন। তথায় ব্যবসা নাই।

সব দিকেই দেখা যায়, জার্ম্মাণদিগের খবর লইবার ব্যবস্থা ভাল; সমরবিভাগেও বটে—ব্যবসা বিভাগেও বটে। সংবাদসংগ্রহপটুতাতেই তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসীদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। সেই

কারণেই তাহারা ব্যবসাক্ষেত্রে অন্যান্য দেশকে পরাভূত করিতেছিল। আর তাহারা সকল দিকেই বিশেষ সতর্ক—সুবিধার সন্ধানে সচেষ্ট—সুযোগ পাইলেই তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পটু।

জার্ম্মাণীর কারিগরী শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা যে এই কার্য্যে জার্ম্মাণীর সহায় হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অন্যান্য দেশে কারিগরী শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার তুল্য সমাদরলাভ করে না—জার্ম্মাণীতে সে শিক্ষাও সাধারণ শিক্ষারই তুল্য সমাদরের অধিকারী। মিষ্টার উইলিয়ামস বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীর কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় ইংলণ্ডের কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা বৈদ্যুতিক আলোকের কাছে প্রদীপের আলোক বলিয়া মনে হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার কর্পোরেশনই স্বীকার করিয়াছিলেন—জার্ম্মাণীতে কারিগরী শিক্ষা সাধারণ শিক্ষাবিভাগের "বাজে কায" নহে—সে শিক্ষা সর্ব্বব্যাপী—প্রাথমিক শিক্ষারই মত সমাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ। ভবিষ্যতে যে যে ব্যবসা অবলম্বন করিবে, অতি অল্প বয়স হইতে তাহাকে সেই ব্যবসায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। এ কার্য্যে জার্ম্মাণ সরকারের ব্যয়কুণ্ঠা নাই। সার্লটেনবার্গের বিজ্ঞানবিদ্যালয়ে ৮৬ জন অধ্যাপক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; মিস্ত্রীখানা, পরীক্ষাগার, পুস্তাকাগার সবই সুসজ্জিত—পুস্তকাগারে ৫২ হাজার পুস্তক বিদ্যমান। বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণে ৬০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। সেমনিজ সহরের অধিবাসিসংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার—তথায় বিজ্ঞানবিদ্যালয়ে ১৮৯০—৯১ খৃষ্টাব্দে ৭ শত ৭০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। জার্ম্মাণ ছাত্রের বাণ্মাষিক বেতন ৪৫ টাকা মাত্র—বিদেশী ছাত্রদিগকে ৯০ টাকা দিতে হয়। জার্ম্মাণীতে বিদেশী ছাত্রকে দ্বিগুণ বেতন দিতে হয়, আর বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদিগের একতৃতীয়াংশ বিদেশী। তাহারা বিলাতে বিদ্যার্জ্জন করিয়া

যাইয়া বিলাতের সহিত প্রতিযোগিতায় স্বদেশবাসীদিগকে সাহায্য করে।

জার্ম্মাণীতে যেমন, আমেরিকাতেও তেমনই কারিগরী শিক্ষার উদ্দেশ্য—ব্যবসায় উন্নতিলাভ করা। সে জন্য যতটুকু শিক্ষা প্রয়োজন, ততটুকু শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই আছে। মিষ্টার লসন তাঁহার American Industrial Problems গ্রন্থে এ কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিলাতের শিক্ষা অনেকটা সৌখীন—লিখিবার জন্য—বক্তৃতা করিবার জন্য। যে বিদ্যার্থী কারিগরী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে, মার্কিণে সে কারখানায় কায পায়। বিলাতের মত তথায় অনেক টাকা 'প্রিমিয়ম' (প্রবেশিক) দিয়া কারখানায় প্রবেশ করিতে হয় না।

আজকাল এ দেশেও কারিগরী শিক্ষাদানের কথা হইতেছে, স্থানে স্থানে ব্যবস্থাও যে না হইতেছে এমন নহে। সেই জন্যই জার্ম্মাণীর ও আমেরিকার কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার কথার আলোচনা করিলাম। কারিগরী শিক্ষা যদি দেশের শিল্পের ও শিল্পীর অবস্থার উপযোগী না হয়, তবে সে শিক্ষাদান উষরে বীজ বপনের মত ব্যর্থ হইয়া যায়। বিলাতী বা মার্কিণ বা জার্ম্মাণ প্রণালীতে এ দেশে কারিগরী শিক্ষা দিলে হইবে না। এ দেশের যে "জাতিভেদে" বিদেশীয় বিবেচনায় সমাজে অপকার ব্যতীত উপকার হয় না, সেই জাতিভেদই এতকাল এ দেশের শিল্প জীবিত রাখিয়াছে ; তাহারই ফলে এ দেশের শিল্প এককালে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল ; তাহারই ফলে এ দেশের শিল্প মরিয়াও মরে নাই—কুটীরে অনাদৃতভাবে এখনও জীবিত রহিয়াছে,দুর্দ্দিনে সুদিনে সৌভাগ্যলাভের আশায় পথ চাহিয়া আছে। সেই "জাতিভেদ" এ দেশের শিল্পের একরূপ মূলধন। সার জর্জ্জ বার্ডউড স্বীকার করিয়াছেন, পুরুষানুক্রমে একই ব্যবসায় লিপ্ত থাকায় শিল্পকৌশল ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে

স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু শিল্পীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত—পিতৃপুরুষের কষ্টার্জ্জিত এই শিল্পকৌশল কে হেলায় হারাইতে চাহে? তাহা কিসের আশায় আমরা ত্যাগ করিব। যিনি উড়িষ্যায় বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠা করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন,সেই শ্রীযুত মধুসূদন দাস হিন্দুধর্ম্ম-ত্যাগী হইয়াও বিলাতে ব্যবসাক্ষেত্রে হিন্দুর জাতিভেদ ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই জাতিভেদ প্রথায় শিল্পশিক্ষার্থীকে প্রাবেশিক দিয়া ব্যবসা শিক্ষা করিতে হয় না—পুত্র পিতার কাছে সে শিক্ষা পায়, পিতা সস্নেহে পুত্রকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহার ফলে এ দেশের উটজ শিল্প সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল—এ দেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হইয়াছিল—এ দেশে প্রতীচ্য 'ইণ্ডস্ট্রিয়ালিজমের' অবশ্যম্ভাবী কুফল—ধনীতে ও কারিগরে বিবাদ ঘটিতে পারে নাই। এ দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে এ শিক্ষা ত্যাগ করিয়া নূতন করিয়া শিখিতে হইবে, তাহাতে সাফল্য লাভে বিলম্বই ঘটিবে। এ দেশের লোকের ও সরকারের যখন ধারণা জন্মিয়াছে, শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না, তখন কারিগরী শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থাও হইবে। তখন যেন আমরা বিদেশের সাফল্যে মুগ্ধ হইয়া সে সাফল্যের কারণানুসন্ধান না করিয়াই স্বদেশে বিদেশী প্রথার সাফল্য লাভের দুরাশাচালিত না হই। শিক্ষা দেশোপযোগী—সমাজোপযোগী না হইলে ব্যর্থ হইয়া যাওয়া অনিবার্য্য, সে কথা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

শিল্পে ও বাণিজ্যে জার্ম্মাণী যে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে এ বিভাগে জার্ম্মাণীর কৃতকর্ম্মের বিবরণ বিবৃত করিলাম। কোন জাতির আন্তরিক চেষ্টায় শিল্পের ও বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, জার্ম্মাণী তাহা

দেখাইয়াছে। এ বিষয়ে জার্ম্মাণী জগৎকে যে শিক্ষা দিয়াছে,তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। যুদ্ধের পর জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য যেরূপেই পুনর্গঠিত হউক না কেন —জার্ম্মাণী যে বিজ্ঞানকে মানবের কার্য্যে প্রযুক্ত করিয়াছে, সে কথা চিরদিনই স্বীকৃত হইবে।

জার্ম্মাণীর শিল্পের ও বাণিজ্যের বিস্তারবিষয়ের আলোচনা করিলে হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়ে ও দুঃখে পূর্ণ হয়। বিস্ময় মানুষের ক্ষমতা দেখিয়া, মানুষ ইচ্ছা করিলে কত কায করিতে পারে—কেমন করিয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহার গুপ্ত ধনের সন্ধান করিয়া, সে ধন সংগ্রহ করিতে পারে তাহা দেখিয়া; আর দুঃখ সেই ক্ষমতার অপব্যবহার দেখিয়া। যে ক্ষমতা সুপ্রযুক্ত হইলে মানবের কত কল্যাণ সাধিত করিতে পারে,সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া জার্ম্মাণী কেবল যে আপনার বহু কালের—বহু যত্নের—বহু সাধনার সিদ্ধি ত্যাগ করিয়াছে, তাহাই নহে, পরন্তু জগতের উন্নতি-মন্দিরের দ্বারে সভ্যতার মঙ্গলঘট অমঙ্গল-পদাঘাতে চূর্ণ করিয়াছে। সে জড়বাদী হইয়া অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া—ক্ষমতা-মদিরাপানে মত্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুরাকাঙ্ক্ষায় সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আত্মাহুতি দিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে শত শত বৎসরের সভ্যতাও বিনষ্ট করিয়াছে। সে সমগ্র সভ্য জগৎ বিরাট শ্মশানে পরিণত করিয়াছে—সেই শ্মশান শবাকীর্ণ—হাহাকার-ধ্বনিত—চিতাধূমাচ্ছন্ন—ভয়ঙ্কর।

বিকট নখর দন্ত মানবের পাশব প্রকৃতি
সভ্যতার স্তম্ভ ভেদি' বাহিরিল নৃসিংহ-আকৃতি।

এই শ্মশানে শবসাধনা করিয়া কে সভ্যতার গতি পরিবর্ত্তিত করিবেন—অমঙ্গলের মধ্য হইতে মঙ্গল বিকশিত করিয়া আবার জগতে শান্তি সংস্থাপিত করিবেন?

পরিবর্ত্তন।

আমরা বর্ত্তমান পুস্তকে যে জার্ম্মাণীর বিবরণ বিবৃত করিতেছি, তাহাকে নবীন জার্ম্মাণী বলিয়াছি। কারণ, সে জার্ম্মাণী সর্ব্বতোভাবে পুরাতন জার্ম্মাণী হইতে বিভিন্ন। নবীন জার্ম্মাণী নূতন জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সংগঠন হইতে সৃষ্ট। কিন্তু তাহার নবীনত্ব কেবল রাজনীতিক পরিবর্ত্তনে প্রকট হয় নাই; পরন্তু সকল দিকেই সপ্রকাশ। জার্ম্মাণী কিরূপ দ্রুতভাবে কৃষিপ্রধান দেশ হইতে ব্যবসাপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে, অথচ কৃষির অনাদর করে নাই. তাহা আমরা দেখাইয়াছি। সকল দিকেই সেইরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। যেমন কোন স্থানে নূতন প্রবাহপথ সৃষ্ট হইলে সে স্থানের নানারূপ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য; তেমনই কোন দেশে প্রবল পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের লোকের ও সমাজের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। জার্ম্মাণীতে-সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। অথচ য়ুরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে জার্ম্মাণীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন পুরাতনের প্রভাব ছিল। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও বার্লিন সহরের উপকণ্ঠে প্রাচীন প্রথা লক্ষিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন প্রথা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়। সত্য বটে, ভিস্চুলার সান্নিধ্যে এখনও স্থানে স্থানে দেখা যায়—"বসি অঙ্গিনার কোণে, গম ভাঙ্গে দুই বোনে"; সত্য বটে, সেই প্রদেশে এখনও বিবর-

গণ ডোঙ্গা বাহিয়া মাছ ধরে; সত্য বটে এখনও কোন কোন স্থানে রেলপথ বিস্তৃত না হওয়ায় সে কালেরই মত ডাকগাড়ীতে ডাক বাহিত হয়; কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্তও অধিক দেওয়া যায় না।

নূতন সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান দোষ, তাহা বৈষম্য ও বৈচিত্র্য বিনষ্ট করিয়া যে সমতার প্রবর্ত্তন করে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের হানি হয়। আমাদের দেশে আমরা সেই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি। এখন আর ভাদ্র মাসে নষ্টচন্দ্রের আমোদ নাই, আশ্বিনের শেষে আশুধান্য ঘরে উঠিলে আর সে "গারসী" গান নাই—

"আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে
মা লক্ষ্মী পাটে বসে"

শ্রীপঞ্চমীতে আর সে হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রব্যবহার নাই, দোলে আর সে আবির খেলা নাই, পূজাপার্ব্বণ বন্ধ। জার্ম্মাণীতেও সেইরূপ সব পুরাতন উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথায় এখন লতাবৃত কুটীর ভাঙ্গিয়া শত পরিবারের বাসের জন্য পারাবতাশ্রয়ের মত সৌধ রচিত হইতেছে—সহরের সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণীর এই পরিবর্ত্তনের দ্রুততাহেতু অন্যান্য দেশে পুরাতনকে যেরূপ ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত করিয়া নূতন তাহার স্থান অধিকৃত করিয়াছে জার্ম্মাণীতে তেমন হয় নাই। এই দ্রুততার চিহ্ন সমাজে সপ্রকাশ না হইয়া যায় না। অন্যান্য দেশের বহু শতাব্দীব্যাপী পরিবর্ত্তন জার্ম্মাণী ৩০ বৎসরে সংসাধিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাহাতে সমাজে একটা বিক্ষোভ বা বিকৃতি—বেমানানভাব থাকিয়া যাইবেই। তাই নবীন জার্ম্মাণীর কোন কোন প্রথায় বিদেশী ছাপ সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। জার্ম্মাণ সহরগুলিকে প্যারিসের আদর্শে গঠিত করিবার জন্য জার্ম্মাণের যেমন ব্যাকুলতা আবার খাদ্যদ্রব্যের ফরাসীনাম গ্রহণে তাহাদের তেমনই

আপত্তি! জার্ম্মাণ সহররচনায় ফরাসী অনুকরণ দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যসঞ্চারের কৌশলের অভাবই লক্ষিত হয়। জার্ম্মাণ মহিলারা ফরাসী মহিলাদিগের অনুকরণে সজ্জা করেন; কিন্তু সে সজ্জা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক বোধ হয় না, তাই তাহাতে সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি না হইয়া সৌন্দর্য্যহানিই হয়।

কিন্তু সব কাযেই জার্ম্মাণী সরকারের প্রাধান্য স্বীকার করায় জার্ম্মাণীতে সমাজে যেন একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা যেন একটা স্বতন্ত্র ও উচ্চ বর্ণের। জার্ম্মাণীতে সব কাযে সরকারের শাসনহেতু সরকারী কাযও অনেক—কর্ম্মচারীও অনেক। সেই সব পদের উচ্চনীচতানুসারে সে সমাজে সম্মানের তারতম্য হয়। এ বিষয়ে আতিশয্য বিস্ময়কর। এমন কি জার্ম্মাণ সংবাদপত্রসমূহও সময় সময় এই আতিশয্য সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তবে বিলাতে থ্যাকারে, কলিকাতায় রসরাজ "ধীরাজ" যেমনভাবে চাবুক চালাইয়া এ সব অনাচারের প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীতে কেহ তেমন ভাবে চেষ্টা করেন নাই। সেও বোধ হয় সরকারী শাসনের উপর অতিরিক্ত আস্থার জন্য।

সরকারীকর্ম্মচারীর পরই উপাধিধারিসম্প্রদায়। তাঁহারাও কম নহেন। এ বিষয়ে জার্ম্মাণদিগের দুর্দ্দশা আমাদেরই মত। শূন্যগর্ভ সম্মানের আশায় লোক লোলুপ—মেডেলের মোহে মুগ্ধ।

জার্ম্মাণীতে ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের প্রভাবের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাস্তবিকই পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রভাব প্রবলই ছিল। কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সত্য বটে, এখনও প্রাসিয়ায় ভূম্যধিকারিসম্প্রদায় হইতেই সরকারী চাকুরিয়াদিগের অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়া থাকেন; সত্য বটে, এখনও প্রাসিয়ায়

উপাধিধারী অভিজাতবংশের সন্তানগণই চাকরীর ক্ষেত্রে অধিক আদৃত; সত্য বটে, এখনও প্রাসিয়ায় অভিজাতসম্প্রদায়ই শাসনব্যাপারে প্রবল—কিন্তু তাঁহাদের সে প্রতাপ কমিয়া আসিতেছে। কমিবারই কথা। যতদিন জার্ম্মাণী কৃষিপ্রধান ছিল, ততদিন ভূম্যধিকারীদিগের যে প্রতাপ ছিল, শিল্পবাণিজ্যপ্রধান জার্ম্মাণীতে তাঁহাদের সে প্রতাপ থাকা সম্ভব নহে। ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদিগের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতেছে; বিলাতের মত জার্ম্মাণীতেও Merchant princes দেশের শাসনযন্ত্রপরিচালনকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতেছেন—তাঁহাদের স্বার্থের জন্য নূতন নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আর তাঁহাদের প্রভাব যত বাড়িতেছে, প্রাচীন ভূম্যধিকারীদিগের প্রভাব তত কমিতেছে। যে ব্যবসার ক্ষেত্রে জার্ম্মাণী আর সব দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়া অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, সেই ব্যবসার উন্নতি যাঁহাদের দ্বারা সংসাধিত হয়, সেই ব্যবসায়ীদিগের প্রভাববৃদ্ধি অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী।

এমন কি কৈসার দ্বিতীয় উইলিয়মও সময় সময় ব্যবসায়ীদিগের মন্ত্রণাচালিত বলিয়া ভূম্যধিকারিসম্প্রদায়ের বিরাগভাজন ও সেই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু বহুকাল হইতে তাঁহারা অবাধে যে ক্ষমতা সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই ক্ষমতার হ্রাসে দুঃখিত ভূম্যধিকারীরা এ বিষয়ে কালের গতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই—পরিবর্ত্তনের অনিবার্য্যতা উপলব্ধি করিয়া নূতন অবস্থার উপযোগী হইতে শিখেন নাই। আমাদের দেশের জমীদারদিগেরই মত তাঁহারা পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনপর না হইয়া কেবল অকারণ অসন্তোষের অভিব্যক্তির দ্বারা আপনাদের অজ্ঞতাই ঘোষিত করিয়াছেন।

জার্ম্মাণরা যে পদ্ধতিবদ্ধভাবে কায করিতে পটু, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, দেশপ্রচলিত সামরিক শিক্ষা সে পটুতার অন্যতম কারণ। কিন্তু এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সামাজিক গুণে জার্ম্মাণরা প্রশংসার্হ। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বহু জার্ম্মাণ ব্যবসায়ী কলিকাতার য়ুরোপীয় সমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। তাঁহাদের সামাজিক শিষ্টাচারগুণে তাঁহারা সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সত্য বটে, এমন সন্দেহ করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জার্ম্মাণ সরকারের চর ছিলেন—সরকারের নির্দ্দেশেই—অনেক সময় সরকারেরই ব্যয়ে য়ুরোপীয় সমাজে বন্ধুভাবে মিশিয়া সব সংবাদ সংগ্রহ করিতেন; কিন্তু সকলের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। জার্ম্মাণ বণিক সকলেই যে জার্ম্মাণ সরকারের চররূপে কায করিতেন, এমন কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু সামরিক শিক্ষার ফলে জার্ম্মাণরা সব কাযেই নিয়মের নিগড়বদ্ধ হইতে ভালবাসে—সব কাযেই নিয়মমত চলিতে চাহে। ইহা যেন তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছে। তাহারা একক অতর্কিত ভাবে কোনো কায করিতে ভালবাসে না বলিয়াই কথায় কথায় সমিতি সংগঠিত করে। তাহাদের সমিতিসংগঠনবাসনা এতই বলবতী যে, কোন জার্ম্মাণ লেখক বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, যদি একটি জনশূন্য দ্বীপের এক ভাগে দুই জন ফরাসীকে, এক ভাগে দুই জন ইংরাজকে, আর এক ভাগে দুই জন জার্ম্মাণকে রাখিয়া আসা হয়, তবে পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে ফরাসীদ্বয় আপনাদের প্রেমের কথার আলোচনা করিতে থাকিবে, ইংরাজদ্বয় দুইটি গিরিচূড়ায় উঠিয়া মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় কেহ তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত পরিচিত করাইয়া দিবে বলিয়া অপেক্ষা করিবে, আর জার্ম্মাণদ্বয় সেই দ্বীপ দেখিবার জন্য একটা সমিতি সংগঠিত

করিবে। ইহাতে ফরাসীর প্রেমপ্রবণতা, ইংরাজের দ্বৈপায়ন-সঙ্কীর্ণতা ও জার্ম্মাণের সমিতিসংগঠনবাসনা ব্যক্ত হইয়াছে। এক একজন জার্ম্মাণ ৩টি ৪টি সমিতির সদস্য। জার্ম্মাণগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কায করিতে ভালবাসে বলিয়াই কথায় কথায় সমিতিসংস্থাপন করে।

জার্ম্মাণরা সামাজিক হইলেও যাহারা মিশিতে চাহে না, তাহাদিগের সঙ্গে মিশিতে ব্যস্ত হয় না। জার্ম্মাণীতে নিয়ম, নবাগত স্থানীয় লোক-দিগের গৃহে প্রথমে যাইবে। অর্থাৎ যদি পুরাতন অধিবাসীরা বুঝিতে পারেন যে, নবাগত তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে চাহে, তবে তাঁহারা তাহার সঙ্গে মিশিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া এক জন জার্ম্মাণ যে আর এক জনকে অল্প পরিচয়েই বিশ্বাস করে, এমন নহে। জার্ম্মাণীতে পরিচিত হইলেই কেহ কাহাকেও বন্ধু বলিয়া মনে করে না।

বিদেশী লেখকগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন, জার্ম্মাণরা নারীর সম্মান জানে না, জার্ম্মাণীতে মেয়েরা তৈজসপাত্রেরই সামিল। মার্কিণ লেখক প্রাইস্ কলিয়ার সমাজের সব স্তরেই এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, সভ্যসমাজে মেয়েরা যেন পুরুষের কৃপার পাত্র, নিম্নস্তরে স্ত্রীলোকের প্রতি রূঢ় ব্যবহারও দেখা যায়। আর তিনি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, জার্ম্মাণরা সংপ্রতি দারিদ্র্যমুক্ত হই-তেছে বলিয়া দারিদ্র্যসঞ্জাত অসভ্যতার চিহ্ন আজও পরিহার করিতে পারে নাই। তাহারা সহসা যে সভ্যতার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে, তথায় তাহারা অনভ্যাসহেতু স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে বিদেশীদিগের মতের মূল্য অতি সামান্য তাহা আমরা—ভারতবাসীরা বিশেষ অবগত আছি। বিদেশী লেখকগণ আমাদের সমাজের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচয়হেতু সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, আমা-দের দেশে নারীরা "দাসীসম কেনা"—আমরা তাঁহাদিগকে গৃহ-পিঞ্জরে

বন্ধ করিয়া রাখি, আলোক বাতাস সুখ সব হইতেই তাঁহারা বঞ্চিতা। অথচ হিন্দু সংহিতাকার যে ভাবে বলিয়াছেন, যে গৃহে নারী পূজিতা,সে গৃহে দেবতারা তুষ্ট,সে ভাবের অভিব্যক্তি আর কোন দেশের সংহিতায় লক্ষিত হয় না। এমন কি কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই স্ত্রীবধ পুরুষবধ অপেক্ষা অধিক পাপজনক বলিয়া বর্ণিত। আমাদের গৃহে নারীরই প্রাধান্য, নারীই গৃহের শ্রী। আর বিদেশী দর্শকদিগের মতে আমাদের দেশেই রমণী অনাদৃত ও অবজ্ঞাত! জার্ম্মাণীর সমাজে রমণীর স্থান ও প্রভাব-সম্বন্ধেও বিদেশী লেখকদিগের ধারণা ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে—সকল জাতির আচারব্যবহার একরূপ নহে—একই রূপ হইতে পারে না। সুতরাং এক জাতির আদর্শে অন্য জাতির সামাজিক অবস্থার ও ব্যবস্থার বিচার করিলে সে বিচার ভ্রান্তিমুক্ত হয় না।

স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে ধারণায় একটি বিষয়ে জার্ম্মাণগণ ভারতের হিন্দুর আদর্শের সন্নিহিত হইয়াছে। হিন্দুর নিকট রমণীর সর্ব্বপ্রধান গৌরব মাতৃত্বে। এক প্রাচীন ইহুদীরা ভারতবাসী হিন্দুদিগের মত রমণীর বন্ধ্যাত্ব লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করিত। হিন্দুর নিকট রমণীর সর্ব্বপ্রধান গৌরব, রমণী জাতির ধারা রক্ষা করেন বলিয়া—পিণ্ড-দাতার প্রসূতি বলিয়া। বিলাসব্যসনে বিপন্ন য়ুরোপ এই কথা বিস্মৃত হইতেছিল; ইহার ফলে ফ্রান্সে কিরূপ লোকক্ষয় হইয়াছে, তাহা আমরা পুস্তকের আরম্ভেই দেখাইয়াছি। বিলাতেও রমণীরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রভেদ উৎপাটিত করিয়া পুরুষের সহিত সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভের জন্য যে আন্দোলন করিতে-ছিল—তাহার ফলে সমাজ বিকৃত রূপ ধারণ করিত। বর্ত্তমান যুদ্ধে সে আন্দোলন নষ্ট হইয়াছে। দেশের জনসংখ্যাহ্রাসের ফল বুঝিয়া য়ুরোপে আবার বিবাহের জন্য ব্যাকুলতা লক্ষিত হইয়াছে; রমণী আবার মাতৃত্ব-

গর্ব্ব অনুভব করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সমাজে আবার শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতেও জননী বলিয়া রমণীর বিশেষ আদর। তবে হিন্দুর আদর্শে ও জার্ম্মাণের আদর্শে প্রভেদও প্রবল। হিন্দুর সন্তানলাভকামনা ধর্ম্মার্থ, জার্ম্মাণের সন্তানলাভকামনা জয়ার্থ। সরকার দেশের সামরিক শক্তি বর্দ্ধিত করিতে চাহেন—আরও সৈনিক চাহি, সুতরাং সন্তানের প্রয়োজন। সরকারও জননীদিগের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারের ধাত্রী সরবরাহের ব্যবস্থা—কারখানার স্ত্রীলোকদিগের শ্রমের মাত্রানির্দ্দেশক ব্যবস্থা—এ সবই জননীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, সন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য কল্পিত।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম্মের দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জিতিয়াছে, আর জার্ম্মাণ ধর্ম্মকে ছাড়িয়া প্রবৃত্তিকে অবর্জ্জিত করিয়া হারিয়াছে। জার্ম্মাণীতে জারজ সন্তানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ফ্রেডরিক দি গ্রেটের সময় হইতে জার্ম্মাণীতে এ পাপসম্বন্ধে যেরূপ শিথিলতা লক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণীর নৈতিক হীনতাই সপ্রকাশ। জার্ম্মাণীতে যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ অবস্থায় ধর্ম্মের শাসন না থাকিলে সমাজে পাপের প্রবাহবেগ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই জার্ম্মাণীতে এ পাপ প্রবল হইয়াছে। জড়বাদমূলক সভ্যতা এ সব দিকে বড় লক্ষ্য করে না। নহিলে যে খৃষ্টানরা বিবাহের সময় ধর্ম্ম সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করে—পতিপত্নী মৃত্যু পর্য্যন্ত পরস্পরকে ত্যাগ করিবে না—তাহাদেরই মধ্যে আবার "বনিবনাও হয় না"—এমন তুচ্ছ কারণেও বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়; সেই সমাজেও স্ত্রীলোকরা বিবাহকে আইনসঙ্গত বারাঙ্গনাবৃত্তি বলিতে কুণ্ঠা বোধ করে না! তাই বলিয়াছি,এ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম্মের জন্যই জিতিয়াছে, আর জার্ম্মাণ ধর্ম্মকে ছাড়িয়াই হারিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জার্ম্মাণীতে বালিকাদিগের শিক্ষাপদ্ধতি বালকদিগের শিক্ষাপদ্ধতিরই অনুরূপ হইলেও সে দিকে সরকারের বা মিউনিসিপ্যালিটির তেমন দৃষ্টি নাই। তাহার কারণ, জার্ম্মাণদিগের বিশ্বাস, দেশে পুরুষদিগের বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন যত অধিক, স্ত্রীলোকদিগের প্রয়োজন তত অধিক নহে। এরূপ বিশ্বাসের কারণ, জার্ম্মাণীতেও পূর্ব্বে গৃহই রমণীর কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইত—যে ব্যবস্থায় সমাজে শৃঙ্খলা ও শ্রী থাকে, সেই ব্যবস্থাই প্রবল ছিল। এখন কিরূপে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা পরে বলিব। কোন কোন সমিতি এমন মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্ত্রীজনোচিত কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যে মেয়েদের নিয়োগপথ বন্ধ করিয়া, তাহাদের উপার্জ্জনের উপায় সীমাবদ্ধ করাই সঙ্গত। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় এই যে, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে প্রায় এক কোটী স্ত্রীলোক নানাকার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, কেহ কেহ বিবাহিতা রমণীদিগের রোজগারের জন্য শ্রম করিবার প্রতিকূল মতও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে এক কোটী স্ত্রীলোকের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আবার ৩০ লক্ষ বিবাহিতা। তাহারা যদি কর্ম্মচ্যুতা হয়, তবে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় কিসে? এ সব সমস্যার সমাধান সময়সাধ্য।

পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে মেয়েরাই গৃহকার্য্য করিতেন—রন্ধনাদির ভার তাঁহাদের ছিল। এখন সমাজে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে লোক আশীর্ব্বাদ করিত, "তুমি লক্ষপতি হও।" তখন লক্ষ টাকাই অনেক ছিল। এখন লক্ষ টাকা অনেকেরই আছে; কিন্তু কাহারও অভাব ঘুচে না। অভাবও কেবলই বাড়িতেছে। কবি হেমচন্দ্র 'বাঙ্গালীর মেয়ের' বর্ণনায় বলিয়াছেন—

কার্পেটে কারচুপী কায কারু নব্য চাল ;
ঘর-কন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধতে ডাল।

জার্ম্মাণীতেও তেমনই হইয়াছে। ধনাগমে অর্থাৎ ধন বিভাগের বিপর্য্যয়ে, সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তনে এখন আর জার্ম্মাণ মহিলারা হাতাবেড়ী ধরিতে ভালবাসেন না। অবস্থা এ দেশেও যেমন, জার্ম্মাণীতেও তেমনই। আমাদের দেশে উৎকলাগত রন্ধনকার্য্যে অপটু পাচকগণ যেমন আমাদের রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, জার্ম্মাণীতে তেমনই অশিক্ষিত পাচকদিগের উপরই রন্ধনকার্য্যের ভার দিতে হয়। বিলাতে বহুদিন হইতে গৃহকার্য্য দাসদাসীদিগের হস্তগত হওয়ায় সুশিক্ষিত দাসদাসী সুলভ হইয়াছে ; তাহারা যে যাহার কায সুসম্পন্ন করিতে পারে। জার্ম্মাণীতে এ পরিবর্ত্তন নূতন। সেই জন্য অদ্যাপি স্বতন্ত্র দাসদাসীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। তাই তথায় প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় দাসদাসীর একান্ত অভাব। জার্ম্মাণীতে মহিলারা গৃহকার্য্যের ভার ত্যাগ করিয়াছেন, অথচ সে ভার লইবার লোকেরও অভাব। ইহাতে যে সংসারে অজস্র অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এ সব অসুবিধার স্বরূপ আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি ও শিখিতেছি।

আমরা জার্ম্মাণীর শিক্ষাসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, যাহাতে বালিকারা কারখানা ও দোকানে কায করিতে না যায়, সেজন্য এখন চেষ্টা চলিতেছে। সে চেষ্টা নিষ্ফল না হইলেও দিবাভাগে কায করিয়া সন্ধ্যা সাতটার পর "স্বাধীনতা" সম্ভোগের লালসায় অনেক কিশোরী ও যুবতী কারখানায় কায করিতে যায়। শিক্ষায় তাহাদের সে লালসা নিবৃত্ত হইতেছে না। ফলে, কিন্তু সমগ্র জাতির অনিষ্ট অনিবার্য্য।

জার্ম্মাণীতে পূর্ব্বে দাস-দাসীর বাহুল্য ছিল না বলিয়াই সেকালের

গৃহগুলিতে দাস-দাসীর বাসযোগ্য কক্ষের অভাব। তবে আজকাল যে সব নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, সে সকলে সামাজিক পরিবর্ত্তন বুঝিয়া তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অনেক পুরাতন গৃহে রন্ধনশালার দিকে একটিমাত্র জানালাওয়ালা সঙ্কীর্ণ কক্ষই দাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে—তাহাতে মানুষ সরলভাবে দাঁড়াইতেও পারে না। আজকাল পুলিস এরূপ কক্ষে দাসীদিগের বাসব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু আর একটা গবাক্ষ করিয়া দিলেই আইনের দৃষ্টিতে দোষ কাটিয়া যায়।

দেশের ধনবৃদ্ধিতে ও সহরের সংখ্যাবৃদ্ধিতে লোকের সামাজিক নিমন্ত্রণাদির সংখ্যা বাড়িয়াছে—অথচ দেশে গৃহকার্য্যের উপযোগী দাস-দাসীর অভাব রহিয়া গিয়াছে। ফলে হোটেলের আধিক্য হইয়াছে। অনেক স্থলে রবিবারে বা অন্য ছুটীর দিন পরিবারস্থ সকলেই হোটেলে আহার করিতে যাইয়া থাকেন। সে দিন হোটেলে স্থান পাওয়া দুষ্কর হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় যে গার্হস্থ্য সুশৃঙ্খলার অভাব অনিবার্য্য হয়, তাহা জার্ম্মাণরাও বুঝিতেছে। জার্ম্মাণীর সংবাদপত্রাদিতেও অনেক সময় এইরূপ ব্যবস্থার নিন্দা প্রকাশিত হয়।

ইংরাজীতে যাহাকে public life বলে, তাহা আমাদের দেশে সামাজিক জীবনের বাহিরের অংশ—যে অংশে দেশের ও দশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সেই অংশ বলা যাইতে পারে। বিলাতে ও মার্কিণে সামাজিক জীবনের সে অংশেও মহিলারা অনেকটা অধিকার লাভ করিয়াছেন। বিলাতে এক দল মহিলা সেই অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া লইবার জন্য বিষম আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া গৃহদাহ, চিত্রনাশ প্রভৃতি বিষম অনাচারও করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জার্ম্মাণীতে গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত মহিলারা সামাজিক

জীবনের সে অংশে কোন অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা গৃহকর্ম্মই করিতেন—পুরুষের অধিকার-ক্ষেত্রে "অনধিকার প্রবেশের" চেষ্টা করেন নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেক রাজ্যে সন্তানের উপর মহিলাদিগের আইনসঙ্গত কোন অধিকার ছিল না ; তাঁহারা কোন দলিলে সাক্ষী হইতে পারিতেন না ; বিশেষ অনুমতি ব্যতীত আদালতে কোন মামলায় পক্ষ হইতেও পারিতেন না। সেই জন্য বিলাতের লোক যেমন আমাদিগের সামাজিক অবস্থার স্বরূপ না বুঝিয়া বিদ্রূপ করেন, তেমনই জার্ম্মাণীর সম্বন্ধেও বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন—জার্ম্মাণীতে মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্বে পুতুল, বিবাহের পর দাসী। কিন্তু—

"পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কা'র হেন সাধ্য যে সে রোধে তা'র গতি ?"—

যে সভ্যতা য়ুরোপের অন্যান্য দেশ প্লাবিত করিয়াছে, তাহার তরঙ্গ-তাড়নে জার্ম্মাণীতেও সমাজে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন জার্ম্মাণীতে মহিলারা ডাক্তারের, ব্যবহারাজীবের,অধ্যাপকের, স্থপতির, ও এঞ্জিনিয়ারের কায করিতেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহারা দেখা দিতেছেন। ইহাতে ফল কেমন হইবে বলা যায় না। তবে মহিলাদের কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ হইতে ক্রমে গৃহের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট হইলে যে, গৃহে লক্ষ্মীর অভাবে "লক্ষ্মীছাড়ার দল" বর্দ্ধিত হয় তাহার প্রমাণ আমরা অনেক পাইয়াছি। কিন্তু আমরা দূরস্থ স্বতন্ত্র সমাজের অধিবাসী ও স্বতন্ত্র সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়াও যে পরিবর্ত্তন-প্রবাহ প্রতিহত করিতে পারি নাই, জার্ম্মাণী তাহা প্রতিহত করিবে কেমন করিয়া ?

জার্ম্মাণরা অতি অল্পেই আনন্দলাভ করিতে পারে। ইহাতে বুঝা যায়, তাহারা অল্পেই তুষ্ট—আনন্দসম্ভোগ করিতেই ইচ্ছা করে—আনন্দের উপকরণ বিশেষ করিয়া বিচার করে না। সে বিচারের ভার তাহারা বিশেষজ্ঞের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। সব বিষয়ে—বিশেষ কলাবিষয়ে তাহারা সমালোচনার ভার বিশেষজ্ঞকে দেয়। ইহার কারণও সহজেই অনুমেয়। জার্ম্মাণীর শিক্ষাপ্রণালীতে বিশেষজ্ঞের বাহুল্য অনিবার্য্য। কাযেই সাধারণ লোক অনেক বিষয়ে সেই সম্প্রদায়ের মতই গ্রহণ করিয়া থাকে। তবে কোন কোন বিষয়ে জার্ম্মাণগণ যে সরলতার পরিচয় দেয়, য়ুরোপে অন্য কোন দেশে তাহা দেখা যায় না।

জার্ম্মাণ সমাজে যে সব পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে দেশভ্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অল্পকাল পূর্ব্বেও জার্ম্মাণগণ দেশভ্রমণে আগ্রহ প্রকাশ করিত না। ইংরাজগণ বা আমেরিকানরা যেমন সুবিধা পাইলেই দেশ দেখিতে বাহির হইয়া থাকে, জার্ম্মাণগণ সেরূপ করিত না। বিলাতে রেলপথ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে লোক বড় বড় গাড়ীতে দলে দলে বেড়াইতে বাহির হইত। জার্ম্মাণরা পূর্ব্বে মোটা লাঠি লইয়া বাহির হইত। তাহাতেই তাহাদের ভ্রমণের স্বরূপ অনুভূত হইবে। গ্রামের বা সহরের মধ্যেই তাহারা ঘুরিয়া আসিত—যাহারা বড় দূরে যাইত তাহারাও রাজ্যসীমা অতিক্রম করিত না। এখন সে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন বৎসর বৎসর বহু জার্ম্মাণ বিদেশে বেড়াইতে যায়। ইটালী, সুইটজারলণ্ড, নরওয়ে সব দেশেই জার্ম্মাণরা বেড়াইতে যায়। জার্ম্মাণীতে বিদ্যালয়ের ছুটী জুলাই মাসের প্রথমভাগে আরম্ভ হয় ও আগষ্ট মাসের ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে জার্ম্মাণগণ দেশভ্রমণ সারিয়া আইসে।

পূর্ব্বে যে সব স্থানে ইংরাজ ভ্রমণকারীদিগেরই বাহুল্য ছিল, এখন সে সব স্থানে জার্ম্মাণ ভ্রমণকারীরও বাহুল্য হইতেছে। মিসর, আলজীরাস, স্পেন, গ্রীস এ সব দেশেও জার্ম্মাণ পর্য্যটকদিগের অভাব হয় না। ভারতেও বৎসর বৎসর জার্ম্মাণ পর্য্যটকদিগকে দেখা যায়। কিন্তু এ দেশে প্রায় সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগী জার্ম্মাণগণেরই আগমন হয়। কারণ, যে সময় জার্ম্মাণীতে ছুটী পাইয়া লোক ভ্রমণে বাহির হয় সে সময় ভারতে ভ্রমণ সুখদ নহে। এই উষ্ণপ্রধান দেশের বর্ষাকালের অবিশ্রান্ত বর্ষণ ও আর্দ্রতা শীতপ্রধান দেশের লোকদিগের পক্ষে কষ্টকর হয়। যাহারা আনন্দ ও আরাম উপভোগ করিবার জন্য পর্য্যটনে বাহির হয় তাহারা এ সময় ভারতে আসিতে চাহিবে কেন? তাই শীতের সময় ভারতে পর্য্যটকের বাহুল্য হয়। দেশের ধনবৃদ্ধি যে জার্ম্মাণদিগের এই পরিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণ সরকারও ইহার পোষকতা করিয়াছেন। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে সরকারী রেলপথে বার্লিন প্রভৃতি সহর হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহে যাইবার ভাড়া কমাইয়া ট্রেণের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে যাত্রীর সংখ্যা কিরূপ বর্দ্ধিত হয় তাহা যাঁহারা দুর্গোৎসবের বা বড় দিনের ছুটীর সময় হাওড়া বা শিয়ালদহ হইতে যাত্রীর ভিড় দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপে দেশভ্রমণে মানুষের মনের বিস্তার সাধিত হয়—মানুষ মানুষকে চিনিতে ও জানিতে পারে—বৈশিষ্ট্যবিভেদে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার নিবারিত হয়। বিলাতে এইরূপ পর্য্যটন শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়—দলে দলে যুবকগণ ছুটীর সময় দেশভ্রমণে বাহির হয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া আইসে, আবার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। এ বিষয়ে জার্ম্মাণী ইংলণ্ডেরই অনুকরণ করিয়াছে।

কেবল জার্ম্মাণী নহে—অনেক দেশই এ বিষয়ে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছে। কারণ, বিলাতের শিক্ষাপ্রণালী বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যেরূপ পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছে, য়ুরোপের আর কোন দেশের শিক্ষাপ্রণালী সেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। অন্যান্য দেশে যেমন বিলাতের পার্লামেণ্টের অনুকরণ হইয়াছে, তেমনই বিলাতের শিক্ষাপ্রণালীরও অনুকরণ হইয়াছে।

ভ্রমণসম্বন্ধেও যেমন, ক্রীড়াদি সম্বন্ধেও তেমনই জার্ম্মাণী বিলাতের অনুকরণ করিয়াছে। আমরাও তাহাই করিয়াছি ও করিতেছি। পল্লীপ্রান্তরেও আর বাঙ্গালার নিজস্ব খেলা দেখিতে পাওয়া যায় না—ফুটবলের প্রাদুর্ভাবই লক্ষিত হয়। জার্ম্মাণীর যুবরাজ সেনাদলে ফুট-বলের প্রচলন করায় এই খেলা ক্রমে আরও দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। এখন জার্ম্মাণীতেও সর্ব্বত্র ফুটবল খেলা চলে। কিন্তু ক্রিকেট খেলা তেমন চলিত হয় নাই। তাহার কারণ, সে খেলার জন্য যেরূপ শষ্পা-স্তৃত ভূমির প্রয়োজন জার্ম্মাণীতে সেরূপ ভূমি দুর্লভ। এখন জার্ম্মাণী-তেও শ্রমজীবীরা সমিতি সংস্থাপিত করিয়া নৌকাচালনাদি স্বাস্থ্যসহায় ব্যায়াম করিয়া থাকে। সরকার এ বিষয়ে লোককে উৎসাহ দিয়া থাকেন। তাহার কারণ, ইহাতে জার্ম্মাণীর বিরাট সৈনিকদলে আলস্য প্রবল হইতে পারে না। পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা মনে করিত, তাহারা সৈনিক-রূপে শিক্ষালাভের সময় যে শ্রম করে তাহাই যথেষ্ট; তাহার পর তাহারা বিশ্রামই সন্ধান করিত। তাহাতে লোক অলস হইয়া পড়ে। ক্রীড়ায় তাহারা অলস হইতে পায় না। সেই জন্যই সরকার এই সব ক্রীড়ায় লোককে বিশেষরূপ উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

দেশে ধনবৃদ্ধিতে যেমন পর্য্যটনস্পৃহা ও ক্রীড়াপ্রিয়তা বিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তেমনই সমাজে পাপও প্রকাশ পাইয়াছে। জুয়াখেলা

সমাজে—বিশেষ সৈনিকদলে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। আবার জার্ম্মাণীতে ঘোড়দৌড়েও আজকাল অনেক লোকসমাগম হইতেছে। এই স্থলে পাঠককে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে যে, বিলাতে জুয়াখেলা ঘোড়দৌড়ের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জার্ম্মাণীতে ঘোড়দৌড় যত বাড়িতেছে, জুয়াখেলাও তত বাড়িতেছে।

যাহা হউক এখনও জার্ম্মাণ পরিবার হইতে মিতব্যয়িতা অন্তর্হিত হয় নাই। গত ৩০ বৎসরে জার্ম্মাণীর পারিবারিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে সংসারের ব্যয় বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তথাপি জার্ম্মাণ গৃহিণীরা এখনও সর্ব্ববিষয়ে ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফলেই আজও জার্ম্মাণ সমাজ জুয়াখেলায় জর্জ্জরিত হয় নাই। বিশেষ জার্ম্মাণীর শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের মধ্যে আজও সে পাপ প্রবল হইতে পারে নাই। কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা সব দেশেই একরূপ আকার ধারণ করিয়া সব সমাজ একইরূপ করিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং জার্ম্মাণীও যে বহু দিন মিতব্যয়িতাদিগুণ রক্ষা করিতে পারিবে, এমন মনে হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জার্ম্মাণরা স্বভাবতঃ শৃঙ্খলাপ্রিয় এবং তাহাদের সামরিক শিক্ষা সেই শৃঙ্খলাপ্রিয়তা বর্দ্ধিত করে। নিদাঘ-সন্ধ্যায় দেখা যায়, এক এক স্থানে বহু পরিচ্ছন্ন বেশধারী শ্রমজীবী পুরুষ ও রমণী সমবেত হইয়াছে—ব্যাণ্ড বাজিতেছে—তাহারা বসিয়া সানন্দে বীয়র মদ্যপান করিতেছে। কোন কোন সভাতেও এইরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হয়—শ্রোতৃবৃন্দ বক্তার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে বীয়র পান করিতেছে; কোনরূপ চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র নাই। সহস্র সহস্র শ্রোতা যে সভাস্থলে

সমবেত হয়, সে সভাস্থলে এরূপ ভাব য়ুরোপে আর কোন দেশে দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু জার্ম্মাণীতেও এ ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। নগরে বহুজনসমাগম, কৃষির স্থলে শিল্পের উন্নতি, শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের সংখ্যা ও প্রভাববৃদ্ধি—এ সকলের অবশ্যম্ভাবী ফল জার্ম্মাণীতেও ফলিতেছে। জার্ম্মাণীর লোকও ক্রমে উত্তেজনাশীল হইতেছে। তাহাদের যে ধীরতা—সর্ব্বাবস্থায় শৃঙ্খলার শাসনপ্রিয়তা জার্ম্মাণ সরকারের পক্ষে বহু সুবিধার কারণ হইয়াছিল তাহা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে অন্যান্য দেশের মত জার্ম্মাণীর জনগণও প্রবল প্রতিবাদ করিতে শিখিতেছে। তবে সব দেশে যেমন জার্ম্মাণীতেও তেমনই পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ সহরেই লক্ষিত হয়। আমাদের দেশে যেমন রেলপথ ও ষ্টীমার-ঘাট হইতে দূরে অবস্থিত শ্যামশোভাময় বৃক্ষের ছায়াস্তৃত—স্বচ্ছন্দবিচরণশীল বিহগের বিরাবমুখরিত পল্লীতে পুরাতন ভাবের ও সংস্কারের, আচারের ও ব্যবহারের অক্ষুন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, জার্ম্মাণীতেও তেমনই পল্লীতে এখনও পূর্ব্বাবস্থা লক্ষিত হয়। কি উত্তরে—কি দক্ষিণে পল্লীবাসী জার্ম্মাণ সামাজিক ও বিদেশী অতিথির সৎকারে সচেষ্ট। মিষ্টার টাওয়ার তাঁহার বর্ত্তমান জার্ম্মাণী (Germany of to-day) নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, বার্লিন সহরে জার্ম্মাণ বৈশিষ্ট্যের একান্ত অভাব। সেই সহরে যাইয়া যাঁহারা মনে করেন, সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণরা অভদ্র ও অশিষ্ট, তাঁহারা ভ্রান্ত; জার্ম্মাণীর পল্লীগ্রামে না যাইলে তাঁহাদের সে ভ্রান্তি দূর হইবে না। আমাদের দেশেও ত কলিকাতার অতিথিসৎকারবিমুখতা দেখিয়া পল্লীর আন্তরিক অতিথিসৎকারপ্রিয়তার কল্পনাও করিতে পারা যায় না। সহরে অতিথি আপদ—পল্লীতে সম্পদ।

প্রতীচ্য সভ্যতা সকল দেশেই লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল

করিয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে মানুষের দৈনিক জীবনের ও সমাজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে—ধর্ম্মকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে শিখিলে এমন হইবেই। হিন্দুর ধর্ম্ম তাহার কোন কোন কার্য্যেই নিবদ্ধ ছিল না; পরন্তু তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সব কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত করিত—সর্ব্বব্যাপী ছিল। জার্ম্মাণীতে ধর্ম্ম লইয়া কত সংগ্রাম—কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা জার্ম্মাণীর ইতিহাসে দেখিয়াছি; এখন সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন জার্ম্মাণ দুর্দ্দিনে ধর্ম্মকে স্মরণ করে—সুদিনে নহে। জার্ম্মাণীতে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাসমস্যার নানারূপ সমাধান করিয়া থাকেন—আবার কেহ কেহ সে শিক্ষায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতাদানের প্রস্তাব করিয়া থাকেন। ফলে লোকের শিক্ষাও ভাল হয় না, ধর্ম্ম প্রাত্যহিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে সরকার কতকগুলি নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারের ও গির্জ্জার ব্যয় যাহাতে সকলকেই বহন করিতে হয়, সরকার তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। লোকের আয়-কর ধরিয়া সে জন্য কর আদায় করা হয় এবং নাস্তিক ব্যতীত সকলকেই কর দিতে হয়। কেবল যাহারা সরকারের তালিকাতীত সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহারা সেই সম্প্রদায়ের কোন অনুষ্ঠানে অর্থ প্রদান করে দেখাইতে পারিলে নিষ্কৃতি পায়। সরকার কর আদায় করিয়া যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত তাহার অর্থ তাহার সেই সম্প্রদায়ের কর্ত্তাদিগকে প্রদান করেন। তবুও জার্ম্মাণীর অনেক স্থানে গির্জ্জা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, লোকের গির্জ্জার কাযে আবশ্যক অর্থ দিতে আগ্রহের অভাব। আমাদের দেশে কত জনাকীর্ণ স্থানেও যেমন দার্ঢ্য দেবালয়চূড়া সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—মন্দিরগাত্রে তৃণলতাগুল্ম জন্মিতেছে—মন্দিরমধ্যে অন্ধকারবিলাসী জীব আশ্রয় লইতেছে—জার্ম্মাণীতেও তেমনই হই-

তেছে। তবে আমাদের দেশে দেশের লোকের মনোযোগের অভাবেই এমন হইতেছে—আর জার্ম্মাণীতে সরকার চেষ্টা করিয়াও এ অবস্থার প্রতীকার করিতে পারিতেছেন না। সমাজে ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইলে অজস্র চেষ্টাতেও এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। সংশয় যখন ভক্তির স্থান অধিকৃত করে তখন ধর্ম্মের গ্লানি অনিবার্য্য।

কিন্তু বিদেশী লেখকের পক্ষে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে জার্ম্মাণীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তনের কথায় আর আলোচনা করা সঙ্গত হইবে না। তাই আমরা সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জার্ম্মাণীর সাহিত্যের আলোচনা করিব।

জার্ম্মাণীর—বিশেষ নবীন জার্ম্মাণীর সাহিত্য সমগ্র সভ্য জগতের সম্পত্তি। বিশেষ জ্ঞানপিপাসু ইংরাজদিগের অনুগ্রহে জার্ম্মাণীতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সকল গ্রন্থই ইংরাজীতে অনূদিত হয়। আমরা জার্ম্মাণ না জানিয়াও জার্ম্মাণীর জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সেই পথে জ্ঞান আহরণ করিতে পারি; যে জাতি পূর্ব্বে চিন্তাশীল দার্শনিক ও কবিদিগের গৌরবেই গৌরবান্বিত ছিল, সে জাতি এখন ব্যবসায়ী হইতেছে। সে পরিবর্ত্তন সাহিত্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। পূর্ব্বে যখন জার্ম্মাণী বিদেশী শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে ব্যাপৃত থাকিত তখন জার্ম্মাণ সাহিত্যে যে পূর্ণতা ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত, এখন জার্ম্মাণ সাহিত্যে সে পূর্ণতা ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। নীটসে, জোলা, টলষ্টয়, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, লোটী—জার্ম্মাণীতে সকলেরই ভক্ত আছে। তাহাতে জার্ম্মাণীর সাহিত্যিক রুচির উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহাতেই আবার বৈশিষ্ট্যের অভাব প্রতিপন্ন হয়। তবে জার্ম্মাণ সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় জার্ম্মাণীতে বাস্তবানুগতা (Realism)

ক্রমেই সমাদৃত হইতেছে। জোলার আদরে তাহা বুঝা যায় জার্ম্মাণীর উপন্যাসসাহিত্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু জার্ম্মাণীতে উপন্যাস সাহিত্য অদ্যাপি ফরাসী বা বিলাতী উপন্যাস সাহিত্যের সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। জার্ম্মাণ ঔপন্যাসিকগণ আজও পুরাতন প্রথায়—নিয়মানুগ চিত্রচিত্রণের প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে নূতন পথ গঠিত করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কেহ ইংরাজ ঔপন্যাসিক কিপলিংকে কেহ বা ওয়েলসকে আদর্শ করিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই ডিকেন্সের বা থ্যাকারের, বলজাকের বা ডডের প্রতিভার ও চরিত্রচিত্রণক্ষমতার পরিচয় দিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে জ্ঞানবিস্তারের যেমন সুবিধা হইয়াছে—অশ্লীল ও কুশিক্ষাপ্রদ পুস্তকের প্রচারও তেমনই বাড়িয়াছে। বিশেষ স্বাধীন চিন্তার নামে যে সব বিষয়ের আলোচনা হয়, সে সব বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনায় সমাজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সাধিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রতিভাবান কবির রচনাতেও সময় সময় যে সব ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে বিখ্যাত দার্শনিক কার্লাইলের মত বলিতে ইচ্ছা করে—এই যে সব ব্যাপার—সকলেই জানে, কিন্তু গুপ্ত রাখা হয়—তুমি আপনার কাছেও আপনি সে সকলের কথা বলিও না—Thou shalt not prate even to thyself these open secrets known to all. জন ব্রাইট বলিয়াছিলেন, জগতে পাপের ত অভাব নাই—তবে আর উপন্যাসে পাপ চিত্রিত করা কেন? এ মত অবশ্য সর্ব্বজনগ্রাহ্য নহে; কিন্তু পাপের চিত্র চিত্তাকর্ষক হইলে তাহাতে সমাজের অপকার হইবারই সম্ভাবনা। বিলাতের অনেক পুস্তক—অনেক ফরাসী গল্প পড়িয়া পুস্তকখানি গৃহে রাখিতে সঙ্কোচ

বোধ হয়। জার্ম্মাণীতেও সেইরূপ হইতেছে। এই জন্য তথায় চিত্রে ও বাক্যে অশ্লীলতাপ্রচারের প্রতিবাদকল্পে একটি সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে সভা সময় সময় অতিমাত্রায় নীতিবাদী হইলেও সভার দ্বারা উপকার হইতেছে। আজ কাল বিলাতে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবিচার-বিষয়ে অনেক উপন্যাস রচিত হয়। জার্ম্মাণীতেও সেইরূপ পুস্তকের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা এ বিষয়ের আলোচনা হইলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে—যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কোন প্রয়োজন নাই—তাহা অশ্লীল। তবে এ ক্ষেত্রেও দুই এক জন জার্ম্মাণ লেখকের রচনা জার্ম্মাণীর বাহিরেও আদৃত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে সময়াদি উত্তেজক বিষয়ের বহু পুস্তক বৎসর বৎসর প্রচারিত হয়। সে সকলে স্থায়িত্বের লক্ষণ বড় দেখা যায় না।

বিদেশের উপাদেয় সাহিত্যের সহিত জার্ম্মাণদিগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বাস্তবিকই বিস্ময়কর। জার্ম্মাণদিগের সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগ দেখিয়া আমরা বহুবার তাহাদিগের প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে নহে, পরন্তু সকল বিদেশী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিলাভপটুত্বে য়ুরোপে জার্ম্মাণগণের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। জার্ম্মাণ বিদ্যার্থীরা বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিদেশী সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করেন। বিলাতে বর্ত্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট পুস্তকের সুলভ সংস্করণ সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বেই জার্ম্মাণীতে জার্ম্মাণ পুস্তকের ও বিদেশী পুস্তকের জার্ম্মাণ অনুবাদের সুলভ সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে। "রেকলাম" নামক সংস্করণ এ বিভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংস্করণে নানা-দেশের সহস্র সহস্র পুস্তকের জার্ম্মাণ অনুবাদ দুই আনা হইতে বার আনা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। তবে জার্ম্মাণীতে বহু পুস্তকাগার থাকিলেও সে সকলে পাঠার্থীর সুবিধায় ব্যবস্থা ভাল নহে।

নাটক বিভাগে জার্ম্মাণ সাহিত্যে পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট ও সমুজ্জল। জার্ম্মাণীতে লোকশিক্ষার জন্ত মিউনিসিপ্যালিটীগুলি নাটকের ও গীতিনাট্যের আদর করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণ নৃপতিরাও নাট্যসাহিত্যের আদর করিয়া থাকেন। সেক্স-মিনিল্‌জেনের ডিউক জর্জ্জ পৃথিবীর সর্ব্বদেশের প্রসিদ্ধ নাট্যকারদিগের নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা করিয়া জার্ম্মাণদিগকে সকল দেশের নাটকের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার—স্বাদ পাইবার সুযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তনে সুফল ফলিতে পারে না। এখন জার্ম্মাণগণ উৎকৃষ্ট নাটক—এমন কি হাস্যরসপ্রধান নাটকও ভালবাসে না—ফরাসী প্রহসনের অনুকরণে রচিত যে সব জার্ম্মাণ প্রহসনের আদর করে সে সকলের রুচি ভাল নহে। এই পরিবর্ত্তন সমাজের হীনতারই পরিচায়ক। ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে এই কারণে এক বার্লিন সহরে আটটি রঙ্গালয় বন্ধ হইয়া যায়; অন্যগুলিরও অবস্থা ভাল নহে। তাই অনেক রঙ্গালয়ে পুরাতন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ছোট ছোট গীতিনাট্যের ও বায়স্কোপ চিত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই স্থানে বলা যাইতে পারে, য়ুরোপে, মার্কিনে—এমন কি ভারতবর্ষেও বায়স্কোপচিত্র যেরূপ লোকরঞ্জনক্ষম হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অল্পদিনের মধ্যেই লোক আর রঙ্গালয়ে নাটকাভিনয় দেখিতে যাইবে না—বায়স্কোপের চিত্রে অভিনয় দেখিয়াই তৃপ্ত হইবে। ইহাতে জগতের সকল দেশেই যে সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

জার্ম্মাণ নাট্যসাহিত্যের সমালোচনা করিবার স্থান বা যোগ্যতা আমাদের নাই। আমরা সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না; কেবল জার্ম্মাণ নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ কথা বলিয়াই বিদায় লইব।

কেহ কেহ বলেন, নবীন জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সংস্থাপনা হইতে

জার্ম্মাণ সামাজিক জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু নাট্য সাহিত্যের সমালোচনায় কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। যেন সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনায় আদর্শেরও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য! পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে রঙ্গালয় শিক্ষাগার বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন জার্ম্মাণীতে কিতাবতী শিক্ষা এত উন্নতি লাভ করে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও রঙ্গালয়ের দর্শকদল শিক্ষার্থীর মত অভিনয় দেখিতে আসিত; রঙ্গালয়ের ব্যয়ও কম ছিল; দুই চারি সহস্র দর্শকের স্থান হয় এমন বৃহৎ রঙ্গালয় তখন ছিল না। তখন ধনবানের আনুকূল্যে রঙ্গালয় পরিচালিত হইত; সুতরাং রঙ্গালয়ে জনসাধারণের আনন্দোপভোগের ব্যবস্থা করিতে হইত না। এখন সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আর দর্শকদল শিক্ষার্থ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে যায় না। জার্ম্মাণীতে শিল্পের ও ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সহর বাড়িয়াছে, সহরে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। সহরের লোক সমস্ত দিন কাষ করিয়া সন্ধ্যার পর আর শিক্ষা করিতে চাহে না। তাহারা বিশ্রাম সন্ধান করে—আনন্দলাভ করিতে চাহে। কিন্তু জার্ম্মাণ নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ এই পরিবর্ত্তনানুসারে রঙ্গালয়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই; তাই তাঁহারা আজ বিপন্ন। যাঁহারা পরিবর্ত্তনের সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন, এ অবস্থার জন্য সমালোচকগণও দায়ী। তাঁহারা নাট্যকারের ত্রুটি ও অভিনয়ের দোষ দেখাইতে অকারণ উৎসাহ দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা জনসাধারণের রুচির কথা না ভাবিয়া কেবল আদর্শ নাটকের কথাই ভাবেন, আর সেই আদর্শে সব নাটকের বিচার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নাটকের উপাখ্যানবিবৃতি ব্যতীত সমালোচকের আর কোন কাযই নাই!

আবার এমন কথাও শুনা যায় যে, গত ২৫ বৎসরে জার্ম্মাণ নাটকে

অভিনয়োপযোগিতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল সাহিত্যের দিকেই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্ম্মাণীতে নাটককে নিয়মনিগড়নিয়ন্ত্রিত অবস্থা হইতে মুক্তি দিয়া সমসাময়িক সমাজের মুকুরে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টার ফলে নাটকে সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার বিচার আরব্ধ হয়। সেরূপ অবস্থায় নাটক জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক হয় না। নাটকে মানব-চরিত্রের চিরন্তন ভাবের ও অভাবের চিত্র থাকিলে তাহা চিরদিনই জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক হয়। বিলাতে সেক্সপীয়রের নাটকের প্রতি লোকের অনুরাগ কমে নাই; পরন্তু সমগ্র জগতে সেক্সপীয়রের নাটকের আদর বিস্তৃত হইয়াছে। তাহার কারণ, সেক্সপীয়রের নাটকে চিত্রিত চরিত্রগুলি সকল কালের—মানব-চরিত্রের চিরস্থায়ী ভাবের ও অভাবের অভিব্যক্তি। সেই কারণেই বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত নাটক সমগ্র সভ্যজগতে সমাদৃত হইয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা জার্ম্মাণ সাহিত্যিকশিরোমণি গেটের প্রশংসা পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হয়, অভিনয়োপযোগিতা না থাকিলে নাটকের আদর হয় না। নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য অভিনীত হওয়া। সেক্সপীয়র স্বয়ং রঙ্গালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বদ্ধ ছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে অভিনয়োপযোগী নাটকরচনা করিতে পারিয়াছিলেন। এবং বোধ হয় সেই জন্যই সাধারণ দর্শকগণের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকরচনা করিতে যাইয়া তিনি নাটকমধ্যে স্থানে স্থানে এমন কথোপকথন সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে তাহা পাঠ করিতেও লজ্জিত হইতে হয়। স্থান কাল পাত্র—সব বিবেচনা করিলেও অনেক সময় সে সব কথোপকথন সুপ্রযুক্ত বলা যায় না। আমা-

দের দেশে আজকাল আমরা যে রঙ্গালয়ের সহিত পরিচিত তাহা য়ুরোপীয় আদর্শে সৃষ্ট। সে সব রঙ্গালয়েও রঙ্গালয়-সংসৃষ্ট নাটক-কারদিগের নাটক যেরূপ অভিনয়োপযোগী হয় অপরের নাটক সেরূপ হয় না।

উৎকৃষ্ট নাটকে দর্শক আকৃষ্ট হয় না দেখিয়া জার্ম্মাণ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ অনেক ক্ষেত্রে নাটকে আকর্ষণের অভাব সাজসজ্জায় পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেক্সপীয়রের অনেক নাটকের অভিনয়ে দৃশ্যপটে সাজসজ্জায় মনে হয়, রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতেছি না—প্রকৃত ব্যাপারই ঘটিতেছে দেখিতেছি। কিন্তু দৃশ্যপটে—সাজসজ্জায় যাহাই কেন হউক না, অভিনয় দেখিলেই বুঝা যায়, অভিনেতারা মূল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করিয়া আপনাদিগকে সেই সব চরিত্রে পরি-বর্ত্তিত করিতে পারে নাই—তাহারা যে জার্ম্মাণ সেই জার্ম্মাণই আছে। এইরূপ ত্রুটিও জার্ম্মাণীর রঙ্গালয়ের আর্থিক অবনতির কারণ হইতে পারে।

সমালোচকগণ বলেন, জার্ম্মাণ নাটকে নাটকত্বের অভাবই জার্ম্মাণ রঙ্গালয়ের দুর্দ্দশার কারণ। যদি রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ আবার অভিনয়-যোগ্য, চিত্তাকর্ষক ঘটনাবহুল নাটকের অভিনয় করাইতে পারেন, তবে রঙ্গালয়ে দর্শকের অভাব হইবে না। জার্ম্মাণীতে সহরে অপেক্ষা-কৃত দরিদ্র দর্শকদিগকে অল্পব্যয়ে উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখাইবার সুব্যবস্থা আছে। আবার আজকাল শ্রমজীবীরা আপনাদিগের দলে সমিতি সংগঠিত করিয়া অভিনয়ের আয়োজন করিয়া থাকে। তাহারা সাধা-রণতঃ শনিবারে কোন রঙ্গালয় ভাড়া লইয়া তথায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। বর্ত্তমানে এই সমিতির সভ্যসংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার। স্ফুর্ত্তি-খেলায় প্রত্যেকবার দর্শকের টিকিট বিলি করা হয়; অর্থাৎ যাহাদের

নামে টিকিট উঠে, তাহারাই অভিনয় দেখিবার অধিকার পায়। ইহারা আপনারাই অধিকাংশ চরিত্রের অভিনয় করে। তবে সময় সময় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতাদিগকেও দলে মিশাইয়া লয়। এই কার্য্যে তাহাদের অসাধারণ উৎসাহও লক্ষিত হইয়া থাকে।

জার্ম্মাণীতে দেশের লোককে মফঃস্বলেও উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দেখাইবার জন্য যাযাবর অভিনেতার দল আছে। তাহারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া অভিনয় করে। ইহাতে লোকশিক্ষার পথ সুগম হয়। আমাদের দেশে যাত্রার দল গ্রামে গ্রামে উৎসবের সময় যাইয়া পৌরাণিক পালার গাহনা করিত। তাহাতে দেশের আপামরসাধারণ কেবল যে দেশের সমৃদ্ধ পৌরাণিক সাহিত্যের পরিচয়ই পাইত এমন নহে; পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখিত—আর সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে শিক্ষালাভ করিত। কথকতা ও যাত্রা এ দেশে লোকশিক্ষার পথ যত প্রশস্ত করিয়াছে, তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়রা করিতে পারেন নাই। গুরুমহাশয়রা বেতের ভয় দেখাইয়া কেবল ছেলেদের দাতাকর্ণের কথা পর্য্যন্ত পড়াইয়াছেন; আর কথক ঠাকুর ও যাত্রাওয়ালা সব লোককে আকৃষ্ট করিয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ দেশে লোকের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার পশার কমিয়াছে; সহরে ব্যয়বহুল রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—সেও য়ুরোপীয় রঙ্গালয়ের অনুকরণে। এই সব রঙ্গালয় যে লোকশিক্ষার উপযোগী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার ঔজ্জ্বল্যমুগ্ধ বাঙ্গালীকে আবার স্বধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অনুশীলনতত্ত্বের ও কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

যেমন হিন্দুত্বের স্বরূপ সরলভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন; পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও পরিব্রাজক প্রভৃতি যেমন সে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; গিরিশচন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি তেমনই নাটক ও গীতিনাট্য রচিত করিয়া রঙ্গালয়ে সে সকলের অভিনয় করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্মের "পুনরুত্থানের" ইতিহাস হইতে তাঁহাদের কৃতকার্য্যের স্মৃতি মুছিয়া ফেলা যায় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও এইরূপ ব্যাপার লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যয়বাহুল্যহেতু রঙ্গালয় কেবল সহরেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; গ্রামে গ্রামে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের কোন ব্যবস্থাই এ দেশে করা যায় নাই।

জার্ম্মাণীতে স্থানে স্থানে—বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে—মুক্ত স্থানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নাটকাভিনয়ও হইয়া থাকে। যাঁহারা সেরূপ অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন, কোন কোন স্থানে দূরাগত অভিনেতাদিগের আগমনাদিতে যেরূপ দৃশ্য লক্ষিত হয় অন্যত্র সেরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হইতে পারে না।

আরও এক বিষয়ে জার্ম্মাণ রঙ্গালয়ের বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্ম্মাণ ইতিহাস হইতে ঘটনা বাছিয়া লইয়া—যে স্থানে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই স্থানে তাহার অভিনয় করা হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান যে লোকের পক্ষে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। যে স্থানে যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই স্থানে সেই ঘটনার অভিনয়ে লোক যে বিশেষ প্রীত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জার্ম্মাণীতে নাটকে যেমন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে সঙ্গীতেও তেমনই পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে পূর্ব্বে সঙ্গীতের অত্যন্ত আদর ছিল—সঙ্গীতের উন্নতিও হইয়াছিল। এখনও সঙ্গীতে জার্ম্মাণীর প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই—কিন্তু জার্ম্মাণীতে যে ৫০ হাজার

লোক এখনও সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের পারিশ্রমিক সামান্য। আমাদের দেশে এক কালে সঙ্গীতের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, সেরূপ উন্নতি সচরাচর হয় না। কিন্তু সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদিগের আদরের ও ধনীদিগের সেবা হইয়াছিল; রাজসভায় গুণীরা অবাধে সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেন। সর্ব্ববিধ সঙ্গীত সর্ব্বজনবোধ্য ছিল না। এ দেশে "কলাবৎ"দিগের সঙ্গীতের আদর সাধারণ লোক করিতে পারে না। জার্ম্মাণীতেও তাহাই হইয়াছিল। এ দেশে যেমন সুর ভাঙ্গিয়া "জঙ্গলা" সুর হইতেছে; জার্ম্মাণীতেও তেমনই লোক পুরাতন বিশুদ্ধ সুর ত্যাগ করিয়া নূতন সহজবোধ্য সুরের ভক্ত হইতেছে—লোক সুরের ক্রমবিভাগ বা ক্রমবিকাশ বুঝিবার উপযোগী শিক্ষার অভাবে সেরূপ সুরচর্চ্চা ভালবাসে না—শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের দেশেও যেমন, জার্ম্মাণীতেও তেমনই সমাজের পরিবর্ত্তন সঙ্গীতকে বিকৃত করিয়াছে, অথচ সঙ্গীতে প্রতিফলিত হইয়া নূতন সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংলণ্ডে যেমন কতিপয় পত্রের প্রভূত প্রচার জার্ম্মাণীতে সেরূপ নহে। লণ্ডন ইংলণ্ডের রাজধানী—সমগ্রদেশের রাজনীতিক শক্তির কেন্দ্র। সুতরাং লণ্ডনের সংবাদপত্রের প্রভাব সমগ্র ইংলণ্ডে—এমন কি সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে অনুভূত হয়। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য—নবীন জার্ম্মাণী—অল্প দিনের। পূর্ব্বে জার্ম্মাণী যখন বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী ছিল। সাম্রাজ্য সংগঠিত হইলেও যে সব রাজধানীর পূর্ব্বশ্রী বা পূর্ব্বপ্রাধান্য বিনষ্ট হয় নাই। কৈসরের রাজধানী বার্লিন সাম্রাজ্যের রাজধানী হইলেও আর সকল নগরের শক্তি হরণ করিয়া আপনার

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতে পারে নাই। কাযেই অন্যান্য সহর হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির প্রভাবও ক্ষুন্ন হয় নাই—সে সব স্থানে বার্লিনের সাংবাদপত্রের প্রভাব অপ্রতিহত নহে। বার্লিনের কয়খানি সংবাদপত্রের প্রচার অধিক হইলেও সেগুলির রাজনীতিক প্রভাব অতি অল্প। সেই তিন চারিখানি সংবাদপত্র বাদ দিলে বার্লিনের আর সংবাদপত্রগুলির প্রচারও অধিক বলা যায় না। সেগুলি প্রায়ই বহুধা বিভক্ত রাজনীতিক সম্প্রদায়ের কোন না কোন দলের মুখপত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখানি যে দলের কাগজ সেখানিতে সেই দলের মতই প্রচারিত ও সমর্থিত হয়। সুতরাং তাহাদের প্রভাব অতি অল্প।

জার্ম্মাণীতে আর কতকগুলি সংবাদপত্র আছে—সেগুলি স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। সে সব সংবাদপত্র সরকারী বিজ্ঞাপন পায় এবং সেই জন্য সরকারের সব কার্য্যের সমর্থন করে। জার্ম্মাণীতে সরকার দেশের লোককে সরকারী মতই গ্রহণ করাইতে চাহেন এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই এই সব সংবাদপত্রে সরকারী কায সমর্থিত করিয়া লোককে সেই মত গ্রহণ করাইবার চেষ্টা হয়। কারণ, দেশে যত লোক সংবাদপত্র পাঠ করে, তত লোক রাজনীতিক বা আইন সম্বন্ধীয় সব ব্যাপার বুঝিয়া—বিচার করিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মতগঠন করিয়া লইতে পারে না। তাহারা যে সংবাদপত্র নিত্য পাঠ করে, তাহার মতেই অভ্যস্ত হয় ও শেষে সেই মতই আপনাদের মত বলিয়া গ্রহণ করে। অনেক সময় দেখা যায়, এক এক জন লোক কোন সমস্যার যে সমাধান করে তাহার জন্য যুক্তি দিতে পারে না। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, সে মত তাহারা তাহাদের পঠিত সংবাদপত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। এ দেশেও এমন ব্যাপার দেখা যায়। এ দেশেও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের

সংবাদপত্র "হাত করিবার" চেষ্টার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মফঃস্বলের কথা ছাড়িয়া দিলেও বলা যাইতে পারে, কলিকাতায় বাঙ্গালীর চালিত ইংরাজীপত্র এইরূপে প্রভাবাধীন করিয়া সেই পত্রে কোন কোন রাজ-কর্ম্মচারী আপনাদের কৃত কার্য্যের সমর্থন করিয়া—তাহাই লোকমত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন! কিন্তু সেরূপ ব্যাপার অধিক দিন গোপন থাকে না এবং প্রকাশিত হইয়া পড়িলেই সেই সংবাদপত্রের প্রভাব কমিয়া যায়। আমরা অবগত আছি, জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠাকালে পরলোকগত মিষ্টার হিউম বাঙ্গালায় কংগ্রেসের মত-প্রচারের জন্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র হস্তগত করিবার প্রস্তাব করিয়া-ছিলেন।

কিন্তু সংবাদপত্র সর্ব্বতোভাবে সরকারের প্রভাবাধীন এ কথা প্রকাশ হইলে সে পত্রের মতের মূল্য থাকে না। এ দেশে নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া 'সুলভ সংবাদ' পুনঃপ্রচারিত করিয়া সরকার তাহা বুঝিয়াছিলেন। জার্ম্মাণীতে সেই কারণে কতকগুলি সংবাদপত্র কতকটা সরকারী মতের সমর্থন করে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সংবাদপত্রের সরকারের সঙ্গে সম্বন্ধ গোপন থাকে না। আবার 'নর্থ জার্ম্মাণ গেজেট' প্রভৃতি পত্রের সরকারী ও বেসরকারী দুই ভাগ হরগৌরীর মত দেখা যায়। এ দিকে 'কোলোন গেজেট' প্রভৃতি পত্র সময় সময় সরকারের ইঙ্গিতে মত প্রকাশ করে; কিন্তু এমন চাতুরী অবলম্বন করে যে, প্রয়োজন বুঝিলেই—লোক বিরক্ত হইলেই —কথাটা ঘুরাইয়া লইতে পারে। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে যে সব পত্র সময় সময় সরকারের ইঙ্গিতে চালিত হয় বলিয়া বুঝা যায়, জার্ম্মাণীতে সে সব পত্রেরও প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। এমন কাযে সরকারেরও যে সুবিধা হয়, এমন বোধ

হয় না; কারণ, এই সব পত্রের কোন্ মত সরকারী আর কোন্ মত বেসরকারী তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে অনেক অধ্যাপক ও পদস্থ ব্যক্তি সংবাদপত্র-সেবায় নিযুক্ত থাকিলেও আজও জার্ম্মাণীতে সংবাদপত্রসেবকদিগের তেমন সামাজিক সম্মান নাই। পূর্ব্বে সাবাদপত্রসেবকদিগকে Hunger candidates ও বলা হইত। এখন সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহারা যখন রাজদরবারে বা প্রাসাদে কোন উৎসবাদিতে নিমন্ত্রিত হয়েন, তখন সংবাদপত্রসেবক বলিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হয় না! এ বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত কোন দেশের তুলনা হয় না। তথায় সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের প্রভাব ও প্রতাপ অসাধারণ; তাঁহারা সত্য সত্যই লোকমত গঠিত করেন—তাই রাজা প্রজা সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান অবাধে অর্জ্জন করিয়া থাকেন।

সমগ্র য়ুরোপ ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীর ও সংবাদপত্রের অনুকরণ করিয়াছে। অনুকরণ সর্ব্বত্র সফল হয় না—কারণ যে আদর্শ অনুকৃত হয়, তাহা দেশের লোকের যে ভাবের ও চিন্তার অভিব্যক্তি—যে অবস্থা হইতে রস আকৃষ্ট করিয়া তাহা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট সে সফল না হইলে সে আদর্শ গঠিত হইতে পারে না। উপরে রাজাকে রাখিয়া—দুই ভাগে বিভক্ত পার্লামেণ্ট রচিয়া—নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া দেশশাসনের চেষ্টা ইংলণ্ডের অনুকরণে নানাদেশে হইয়াছে। গ্রীস, স্পেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, ইটালী, জার্ম্মাণী কুত্রাপি সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ফলবতী হইয়াছে কেবল হলাণ্ডে, বেলজিয়মে, স্কাণ্ডিনেভিয়ান রাজ্যসমূহে। তেমনই ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের অনুকরণও সর্ব্বত্র সফল হয় নাই—বিশেষ যন্ত্রবদ্ধ শাসনপ্রণালী শাসিত জার্ম্মাণীতে। জার্ম্মাণীর

লোকমতের ও রাজনীতির আবহাওয়া স্বাধীন সংবাদপত্রের বিকাশোপযোগী নহে।

রহস্য ও বিদ্রূপ বিলাতে স্বতন্ত্র পত্রের বিষয়। বিলাতের 'পাঞ্চের' পৃষ্ঠায় বিলাতী সমাজের বৈশিষ্ট্য—গুণ ও দোষ যেন মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। তাহার প্রশংসার মূল্য অত্যন্ত অধিক—তাহার কশাঘাত তীব্র। 'পাঞ্চ' না দেখিলে বিলাতের সমাজ বুঝা যায় না। কিন্তু রহস্যে ও ও বিদ্রূপে জাতির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। ফরাসী দার্শনিক টেন তাঁহার ইংলণ্ড সম্বন্ধীয় পুস্তকে বিলাতের ও ফ্রান্সের রহস্যবিদ্রূপবিষয়ক পত্রের তুলনা করিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। এ দেশে রসরাজ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চানন্দ' এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্র ছিল; কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। তেমন রসিকতা—তেমন কশাঘাত আর কোথাও দেখি নাই। জার্ম্মাণীতেও এই শ্রেণীর পত্র আছে। কিন্তু তাহাদের রুচি মার্জ্জিত নহে—তাহাদের রহস্যবিদ্রূপ সময় সময় ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে; শুচিবায়ুর প্রতিবাদ করিতে যাইয়া অশুচি হয়। আর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-পরিচয়ে তাহাদের পৃষ্ঠা অনেক সময় কলঙ্কিত হয়। সেটা বোধ হয় বিসমার্কের প্রভাবের ফল। তিনি বলিতেন, যদি সংবাদপত্রকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষোদগারে উৎসাহিত করা যায়, তবে অনুষ্ঠানগুলির-প্রতি আক্রমণের তীব্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। সেই জন্য তখন সংবাদপত্রে ব্যক্তিগত আক্রমণে উৎসাহ প্রদত্ত হইত। তাহার প্রভাব আজও দূর হয় নাই। কতদিনে দূর হইবে,—কতদিনে জার্ম্মাণরা নির্ম্মল রহস্যবিদ্রূপের আদর করিতে শিখিবে, তাহা বলা যায় না। কারণ, বর্ত্তমান যুদ্ধেই দেখা যাইতেছে, জার্ম্মাণীর সভ্যতার প্রলেপ অতি সামান্য উত্তেজনাতেই দূর হইয়া যায়—নগ্ন বর্ব্বরতার ভীষণ কঙ্কাল জগতের ভীতির

উৎপাদন করে। যে জার্ম্মাণী বিজ্ঞানে প্রাধান্য লাভ করিয়া—ব্যবসায় জগতে প্রভুত্বলাভ করিয়া—দর্শনের চর্চ্চা করিয়া,—সাহিত্যের আলোচনায় অমৃতের আস্বাদ পাইয়াও "একতাপত্র জগৎপ্রভুত্বে"র দুঃস্বপ্ন চালিত হইয়া সমরে বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছে—যে জার্ম্মাণী সন্ধিপত্র তুচ্ছ কাগজমাত্র বলিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য পদদলিত করিতে পারিয়াছে, যে জার্ম্মাণী প্রতীচ্য সভ্যতার মন্দিরচূড়া অনায়াসে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিতে পারিয়াছে,—সে জার্ম্মাণী যে কত দিনে সত্য সত্যই শুচিতার আদর করিতে শিখিবে,—নির্ম্মল ও উজ্জ্বল রহস্যে আনন্দলাভ করিতে পারিবে, তাহা বলা সহজসাধ্য নহে।

যে দেশের সভ্যতা সভ্যতা নামের যোগ্য, সে দেশের স্থপতিবিদ্যায় দেশের সভ্যতার ও শিল্পের পরিমাপ হয়। সভ্যতা শিল্প বিকশিত করে—স্থাপত্যেই শিল্পের আরম্ভ। ভাস্কর্য্য প্রথমে স্থাপত্যের অলঙ্কাররূপেই বিকশিত হয়—ক্রমে স্বতন্ত্র হইয়া উন্নতি লাভ করে। কিন্তু স্থাপত্যেই দেশের শিল্পের পরিমাপ হয়। জার্ম্মাণীর স্থাপত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায়, জার্ম্মাণী আর সকল দিকে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, স্থাপত্যে সেরূপ কোন উন্নতিরই পরিচয় দিতে পারে নাই। পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথার সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু কোন নূতন প্রথার সৃষ্টি হয় নাই। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, জার্ম্মাণরা এমন প্রথার অন্বেষণ করিতেছে, যাহাতে লৌহের বহুল ব্যবহার থাকিবে, কিন্তু সৌধে সৌন্দর্য্যের অভাব হইবে না। এরূপ প্রথার প্রবর্ত্তনে যে শিল্প-প্রতিভার প্রয়োজন, নবীন জার্ম্মাণীতে আজও কোন শিল্পী সে শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তবে বার্লিনে কয়টি দোকান বাড়ীতে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কার্য্যোপযোগিতার সুন্দর সম্মিলন দেখা গিয়াছে।

কৈসর দ্বিতীয় উইলিয়ম প্রাচীন শিল্পপ্রণালী নবীন জার্ম্মাণীর প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সে প্রয়াস নিষ্ফল হইয়াছে। কারণ, তাঁহার উৎসাহে বার্লিনে যে সব ভাস্করকীর্ত্তি সংসাধিত হইয়াছে, সে সকল শিল্প হিসাবে উৎকৃষ্ট বলা যায় না। তবে বিজয়-বীথি (Avenue of Victory) মুক্ত করিবার সময় তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

বিজ্ঞানে জার্ম্মাণী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি; এবার জ্ঞানের কথার আলোচনা করিব। এই জ্ঞান—অনুশীলন—Kultur সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর সঙ্গে অন্য সকল দেশের অসাধারণ প্রভেদ লক্ষিত হয়। সুধী জিমার্ণের কথায় আমরা ইহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিব। জার্ম্মাণদিগের মতে ইহা জাতির সম্পত্তি; কেবল তাহাই নহে, —সরকার কর্ত্তৃক সরবরাহ হইয়া থাকে; সরকার ইহার উপাদান ও মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছাড়পত্র দিয়া দেশের লোকের ব্যবহারের জন্য ইহার সরবরাহ করিয়া থাকেন! জগতের আর সব দেশেই ইহা ব্যক্তিগত সম্পদ—জার্ম্মাণীতে সরকারের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ইহা জাতির সাধারণ সম্পত্তি। তাই তাহারা বলে, সব জার্ম্মাণই এই ধনে ধনী—বিদ্যালয়ে তাহারা সকলেই ইহা অর্জ্জন করিয়াছিল। আর সরকারী শিক্ষাপদ্ধতির ফলে সকলে একই প্রকার মাল লাভ করে—ইতরবিশেষ হয় না। তাই সব জার্ম্মাণ প্রায় একইরূপ বিষয় অবগত হয়, গেটে, সেক্সপীয়র, নৌবহর প্রভৃতি সম্বন্ধে একইরূপ মত ব্যক্ত করে,—জীবনের ও সমাজের সম্বন্ধেও একইরূপ আদর্শ গ্রহণ করে।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার জগতের ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায়

না। ইহার ফলে সকলেই মনে করে, সরকার শক্তির কেন্দ্র ও প্রতিকৃতি, অর্থাৎ জাতি হইতে যে শক্তির উৎস উৎসারিত হয়, তাহা জার্ম্মাণরা স্বীকার করে না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, হেগেল হইতে নিটশে পর্য্যন্ত সুধিসমাজ এই মতই গ্রহণ করিয়া তাহারই প্রচার করিয়াছেন। এই শেষোক্ত পণ্ডিতই "শক্তিধর্ম্ম"-প্রচারক। এই সব দার্শনিক পণ্ডিতের রচনা সর্ব্বজনবোধ্য হইতে পারে না। কিন্তু জার্ম্মাণ সরকার তাঁহাদের মত জনসমাজে প্রচারিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ফলে অজ্ঞ অনধিকারীরা সেই সব মত আপনাদের প্রবৃত্তি অনুসারে বুঝিয়া কার্য্য করে ও বর্ব্বরতার পরিচয় দেয়। দস্যুতস্কর গীতার উক্তি—"ত্বয়াহৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন—যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" পাঠ করিয়া যেমন মনে করিতে পারে, ভগবৎপ্রেরণায় তাহারা দুষ্কর্ম্ম করে, তেমনই জার্ম্মাণীর অনধিকারী জনগণ এই সব দার্শনিকের উপদেশের অর্থ না বুঝিয়া বিপদ্ ঘটায়। এইটুকু বুঝিলে বর্ত্তমান যুদ্ধে বর্ব্বরতার বিকাশের কারণ সহজেই বুঝা যাইবে। জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ প্রতিভাবলে বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার ত্রুটি বুঝিয়া, জ্বালাময়ী ভাষায় সে ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন! জার্ম্মাণ সরকার সেই সব মত "অনুশীলনে" সম্মিলিত করিয়া দিয়াছেন। ফলে সাধারণ জনগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলেও তাঁহাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বিরক্তির অনুকরণ করিতে থাকে। নিটশে কপটতার ও অসাধুতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি কপটতার ও অসাধুতার বিরুদ্ধে বর্ব্বরভাবে আক্রমণ আরব্ধ করেন। দেশের লোক সেটুকু বুঝে নাই—বর্ব্বরভাবে আক্রমণের অনুকরণ করিয়াছে।

জার্ম্মাণগণ সকলেই এই Kultur লইয়া বড়ই গর্ব্বিত। এমন কি তাহারা এমন কথাও বলিয়াছে যে, সমগ্র জগতে ইহার বিস্তার

করিয়া জগতের উন্নতিসাধনই জার্ম্মাণীর বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য। তাহারা বলিত, এই জন্যই জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ এক করিয়া সকলকে এই অমূল্যসম্পদের অংশ দিতে হইবে—সব রাজ্য জার্ম্মাণীর প্রভাবাধীন করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে বুঝা যাইতেছে, লোকের এই মতও সরকারী চেষ্টায় গঠিত ও প্রচারিত। জার্ম্মাণী যে দুরাশায় জগতে সমরানল প্রজ্বালিত করিয়া,সমগ্র জগৎ জার্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে,—সেই দুরাশার মদিরায় দেশের জনগণকে প্রমত্ত করিবার জন্যই সমাজ-হৃদয়ে এই Kultur রোগরস প্রবিষ্ট করান হইয়াছিল। নহিলে জগতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যের উপযোগিতা কোন ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারে না। সেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চান্‌সেলার মিষ্টার ফিসার জগতের সভ্যতায় ইহাদের মূল্যনির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাইবেলের পূর্ব্বভাগ, হোমরের কাব্য, সেক্সপীয়রাদির নাটক এ সব সম্পদই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে। এথেন্স, ফ্লোরেন্স, জেনিভা—এই সকল ক্ষুদ্র স্থানের কাছে সভ্যতার ঋণ কে অস্বীকার করিতে পারে? বর্ত্তমান জনতন্ত্রের বীজ জেনিভা হইতে আমেরিকায় নীত হইয়াছিল। যদি প্রাচীন রাজ্য-সমূহ সঙ্কীর্ণ না হইয়া বিরাট হইত, তবে তাহাদের একতা নষ্ট হইত—রাজ্যমধ্যে দেশ-প্রাণতা উদ্ভূত হইতে পারিত না।

সার্ ওয়াল্‌টার রালে দেখাইয়াছেন,এই যে Kultur ছাপে জার্ম্মাণী জগতের সকলের মন একরূপ করিয়া গঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে কুফল ফলিবেই। জগতে শিল্পে ও সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও দর্শনে মানুষের বৈশিষ্ট্যই বিকশিত হইয়া এক এক দিক সৌন্দর্য্যে সুন্দর করিয়াছে। মানুষের বৈশিষ্ট্যই তাহার সর্ব্বপ্রধান সম্পদ। কিন্তু জার্ম্মাণীর শাসনপদ্ধতি ও Kultur উভয়ই সেই বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিয়া

তাহার স্থানে সমতার প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পায়—মানবের উন্নতির পথ সুগম না করিয়া রুদ্ধ করে।

আজ জার্ম্মাণরা যে আপনাদিগকে বিধাতার অনুগৃহীত বলিয়া মনে করিয়া আপনাদের জাতীয় ভাবের গর্ব্ব করে—নিটশের উক্তি উদ্ধৃত করে—তাহারা কি নিট্‌শের কথা বুঝিয়া দেখে? তিনি ত স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরযুগের সমরেচ্ছা সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতির পরিহার সাধিত না হইলে—য়ুরোপের সামরিক ব্যয় শিক্ষায় ব্যয়িত না হইলে মানবের উন্নতি হইবে না—হইতে পারে না। তিনি সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণকামনায় জাতীয়তার ভাবকেও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—A little more fresh air, for Heaven's sake! This ridiculous condition of Europe must not last any longer. Is there a single idea behind this bovine nationalism? What positive value can there be in encouraging this arrogant self con ceit when everything to day points to greater and more common interest?"

তিনি য়ুরোপের যে একতার কথা বলিয়াছিলেন, সে একতা ক্রুপের কামানে, জেপলিনের বোমায়, বিষবাষ্পে সংসার শ্মশান করিয়া—সভ্যতাকে বর্ব্বরতায় পরিণত করিয়া—পশুকে দেবতার আসনে বসাইয়া সাধিত হইতে পারে না। সে একতা জ্ঞানের পুণ্যপ্রবাহে প্রভেদের ব্যবধান ভাসাইয়া—প্রেমের বন্যায় সকল দেশ প্লাবিত করিয়া সংস্থাপিত হইতে পারে, যুদ্ধে তাহা হয় না—হইতে পারে না।

শিল্পে, বাণিজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, বাহুবলে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়া জার্ম্মাণরা তাহাদের সরকারী পদ্ধতিকেই উন্নতির সোপান মনে

করিয়াছে। তাই সরকারকেই অভ্রান্ত মনে করিয়া সরকারী ব্যবস্থায় Kultur গ্রহণ করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে। গ্রীম, নালার, হায়েন, ওয়েবার - জার্ম্মাণ সাহিত্যের এই সব রথী একদিন সাহিত্যক্ষেত্র অধিকৃত করিয়া সভ্য জগতের চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। Kultur গ্রহণের ফলে জার্ম্মাণীতে সেরূপ প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের অভাব হইয়াছে। যাহার দ্বারা জার্ম্মাণী সমগ্র জগৎকে জার্ম্মাণ করিবার কল্পনা করিয়াছিল, তাহারই দ্বারা জার্ম্মাণী আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—উদারতার স্থানে সঙ্কীর্ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সভ্যতার পূতপ্রবাহকে পাপের পঙ্কিল পথে প্রবাহিত করিবার আয়োজন করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর দুঃস্বপ্ন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণী যে সর্ব্বস্বপণ করিয়া বিষম সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়—বলিতে ইচ্ছা হয়, জার্ম্মাণী বাতুলের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছে—সত্য সত্যই দুঃস্বপ্নচালিত হইয়া আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া কার্য্য করিতেছে। সে কল্পনা জগৎব্যাপী প্রভুত্বের—সে স্বপ্ন জগজ্জয়ের। জার্ম্মাণী যুদ্ধবিভাগে ও বাণিজ্যবিভাগে, বিজ্ঞানে ও দর্শনে যে উন্নতি সংসাধিত করিয়াছে, সে জন্য জার্ম্মাণীর শত্রুরাও তাহার প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু হায়—সেই উন্নতি কি হীন উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেই ক্ষমতার কিরূপ অপব্যবহার হইয়াছে মনে করিলে ব্যথিত হইতে হয়। কারণ, তাহাতে বুঝা যায় নিবৃত্তির সাধনায় প্রবৃত্তিকে নিহত করিতে না পারিলে মানুষের পশুপ্রকৃতি সুপ্ত থাকিতে পারে, লুপ্ত হয় না। আন্তর্জ্জাতিকই হউক আর দেশেরই হউক, রাজনীতিক্ষেত্রে ঘোষণার ও প্রতিশ্রুতির, সন্ধিসর্ত্তের ও চুক্তির মূল্য যত অধিক আর কিছুরই তত অধিক নহে। এই সকলের উপরই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। জার্ম্মাণী সেই সকলই অনায়াসে অবহেলা করিয়াছে।

বাতুল ব্যতীত কেহ মনে করিতে পারে না, সমগ্র জগতে প্রভুত্ববিস্তার তাহার দেবনির্দ্দিষ্ট কার্য্য; সে কার্য্যসাধনের পক্ষে যে অন্তরায়

হইবে, সে তাহার সংহারসাধন করিতে পারে ; তাহাতে তাহার পাপ নাই—লজ্জাও নাই। জার্ম্মাণী তাহাই মনে করিয়াছে। তাই বেলজিয়ম সন্ধিসর্ত্তরক্ষার চেষ্টা করিয়া জার্ম্মাণীর অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। যে বেলজিয়ম সন্ধিসর্ত্তের জন্য অত্যাচার সহ্য করিয়াছে তাহার অস্ত্রক্ষত বিলুপ্ত হইবে—সে আপনার কৃতকর্ম্মের জন্য ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তিসাধক বলিয়া বিখ্যাত থাকিবে—তাহার উন্নতি তাহার ক্ষতিকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিবে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্ম্মাণী বেলজিয়মের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, সেই কলঙ্ককথা বিবৃত করিতেও লজ্জা বোধ হয়। নিরপরাধ বৃদ্ধের জীবনহরণ, নিষ্পাপ শিশুর প্রাণসংহার, রমণীর ধর্ম্মনাশ, অতীত যুগের শিল্পনিদর্শন চূর্ণ করা—এ সব যে বিংশশতাব্দীতে কোন সভ্যতাগর্ব্বগর্ব্বিত জাতির পক্ষে সম্ভব এ কথা এই জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন প্রতীচ্য জাতি স্বীকার করিত না। কিন্তু সেই অসম্ভবই সম্ভব হইয়াছে। সিপাহী বিপ্লবের সময় উত্তেজিত বিপ্লবকারীদিগের নৃশংস হত্যায় প্রজ্বালিত-প্রতিহিংসাবৃত্তি কোন কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী যেরূপ কার্য্যের জন্য লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, ক্যানিং হইতে রিপণ পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী যেরূপ ব্যবহার ইংরাজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়া, ভারতে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, জার্ম্মাণীর কোন কোন কর্ম্মচারী নহে—সমগ্র জার্ম্মাণজাতি তদপেক্ষা শতগুণ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। জার্ম্মাণ লোকশিক্ষকগণের শিক্ষায় জাতির প্রকৃতি এমনই বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে ! নহিলে কোন জাতি নার্স ক্যাভেলের মত পরহিতোৎসৃষ্টজীবন মহিলার হত্যার সমর্থন করিতে পারিত না। তাঁহার অপরাধ তিনি জাতিনির্ব্বিশেষে সকল আহত ব্যক্তিরই শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—আর জার্ম্মাণরা যাহাদিগকে

হত্যা করিত তাহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে যখন ব্যারণ ভন গিশিংএর ষড়যন্ত্রে জার্ম্মাণ সৈনিকরা তাঁহাকে ধৃত করে, তখন তিনি এক জন আহত জার্ম্মাণের ক্ষত আবৃত করিয়া দিতেছিলেন। তাহার পর যেরূপে সংবাদ গোপন করিয়া তাঁহার বিচারের "প্রহসন" অভিনীত হয় তাহার বিবরণ বিবৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। শেষে জার্ম্মাণী তাঁহার ভক্তদিগকে তাঁহার শব দিতেও অস্বীকার করিয়াছে! কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যায়, তিনি তাঁহার হত্যাকারীদিগের অপেক্ষা কত উন্নত। তিনি বলিয়াছিলেন, স্বদেশপ্রেমও মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নহে—কাহাকেও ঘৃণা করা মানুষের উচিত নহে—"I realise that patriotism is not enough. I must have no hatred or bitterness to anyone." জার্ম্মাণীর লোকশিক্ষকগণ জার্ম্মাণজাতিকে এমনই শিক্ষা দিয়াছেন যে, তাহারা ইহাতেও আপনাদের হীনতা ও দীনতা উপলব্ধ করিয়া লজ্জিত হয় নাই।

জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য—নবীন জার্ম্মাণী যখন সংগঠিত হয়, তখন বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্য পুরাতন—মার্কিণও নবীন নহে। তখন আর বিস্তৃত স্থানের অধিকারলাভ সহজসাধ্য নহে। কিন্তু জার্ম্মাণীর দুরাশার সীমা ছিল না। যে দুরাশায় রোমের রাজস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, যে দুরাশায় নেপোলিয়নের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, সেই দুরাশাচালিত হইয়া জার্ম্মাণী জগৎপ্রভুত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য দেশের লোককে ভ্রান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া—মিথ্যার উপর মিথ্যা পুঞ্জীভূত করিয়া—ষড়যন্ত্রে সরলতাকে কলাঙ্কিত করিয়া—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া এই বিশ্বব্যাপী বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছে। কিন্তু সেই স্বহস্তপ্রজ্বালিত বহ্নিতে কে দগ্ধ

হইবে? জার্ম্মাণীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান আজ জগতের; তাহা দগ্ধ হইতে পারে না—বরং এই যুদ্ধের বহ্নিতে তাহার শ্যামিকাই বিনষ্ট হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণীর বাণিজ্য—জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যস্বপ্ন—জার্ম্মাণীর দুরাকাঙ্ক্ষা—জার্ম্মাণীর বর্ব্বরতা বিনষ্ট হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতার পরিবর্ত্তন হইবে। বিদ্যুতের আলোকের পার্শ্বে অমার অন্ধকার—পুণ্যের পার্শ্বে পাপ—স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য্যের পার্শ্বে দীন দারিদ্র্য, এ সব পরিবর্ত্তিত হইবে; মানবের সমাজ-শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্য বিনাশক—শান্তির শত্রু প্রতীচ্য ব্যবসাব্যবস্থা—Industrialism—পরিবর্ত্তিত হইবে; সমাজে কাঞ্চনকৌলীন্য পরিবর্ত্তিত হইবে; বিলাসের স্রোত রুদ্ধ হইবে; সভ্যতার গতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইবে। বার্ণহার্ডির বিষাণ আর য়ুরোপে শ্রুত হইবে না; কৈসরের ভ্রান্ত মত আর য়ুরোপে প্রচারিত হইবে না।

জার্ম্মাণী যতই কেন চেষ্টা করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী গোপন রাখুক না, বার্ণহার্ডি প্রভৃতির রচনায় ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশের নিকট তাহা একেবারে অজ্ঞাত রহে নাই। কিন্তু সে কার্য্য-প্রণালীতে যেরূপ অনুষ্ঠান অনিবার্য্য সেরূপ অনুষ্ঠান কোন সভ্য জাতির পক্ষে সম্ভব নহে, মনে করিয়াই অন্যান্য দেশবাসীরা প্রস্তুত হয় নাই। তাই জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রুসিয়া, তিনটি দেশকেই অপেক্ষাকৃত অপ্রস্তুত অবস্থায় পাইয়াছিল। তাই জার্ম্মাণ যুদ্ধ এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছে—জার্ম্মাণীর দুঃস্বপ্ন দূর হইতে এত বিলম্ব ঘটিতেছে।

হয় ত এই বিশ্বব্যাপী বহ্নিদাহের প্রয়োজন হইয়াছিল। কে বলিতে পারে? হয় ত অনাচার ভস্মীভূত করিয়া আবার শান্তির রাজ্য সংস্থাপন জন্যই এই যুদ্ধের উদ্ভব। একবার ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যেমন মহাযুদ্ধে অভ্যুত্থিত অধর্ম্মের বিনাশ সংসাধিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থা-

পিত হইয়াছিল, হয় ত তেমনই সমরক্ষতপূর্ণ য়ুরোপের বক্ষে আবার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই ত—

স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ।"

মিষ্টার লয়েড জর্জ্জের উক্তি আমরা পূর্ব্বেও একবার উদ্ধৃত করিয়াছি—এ যুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য—এবার যাত্রীদিগকে নূতন পথে যাত্রা করিতে হইবে।—"I wonder how many people realize the magnitude of the war, and the tremendous issess that depend upon it. Sometimes I fear that they treat it as a passing shower—heavy drenching perhaps—but transient—soon the sun will shine again and quickly dry up the puddles and we can once more walk along the same old roads in the same old stambling way. But this is not a passing shower—it is not a spell of bad weather—it is the deluge, it is a covulsion of nature. If you will carefully watch what is going on in the belligerent lands you will find that this war is bringing unheard-of changes in the social and industrial fabric. It is a cyclone which in tearing up by the roots the ornamental plants of modern society and wrecking some of the flimsy trestle-bridges of modern civilization. If is an earthquake which is upheaving the very rock of European life. It is one of these seismic disturbances in which nations leap forward or fall backward genera-

tions in a single bound." এই মহাপ্রলয়ের ফলে কি হইবে, কে বলিতে পারে? হয় ত ইহারই ফলে ভারতের যুগযুগান্তের সাধনার ফল —নিবৃত্তিমার্গই প্রতীচীর নিকট প্রকৃত পথ—উন্নতির—সাধনার—মোক্ষলাভের প্রকৃত পথ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতবর্ষের জ্ঞান আবার বিশ্বের হিতে প্রযুক্ত হইয়া যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দারিদ্র্যদুঃখ দূর হইবে। কারণ যে অবাধবাণিজ্যনীতির ফলে ভারতের শ্রমশিল্প নষ্ট হওয়ায় শিল্পীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে অবাধবাণিজ্যনীতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে পরীক্ষার ফলে বিলাতের ব্যবসাবোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যেরূপ সরকারী সাহায্যে জার্ম্মাণীর ব্যবসাবিস্তার হইয়াছে- সেরূপ সাহায্য পাইলে বিলাতের ব্যবসা ক্ষুণ্ণ হইত না—যুদ্ধান্তে সেইরূপ সাহায্যের—রক্ষাশুল্কের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিলাতের প্রান্তর হইতে বিলাতের কারখানায় মাটি লইতে যে ভাড়া পড়ে, বিলাত হইতে জার্ম্মাণীতে মাটী লইতে তদপেক্ষা কম ভাড়া পড়ে, এ সব কথা আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী ভাগে বুঝাইয়াছি। বিলাতের ব্যবসা-বোর্ড বলিয়াছেন, যুদ্ধান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে—মিত্রদেশের সহিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যবসা-ব্যবস্থা নূতন করিতে হইবে—"After the war a strong desire would exist to respond to the feeling of the Dominions to favour Imperial trade preference with the Allies." মিষ্টার হারল্ড ককস অবাধবাণিজ্যনীতির সমর্থক ছিলেন। এবার তিনি বলিতেছেন, যুদ্ধের পর অনেককেই পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। যতক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন দেশ অবাধবাণিজ্য পরস্পারের কল্যাণকর মনে করে, ততক্ষণ তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর—নহিলে নহে।

জার্ম্মাণী বাণিজ্যবিস্তারে সামরিক শক্তি সঞ্চিত করিয়াছে—এ কথা ইংলণ্ডকে মনে রাখিতেই হইবে। বাণিজ্যের দ্বার মুক্ত রাখিলে যদি শত্রু পুরে প্রবেশ করে, তবে সে দ্বার বন্ধ করিতে হইবে, তাহাতে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা অনিবার্য্য বোধে সহ্য করিতে হইবে। সমৃদ্ধির অপেক্ষা সংরক্ষণ অধিক প্রয়োজন। তাই আমরা শত বৎসরের অমানিশাশেষে প্রাচীর তোরণে উষাগমের অরুণরাগ রেখাবিকাশের আশায় উৎফুল্ল ও আনন্দে পুলকিত হইতেছি।

আমাদের আশার আরও কারণ আছে। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হইলেও উপনিবেশসমূহে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। ইংরাজ সরকার চেষ্টা করিয়াও আমাদিগকে সে সব লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন নাই। এবার আমাদের পক্ষে সেই সব স্থানেও বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রজার অধিকারলাভের সম্ভাবনা হইয়াছে। যে রাডিয়ার্ড কিপলিং বলিয়াছেন, প্রাচীতে ও প্রতীচীতে কখনও মিলন হইতে পারে না, তিনিই আবার বলিয়াছেন, বলিষ্ঠে বলিষ্ঠে মিলন হইলে তখন আর প্রাচী প্রতীচী ভেদজ্ঞান থাকে না। এবার ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সকল ভাগের প্রজারা সেই সাম্রাজ্যের গৌরববর্দ্ধনের জন্য যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে দেহের শোণিতে যে ঘনিষ্ঠতার সংস্থাপন করিয়াছে, তাহার ফলে বর্ণগত বৈষম্যবুদ্ধি বোধ হয় ত্যক্ত হইবে। সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার প্রতিষ্ঠায় সহানুভূতির সলিলে ভেদজ্ঞান ভাসিয়া যাইবে।

এবার ভারতবাসীরা সাম্রাজ্যের জন্য ধন ও প্রাণ অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বাঙ্গালীরা যোদ্ধৃরূপে রণক্ষেত্রে যাইবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াও সেবকরূপে তথায় যাইয়া দেখাইয়াছে,—তাহারাও সেই ভারতবাসী—কাপুরুষকলঙ্ক "প্রক্ষালিল যা'রা শোণিত ধারায়"

যাহারা অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া স্বেচ্ছায় ইংরাজকে এ দেশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধের জন্য ফরাসী সরকার ভারতে হিন্দু প্রজাদিগকে স্বেচ্ছাসৈনিক হইয়া ফ্রান্সের এই বিপদের সময় ফরাসী সরকারী প্রজার কর্ত্তব্যসংসাধনকল্পে আহ্বান করিতেছেন। হয় ত ইংরাজ রাজ্যেও এইবার বাঙ্গালীদিগের পক্ষে সামরিক বিভাগে প্রবেশদ্বার মুক্ত হইবে। অন্ততঃ ভারতবাসী বাঙ্গালীর এই দৃষ্টান্ত যে ব্যর্থ হইবে না—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লর্ড হার্ডিঞ্জও ভারতের অবস্থাপরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন—এক দিন "India may be regarded as a true friend of the Empire and not merely as a trusely dependent."

তাই বলিয়াছি, এই মহা অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের উদ্ভব হইতে পারে—সমগ্র জগতে পরিবর্ত্তনের ফলে নূতন উন্নতির যুগের প্রবর্ত্তন হইতে পারে।

সম্পূর্ণ।